ইউ. কালেসনিকোভ ইউ. গ্লাজকোভ

কক্ষপথে নভযান

ঘরে ঘরে বিজ্ঞান

ঘরে ঘরে বিজ্ঞান

'ঘরে ঘরে বিজ্ঞান' সিরিজের বইগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের দ্বারা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বিজ্ঞানের জটিল প্রত্যয়গুলিকে খুবই সাধারণভাবে এবং সুস্পষ্ট উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই বইগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধিতে সবাইকেই সাহায্য করবে। তাছাড়াও, বিজ্ঞানের নানা শাখায় সাধারণ জ্ঞানের উন্নতি সাধনে বইগুলি অবদান রাখতে পারে।

প্রকাশিত হচ্ছে

ভ. গ্লুশকোভ — 'সাইবারনেটিক্‌স্‌ বলতে কি বোঝায়?'

কক্ষপথে নভযান

মহাশূন্যে অভিযান আজ মানবজাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'কক্ষপথে নভযান' বইটি নিঃসন্দেহে খুবই আকর্ষণীয়। বইটিতে মহাকাশযাত্রার বাস্তব কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানুষের পক্ষে কিভাবে মহাশূন্যে এবং আন্তর্গ্রহ মহাজগতে বিচরণ সম্ভব, এর জন্য কি কি যান্ত্রিক উপকরণ ও কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—এ সব কিছুই সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বইটি আগ্রহী ও উৎসাহী পাঠকের মহাশূন্য-সংক্রান্ত জ্ঞান-পিপাসা মেটাবে।

Ю. В. Колесников Ю. Н. Глазков

На орбите — космический корабль

Москва
Педагогика
1980

ইউ. কালেসনিকোভ ইউ. গ্লাজকোভ

কক্ষপথে নভযান

মির প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: বদরুল হাসান, অভিজিৎ পোদ্দার

На языке бенгали

সূচী

ভবিষ্যতের মহাশূন্য-গবেষকদের উদ্দেশ্যে —

'বিজ্ঞানীরা — স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে' সিরিজের প্রথম দিকের একটি বইতে (যেখানে তোমাদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের আশায় দিন গুনছে এমন বহু অজ্ঞাত ও অজানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে) বলা হয়েছে: 'তোমাদেরকে আগ্নেয়গিরিতে ভরা চন্দ্রকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে...

তোমাদেরকে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ, শুক্রগ্রহের কাঁচঘরবত চুল্লীতে অনুপ্রবেশ, বৃহত্তর গ্রহসমূহের উপগ্রহে স্টেশন স্থাপন ও বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের সূচিভেদ্য অন্ধকারে বেষ্টিত বায়ুমণ্ডলের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। সূর্যকে নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে, সূর্য-লগ্ন মহাশূন্য ও আন্তঃনক্ষত্রীয়মণ্ডলের অনুসন্ধান করতে হবে এবং অবশেষে একের পর এক সূর্যসদৃশ এবং সূর্যের সাথে মেলেনা এমন সব অসংখ্য নক্ষত্রকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এককথায় তোমরা নিজেরাই নভচারী হওয়ার জন্য ছুটে আসবে। তাই মহাশূন্য-গবেষণা যে কত আকর্ষণীয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না'।

তবে এই অনুসন্ধান কাজ শুরু করার আগে তোমাদেরকে খুব ভাল ভাবে প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে — বর্তমানে চালু নভযান ও স্টেশন পরিচালনার জন্যই শুধু নয়, ভবিষ্যতে নতুন, আজও অজ্ঞাত এমন ধরনের নভযান ও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার মহাশূন্যযান নির্মাণ করার জন্য।

রকেটে মহাশূন্য ভ্রমণ

আমাদের গ্রহের চারপাশে বহুসংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ — বিভিন্ন অভীষ্টের স্বয়ংক্রিয় যান — পরিভ্রমণ করছে। এই সব স্বয়ংক্রিয় যান মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে রকেটের সাহায্যে। মানুষের পাঠানো স্বয়ংক্রিয়যান সৌরজগতের গ্রহসমূহে এবং গ্রহ ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে উড়ে যায় এবং এই যানগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব কাটিয়ে যায় রকেটের সাহায্যেই।

নভযান পরিবহনকারী রকেটের কাহিনী আমরা শুরু করবো তার শক্তিশালী ইঞ্জিনের গঠনপ্রণালী দিয়ে। ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী খুব একটা জটিল নয়। গ্যাস নিষ্কাশনের ফলে রকেট-ইঞ্জিনের শক্তি সঞ্চার হয় এবং জ্বালানী দহনের ফলে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। একক সময়ে যত বেশী গ্যাস নিষ্কাশিত হয়, সক্রিয় বল অর্থাৎ ইঞ্জিনের আকর্ষণ বলও তত বেশী হবে। একক সময়ে রকেট থেকে নিষ্কাশিত গ্যাসের পরিমাণ পরিবর্তন করে কিম্বা গ্যাসের ধারার নির্গমনের বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে আকর্ষণ বল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রকেটের জ্বালানী হয় তরল অথবা কঠিন। জ্বালানীর প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে রকেটের ইঞ্জিনও প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমে আমরা তরল জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বোঝার চেষ্টা করবো।

জ্বালানীর দহনের ফলে আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। জ্বলন-প্রকোষ্ঠ — রকেট-ইঞ্জিনের মূল অংশ। বড় আকারের আকর্ষণ বল সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র দহনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী অগ্নিশিখা, অনেকটা মন্দীভূত বিস্ফোরণের মত। তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবে যে চিল্‌তে আলোর শিখা অক্সিজেন ধারাতে কিভাবে আতশ ব্যাজির মত দপ্‌ করে জ্বলে
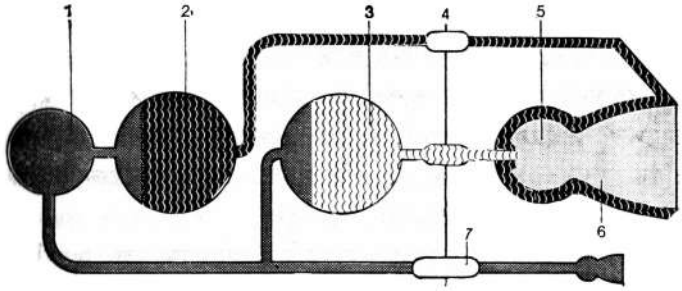
তরল জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের নক্‌শা
1 — সঙ্কুচিত গ্যাস; 2 — জ্বালানী; 3 — অক্সিডাইজার; 4 — পাম্প; 5 — জ্বলন-প্রকোষ্ঠ; 6 — বহির্গমন নল; 7 — টারবাইন
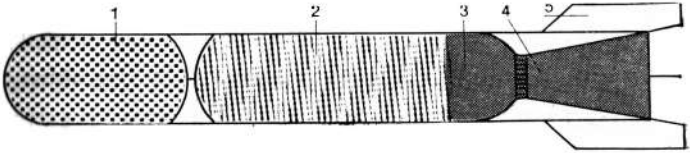
কঠিন জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের নক্‌শা
1 — প্রয়োজনীয় লোড; 2 — বারুদ; 3 — জ্বলন-প্রকোষ্ঠ; 4 — বহির্গমন নল; 5 — স্ট্যাবিলাইজার

উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। স্কুলজীবনের এই ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই বোঝা যায়, রকেট-ইঞ্জিনে কেন দুটি ট্যাঙ্ক থাকে — একটি জ্বালানী সহ, অন্যটি অক্সিডাইজার সহ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তরল অক্সিজেন অক্সিডাইজারের কাজ করে, আর জ্বালানীর কাজ করে — তেলের পাতনের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য কিম্বা নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ।

জ্বলানী ও অক্সিডাইজার কেন্দ্রাতিগ পাম্পের মাধ্যমে জ্বলন-প্রকোষ্ঠে পতিত হয় কিম্বা জড় গ্যাস দ্বারা উক্ত প্রকোষ্ঠে বিতাড়িত হয়। গ্যাস-টারবাইন দ্বারা পাম্পগুলি চালিত হয়। বিশ্লিষ্ট বা দাহ্য পদার্থের সাহায্যে (কখনো কখনো এখানে ব্যবহৃত তেল বা অক্সিডাইজারের সাহায্যেও এ কাজ সম্পন্ন হয়) গ্যাস-জেনারেটরে টারবাইনের জন্য গ্যাস উৎপন্ন করা হয়।

জ্বলন-প্রকোষ্ঠ হতে আতপ্ত গ্যাস সক্রিয় বহির্গমন নল (nozzle) দ্বারা বাইরে নিষ্কাশিত হয়। প্রকোষ্ঠ ও বহির্গমন নলের দেয়ালগুলি দ্বিগুণিত। ইঞ্জিন যখন কাজ করে তখন দেয়ালের মধ্যবর্তী রন্ধ্রগুলি জ্বালানীর শীতলীকৃত উপাদান দ্বারা অবগাহিত হয়। এ ধরনের শীতলায়নী 'জামা' যন্ত্রের এই অংশগুলিকে গলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

যদিও আমরা তরল জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিন নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করেছি, উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমে কঠিন জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপকথাসুলভ 'কাত্যুসা' নামের বহুবিস্ফোরক মর্টার কামান বহুল খ্যাতি লাভ করেছিল। তাদের স্বক্রিয় গোলাগুলি এ ধরনের ইঞ্জিন দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।

কঠিন জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিন — বহুদিন ধরে প্রসিদ্ধ বারুদের রকেটের প্রত্যক্ষ বংশধর এবং এর নির্মাণ প্রণালীও যথেষ্ট সরল। জ্বালানী — বিশেষ ধরনের রকেটীয় বারুদ — এখানে সরাসরিভাবে জ্বলন-প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে। সক্রিয় বহির্গমন নল সহ প্রকোষ্ঠই হল এর সব গঠনকৌশল। কিন্তু কঠিন জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের এতসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মহাশূন্যবিজ্ঞানে এর প্রয়োগ তরল জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। যথেষ্ট বড় আকারের কঠিন জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিন বৃহৎ আকর্ষণ-বল উৎপন্ন করতে পারে, তবে খুবই অল্পসময়ের জন্য তা কাজ করে। কখনো

কখনো উৎক্ষেপণের পর পরই শক্তিশালী রকেট-পরিবাহকের বেগ ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের ব্যবহার করা হয়। তবে একথা সত্য যে, এ রকম উৎক্ষেপণের সময় মাত্রাতিরিক্ত ওভার-লোড সৃষ্টি হয়। এ কারণে মানুষচালিত নভযানকে কক্ষপথে উৎক্ষেপণের জন্য কঠিন জ্বালানীর ইঞ্জিনের রকেট ব্যবহার দুষ্কর হয়ে পড়ে — নভচারীরা বিপদগ্রস্ত হতে পারেন। তবে নভযানে বারুদচালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় সুষ্ঠু অবতরণ নিশ্চিত করার জন্য কিম্বা দুর্ঘটনা হতে রক্ষার সিস্টেমে। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো নভযান সংক্রান্ত অধ্যায়ে।

রকেট-ইঞ্জিন — রকেটের প্রাণকেন্দ্র। শক্তিশালী রকেট-ইঞ্জিন সম্বলিত রকেট দ্বারা নভযান ও কাক্ষিক স্টেশনসমূহ, আন্তঃগ্রহ যন্ত্রাদি ও পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই ইঞ্জিনগুলি বিশাল আকর্ষণ-বল উৎপন্ন করে। তবে মহাশূন্য-কৃৎকৌশলে বৃহদাকার শক্তিশালী যন্ত্রপাতির পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণকারী স্বল্প আকর্ষণ-বলের ইঞ্জিনও ব্যবহৃত হয়। এটা শক্তিশালী ইঞ্জিনসমূহের ক্ষুদ্রায়িত অনুলিপি। কিন্তু, তাদের কার্যপ্রণালী অপরিবর্তিত থাকলেও, নিয়ন্ত্রণকারী ইঞ্জিনসমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে: এদের জ্বালানী সরবরাহের পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল — এখানে পাম্প দ্বারা জ্বালানী ও অক্সিডাইজারকে স্থানান্তরিত করা হয় না, বরং ট্যাঙ্ক থেকে ঘনীভূত জড় গ্যাস দ্বারা নিষ্কাশিত করা হয়, একই ট্যাঙ্ক থেকে কয়েকটি জ্বলন-প্রকোষ্ঠ জ্বালানী পেতে পারে ইত্যাদি।

অতি ক্ষুদ্র রকেট-ইঞ্জিনও আছে। তাদের কোন কোনটি হাতের তালুতেই ধরবে। এ ধরনের মাইক্রোইঞ্জিনের আকর্ষণ-বল অতিশয় ক্ষুদ্র। তবে কৃত্রিম উপগ্রহ কিম্বা নভযানকে বিস্তার ও প্রয়োজনীয়
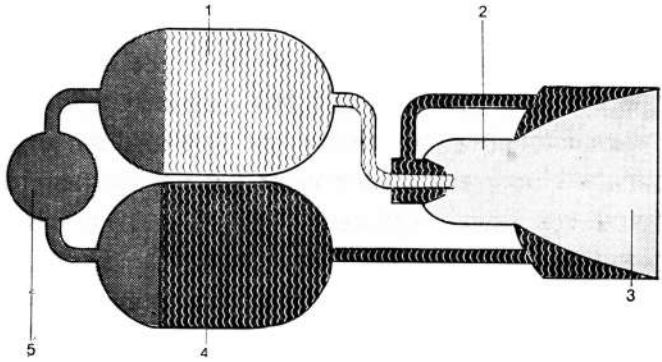
ক্ষুদ্র তরল জ্বালানীর রকেট-ইঞ্জিনের নক্‌শা

1 — অক্সিডাইজার; 2 — জ্বলন-প্রকোষ্ঠ; 3 — বহির্গমন নল; 4 — জ্বালানী; 5 — সংকুচিত গ্যাস
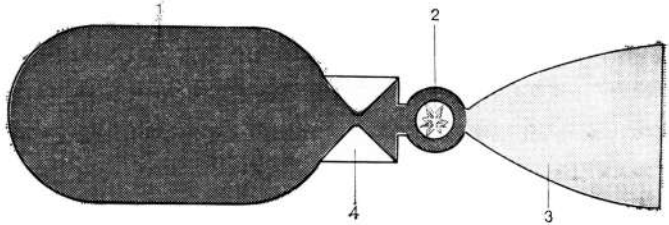
গ্যাসচালিত রকেট-মাইক্রোইঞ্জিনের নক্‌শা

1 — সংকুচিত গ্যাস; 2 — ভাল্‌ভ; 3 — বহির্গমন নল; 4 — চাপ নিয়ন্ত্রক

অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরে রাখার জন্য এই বলই যথেষ্ট: মহাশূন্যে তো ঘর্ষণবল নেই।

পরিকল্পকরা ক্ষুদ্র রকেট-ইঞ্জিন সম্বলিত বিশেষ ধরনের যন্ত্রও নির্মাণ করেছেন। কেবিনের বাইরে মুক্ত উড্ডয়নের সময় নভচারীদের যাতায়াত ও গতিবিধির কাজে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। এ

যন্ত্রগুলি হাতে বহন করা যেতে পারে অথবা স্পেস্-স্যুটের সাথে আটকানো থাকতে পারে।

সবচেয়ে সরল মাইক্রোইঞ্জিনের আকর্ষণ-বল সৃষ্টি হয় ঘনীভূত গ্যাসের প্রবাহের দ্বারা। অত্যন্ত ঘনীভূত নাইট্রোজেন অথবা বায়ু দ্বারা ধাতব চোঙ্গাগুলিকে পরিপূর্ণ করা হয়। উচ্চ চাপের ফলে যন্ত্রের দীর্ঘসময়ের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প আয়তনে সংরক্ষিত গ্যাস পাওয়া সম্ভব। চোঙ্গের সাথে সক্রিয় বহির্গমন নলকে সংযুক্তকারী পাইপের মধ্যে গতি পরিবর্তনকারী একটি গ্যাস-বিজারক (Gas reducer) ও তড়িৎ-চুম্বকীয় ভাল্‌ভ্ অবস্থিত। অপেক্ষাকৃত সুষম ও স্থায়ী আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজারক চাপ হ্রাস করে, আর ভাল্‌ভ্ গ্যাসের বহির্গমন নলে পতিত হওয়ার পথ খুলে দেয়। ভাল্‌ভ্ খোলার ঠিক সাথে সাথেই ইঞ্জিন চালু হয়। নভযান জাতীয় যান নিয়ন্ত্রনের জন্য এই দ্রুততা খুবই প্রয়োজনীয় কেননা মহাজাগতিক বেগে চালিত যান নিয়ন্ত্রণের বেলায় কোন রকম বিলম্ব অগ্রহণীয়।

এখন অবশ্য, 'কঠিন গ্যাসচালিত' মাইক্রোইঞ্জিনও নির্মিত হয়েছে। কিছু পদার্থ, যেমন আমাদের সুপরিচিত ন্যাফথালিন অথবা অ্যামোনিয়া-সল্ট উত্তপ্ত হলে তরল অবস্থাকে এড়িয়ে কঠিন অবস্থা হতে সরাসরি বায়বীয় অবস্থায় উপনীত হয়। এই পদ্ধতিকে ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) বলা হয়। নভযানের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি কাজের সময় যে তাপ বিকিরণ করে অথবা তড়িৎ প্রবাহের স্ফুলিঙ্গতে যে তাপের উৎপত্তি হয়, তা 'কেল্যাসিত জ্বালানী' কে গ্যাসে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ঊর্ধ্বপাতিত জ্বালানীতে মাইক্রোইঞ্জিন চালু করার জন্য যে সময় দরকার সাধারণ গ্যাস-ইঞ্জিন চালু করার তুলনায় তা ঢের বেশী।

স্বল্প আকর্ষণ-বলের ইঞ্জিনের বৈচিত্র্যময় প্রাচুর্যের ফলে

পরিকল্পকরা তাদের পছন্দমত ইঞ্জিন বেছে নিতে পারেন। একই নভযানে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি স্থাপন করে কোন কোন ইঞ্জিনের ত্রুটিসমূহকে অন্য ইঞ্জিনগুলির গুণদ্বারা পরিপূরণ করা সম্ভব। এই ধরনের সমাবেশের ফলে মহাকাশচারী যান নিয়ন্ত্রণের নিখুঁত পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব।

নতুন ধরনের রকেট-ইঞ্জিন — বৈদ্যুতিক রকেট-ইঞ্জিনের ভবিষ্যত খুবই সম্ভাবনাময়। আমরা আগেই বলেছি যে, রকেট-ইঞ্জিনের আকর্ষণ-বল গ্যাস ধারার নিষ্কাশনের বেগের উপর নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক রকেট-ইঞ্জিনে গ্যাস প্রচন্ড বেগে বহির্গমন নল থেকে নিষ্কাশিত হয়। অন্যদিকে রাসায়নিক শক্তিকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারকারী যন্ত্রের পক্ষে এ প্রচন্ড বেগ সঞ্চার করা দুরূহ ব্যাপার। এটা একটা বিরাট সুবিধা। কিন্তু এর জন্য বহুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, আর রকেটে এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী অর্থাৎ ভারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব নয়। তথাপি প্রথম পরীক্ষামূলক বৈদ্যুতিক রকেট-ইঞ্জিনগুলির নমুনা ইতিমধ্যেই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে এসেছে।

রকেটের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি ও যন্ত্রসমাহার। রকেটের সাথে পরিচয় শুরু করেছি ইঞ্জিন দিয়ে। তবে পরিবহনকারী রকেটেও বহুসংখ্যক জরুরী গ্রন্থি ও যন্ত্রসমাহার আছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। অন্য যে কোন উড্ডয়নশীল যন্ত্রের মতই রকেটকে হতে হবে অত্যধিক হাল্কা এবং একই সময়ে মজবুত। কিন্তু এ দুটো গুণকে একসাথে সংযুক্ত করা বেশ কঠিন। এতদসত্ত্বেও রকেট নির্মাণকারীরা এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা বৃহদাকার জ্বালানীর ট্যাঙ্কগুলিকে রকেটের অবয়ব হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করেছেন
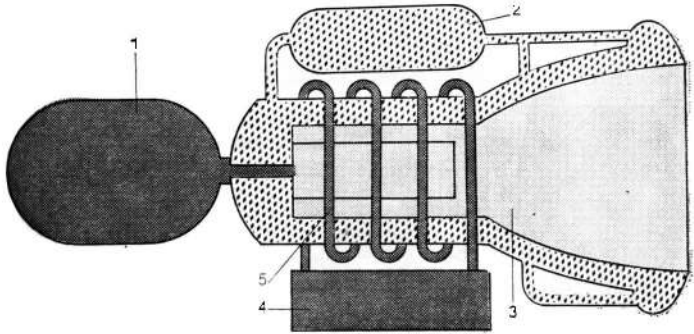
ইলেক্ট্রো-থারমাল রকেট-ইঞ্জিনের নক্শা
1 — ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স; 2 — শীতলক; 3 — বহির্গমন নল; 4 — হাইভোল্টেজ ইলেক্ট্রিক জেনারেটর; 5 — আবেশ কুণ্ডলী

এবং ফলস্বরূপ ওজন হ্রাসে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা রকেটের জন্য অধিকতর মজবুত সংকর প্রস্তুত করেছেন।

কোন যানবাহনই স্টিয়ারিং ছাড়া চলতে পারে না। রকেটেও স্টিয়ারিং আছে। প্রথম দিকের রকেটগুলিতে বহির্গমন নল হতে গ্যাসের নির্গমনপথের সন্ধিক্ষণে স্থাপিত ধাতব প্লেট স্টিয়ারিঙের কাজ করতো। স্টিয়ারিং-হুইলের সমতলের সাথে ধাক্কা লাগার পর গ্যাসের ধারা দিক্ পরিবর্তন করতো এবং রকেট মোড় নিত। কিন্তু অতিতপ্ত গ্যাসের ধারা, এমনকি দুর্গল ধাতুসমূহের জন্যও উপযুক্ত মাধ্যম নয়। এ কারণে কিছু আধুনিক রকেটের মূল ইঞ্জিন বহুমুখী কব্জার সাহায্যে নির্দিষ্ট কোণে মোড় নিতে পারে, অন্য কিছুসংখ্যক রকেটে উপরন্তু বিশেষ ধরনের স্টিয়ারিঙ রকেট-ইঞ্জিনে স্থাপন করা হয়। একই রকেটে বেশ ক'টি স্টিয়ারিঙ-ইঞ্জিন থাকতে পারে এবং এই ইঞ্জিনগুলি স্থাবরও হতে পারে। এক্ষেত্রে গতিপ্রাপ্তির সময়
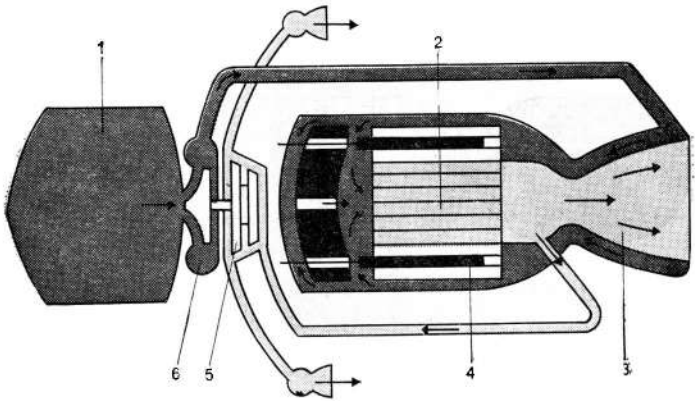
নিউক্লিয়ার রকেট-ইঞ্জিনের নক্‌শা

1 — তরল হাইড্রোজেন; 2 — রি-এ্যাকটর কুপেল; 3 — বহির্গমন নল; 4 — নিয়ন্ত্রণকারী কলাম; 5 — টারবাইন; 6 — পাম্প

এ ধরনের ইঞ্জিনগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে চালু হয়।

বহু রকেট রকেটস্তর নামে পরিচিত। এই রকেটগুলি দুই বা তিনটি রকেটের সমন্বয়ে গঠিত। ক. আ. ৎসিওলকোভ্‌স্কি এ ধরনের রকেটের নামকরণ করেছিলেন রকেট-রেলগাড়ী। অঙ্গীভূত রকেটের স্তরগুলি সাধারণত ক্রমানুসারে কাজ করে। শুরুতে সমস্ত 'রেলগাড়ী'কে চালায় প্রথম স্তর। যখন প্রথম স্তরের সব জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে যায় তখন প্রথম স্তর রকেট থেকে আলাদা হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে উড্ডয়নশীল যন্ত্রের ভর কম হয়। এরপর দ্বিতীয় স্তরের ইঞ্জিন চালু হয়। রকেটের অবশিষ্ট অংশসমূহের ভরবেগ সঞ্চারের কাজ চালাতে থাকে দ্বিতীয় স্তরের ইঞ্জিন। এরপর দ্বিতীয় স্তরটিও পরিত্যক্ত হয়। এবার তৃতীয় স্তরের পালা। এই স্তরটি (রকেটটি যদি তিন স্তরের হয়) শুধু প্রয়োজনীয় বোঝা বহন

করে। আর এই প্রয়োজনীয় বোঝাটি হল স্বয়ংক্রিয় স্টেশন বা নভযান এবং শুধুমাত্র এই স্বয়ংক্রিয় স্টেশনটিই প্রয়োজনীয় মহাজাগতিক বেগ অর্জন করে।

সাধারণত শেষ স্তরে সরঞ্জাম-মডিউল স্থাপিত হয়। সেখানে রকেটের উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি থাকে। এখান থেকে আদেশ দেওয়া হয়: ইঞ্জিন চালু অথবা বন্ধ করার আদেশ, স্তর আলাদা করার আদেশ, উড্ডয়নের দিক পরিবর্তনের কিম্বা প্রয়োজনীয় বেগ বজায় রাখার আদেশ ইত্যাদি।

রকেটের ঊর্ধ্বাংশ সর্বদাই তীক্ষ্ম আকৃতির হয় এবং ফ্লো-রাউন্ডে ঢাকা থাকে। বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তর অতিক্রম করার সময় ফ্লো-রাউণ্ড বাতাসের প্রতিরোধ কম করে। ফলে উত্তোলনের সময় জ্বালানী কম খরচ হয়। এছাড়াও কক্ষপথে রকেট স্থাপনের সময় ফ্লো-রাউণ্ড তার নীচে লুক্কায়িত স্টেশন বা নভযানকে বায়ুর ঘর্ষণ ও অতিরিক্ত তপ্ততার হাত থেকে রক্ষা করে। রকেট যদি নভচারী সহ নভযানকে পরিবহন করে, তাহলে রকেট-শীর্ষে আর একটি নাতিবৃহৎ রকেট স্থাপন করা হয়। উৎক্ষেপণের শুরুতে কিম্বা উড্ডয়নের প্রথমভাগে দুর্ঘটনা ঘটলে নভচারীদের বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এই নাতিবৃহৎ রকেটটি নভচারীসম্বলিত কেবিনটিকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিতে পারে।

উৎক্ষেপণ-সমাহার হতে মহাশূন্যে। নতুন বিমানগুলিকে তাদের স্থায়ী কার্যালয়ে উড়িয়ে আনা হয়। ডক-ইয়ার্ড থেকে নির্দিষ্ট সমুদ্র-বন্দর পর্যন্ত সামুদ্রিক জাহাজ আপন পথে গিয়ে পৌঁছায়, কিন্তু রকেটপ্রস্তুতকারী কারখানা থেকে উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র পর্যন্ত — সবটুকু রাস্তাজুড়েই রকেটকে বহন করা হয়। প্রায়ই সাধারণ রেলগাড়ীর বগিতে রকেট বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমান এ কাজের জন্য খুবই

ছোট। রকেটের স্তরসমূহকে উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে আনা হয়েছে। এখান থেকে 'রকেট-রেলগাড়ী' মহাকাশ ভ্রমণ শুরু করবে। মহাকাশ-বন্দরের দৃশ্যপটের দিকে চোখ ফেরানো যাক। প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সাংযোজনিক-পরীক্ষামূলক ব্লকের বিশাল অট্টালিকা। এখানে রকেট সংযোজন ও পরিদর্শন করা হয়। সেতুবত ক্রেন এবং রকেট সংযোজনের জন্য রেল-বগি ছাড়াও এই ব্লকে বহুসংখ্যক নিয়ন্ত্রণমূলক যাচাইকারী যন্ত্রপাতি আছে। এখানে রকেট-স্তরের সকল গ্রন্থি ও যন্ত্রসমাহার পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। কেননা পরিবহনের সময় যে কোন ত্রুটির উদ্ভব হতে পারে। এছাড়া শুধুমাত্র সম্পূর্ণভাবে সংযোজিত রকেটেই রকেটের সব স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করা সম্ভব।

আর পার্শ্ববর্তী দালানে নভযানকে এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। শুধুমাত্র নভযানের সবগুলো সিস্টেম নিখুঁতভাবে কাজ করলেই যানটির সাথে রকেটের সম্মিলন ঘটতে পারে।

অবশেষে যখন সব বিশেষজ্ঞই সন্তুষ্ট, তখন নভযানকে রকেটের সাথে ডকিং করানো হয় এবং ফ্লো-রাউন্ডের পাল্লা দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উৎক্ষেপণ-সমাহারের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে পরিবাহী-স্থাপনকারী রেল বগি। রকেটটি লিফটিং-ডেরিকের উপর শায়িত থাকে। লিফটিং-ডেরিক হল এমন একটি ধাতব গঠন যা কবজা দ্বারা পরিবাহকের প্ল্যাটফর্মের সাথে আটকানো থাকে। রেল-বগি রকেটটিকে নিয়ে এখন স্টার্টিং পজিশনের দিকে ছুটে চলে।

পরিবাহক একটি বৃহদায়তন ফেরোকংক্রীটের ভবনের সামনে থামে। ধূসরবর্ণের পাথরের এই অতিবৃহৎ ভবনটিকে দেখে বাঁধের কথা মনে পড়ে। আমাদের সামনে উৎক্ষেপণ-সমাহারের উৎক্ষেপণমঞ্চ। এখন রকেটটিকে খাড়া অবস্থায় — ওয়ার্কিং কন্ডিশনে — স্থাপন

করতে হবে। পরিবাহকের হাইড্রলিক জ্যাক্‌গুলিকে চালু করা হয়েছে। লিফটিংডেরিক রকেট সহ প্ল্যাটফর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে রকেটটি মৃদুভাবে উৎক্ষেপণমঞ্চের উপরিভাগে নেমে আসে। উৎক্ষেপণমঞ্চের উপরিভাগের নাম লান্‌চিঙ সিস্টেম (Launching System)। পাশাপাশি উত্তোলিত হয় সুউচ্চ ধাতব গার্ডার (girder)। এটা কেবল-মাস্তুল এবং সার্ভিস-টাওয়ার। টাওয়ারটি রকেটের খুব কাছাকাছি এসে বিভিন্ন উচ্চতার ক্ষেত্র দ্বারা চারিদিক থেকে রকেটটিকে পরিবেষ্টিত করে। লিফ্‌টের সাহায্যে ক্ষেত্রগুলিতে পৌঁছানো যেতে পারে। কেব্‌ল-মাস্তুল থেকে রকেটের হ্যাচ্‌-ওয়ে পর্যন্ত তড়িৎ-কেব্‌লের মোটা তন্তু বিস্তৃত। নভযানে বৈদ্যুতিক শক্তির নিজস্ব উৎস আছে, তবে উড্ডয়নের সময় তার প্রয়োজন হবে। আপাতত উৎক্ষেপণ-সমাহারের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে উড্ডয়নযানের সকল সিস্টেমের যাত্রাপ্রারম্ভিক পরীক্ষার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

এই কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হয়। সব কটি সিস্টেমই কার্যোপযোগী করা হয়েছে এবং তারা নির্বিঘ্নে কাজ করছে। জ্বালানী-বিশেষজ্ঞদের জন্য কঠিন সময় শুরু হয়। ভূ-গর্ভস্থ গুদাম থেকে পাম্প-স্টেশনগুলির সাহায্যে রকেটের ট্যাঙ্কগুলিতে শত শত টন জ্বালানী ও

নভযান সহ বহুস্তর বিশিষ্ট রকেটের যাত্রাশুরু ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন
1 — যাত্রাশুরু; 2 — প্রথম স্তরের বিচ্ছিন্নকরণ; 3 — হেড-ফেয়ারিং-এর নিক্ষেপণ ও এমারজেন্সি-রিকভারি ইঞ্জিনের এবং দ্বিতীয় স্তরের বিচ্ছিন্নকরণ; 4 — নভযানের কক্ষপথে অনুপ্রবেশ এবং তৃতীয় স্তরের বিচ্ছিন্নকরণ; 5 — কক্ষপথে নভযানের পরিক্রমণ; সৌর ব্যাটারী ও এ্যানটেনার উদ্‌ঘাটন; 6 — ইঞ্জিনের ব্রেক-সিস্টেম চালু করা; 7 — নভযানের মডিউলগুলির বিচ্ছিন্নকরণ; 8 — বায়ুমন্ডলে নিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ; 9 — মূল প্যারাসুটে বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে অবতরণ; 10 — সফ্‌ট-ল্যান্ডিং ইঞ্জিন চালু করা

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
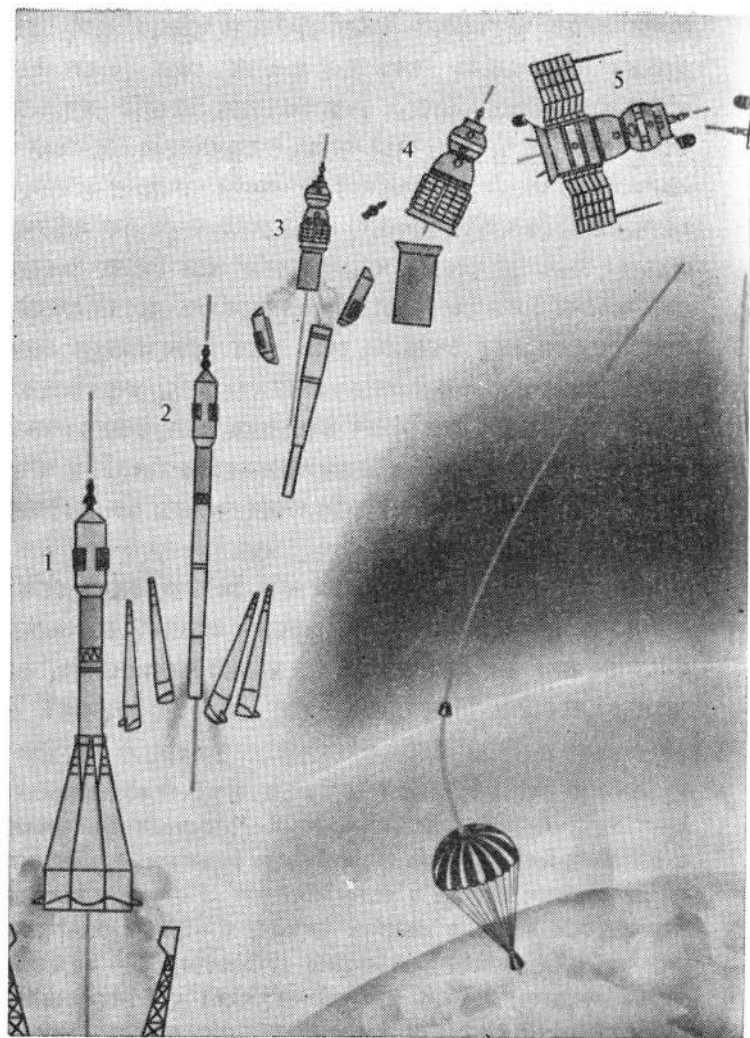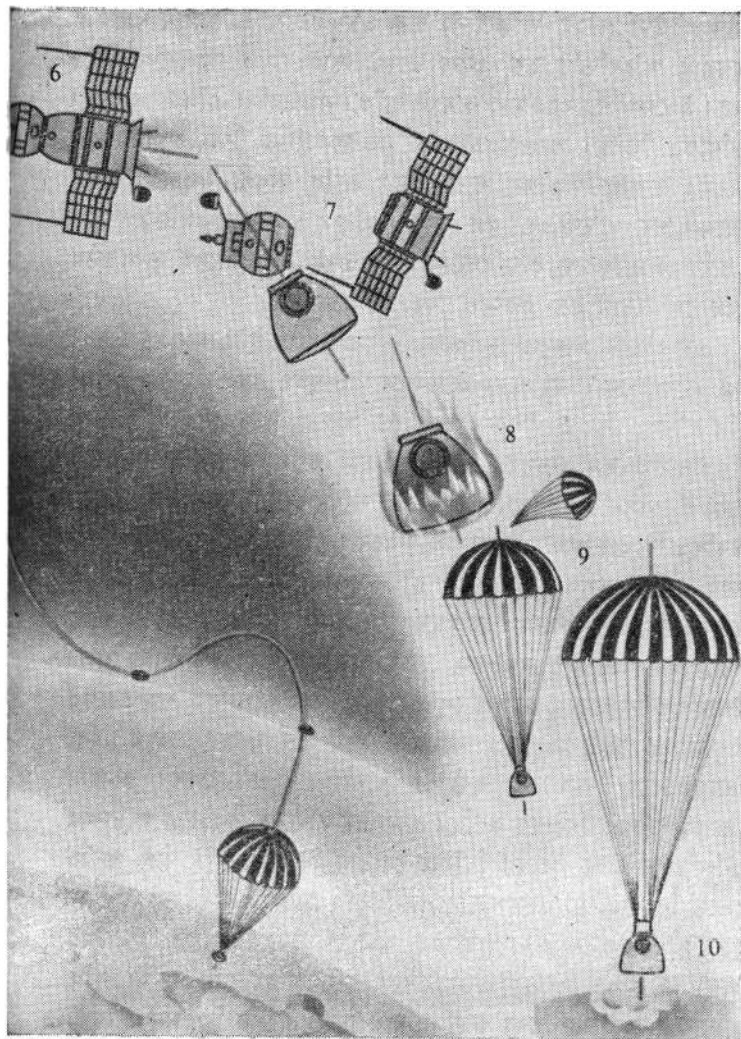
অক্সিডাইজার (তরল অক্সিজেন) ভরা হয়। তরল অক্সিজেন বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়, ফলে রকেট সাদা মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। উৎক্ষেপণের আর মাত্র ক'ঘণ্টা বাকি। নভচারীরা এগিয়ে আসেন। ক্ষণিকের বিদায়। তারপর চালকরা নভযানে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়। এবার অবশ্য নভচারী সহ। উৎক্ষেপণের দু'ঘন্টারও কম সময় বাকি। চালকদের মডিউলটিকে বায়ুরোধকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন নভচারীদের ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে যোগাযোগ হয় একামাত্র বেতারের মাধ্যমে।

এই বইয়ের লেখকদের একজন — সোভিয়েত ইউনিয়নের নভচারী ইউ. ন. গ্লাজকোভ মহাশূন্য অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে বর্ণিত বহু ক্রিয়াই তিনি নিজহাতে সম্পন্ন করেছেন।

«'সায়ুজ-২৪' নভযানে প্রথমে ঢুকলাম আমি। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়রের কাজের আসনটি কেবিনের গভীরে, অধিনায়কের আসনের পেছনে অবস্থিত। অবশেষে এলেন অধিনায়ক। ভিক্‌তর ভাসিলিয়েভিচ গরবাতকো কক্ষপথ-মডিউলের পরীক্ষা শেষে আমার পাশের আসনটি গ্রহণ করলেন। বেতার যোগাযোগ মাধ্যম পরীক্ষা করতে শুরু করলোম। বেতারযন্ত্র চালালাম, হেড্‌ফোনে খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল। উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ শোনা গেল: 'আলট্রাসোনিক শব্দতরঙ্গের ট্রান্সমিটার চালু করুন'। আমরা আদেশমত কাজ করলাম এবং নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। অন্যান্য সিস্টেমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছি। আমাদের সামনের প্যানেলে ক্ষুদ্রাকার টেলিভিশন চালু আছে। বিভিন্ন বোতাম টিপলাম। টি. ভি. পর্দায় ভেসে ওঠে: ইঞ্জিনে গ্যাসের চাপের হিসাব, কেবিনে বাতাসের উপাদান ইত্যাদি। এভাবে একের পর এক আমরা নভযানের সকল সিস্টেমই 'পরীক্ষা' করি। স্পেস্‌স্যুট ঠিক করার সময় হয়েছে। দস্তানা পরি, বায়ুনিরোধক শিরস্ত্রাণের কাঁচ নামিয়ে দিই। এরপর নির্গমন ভাল্‌ভ্‌
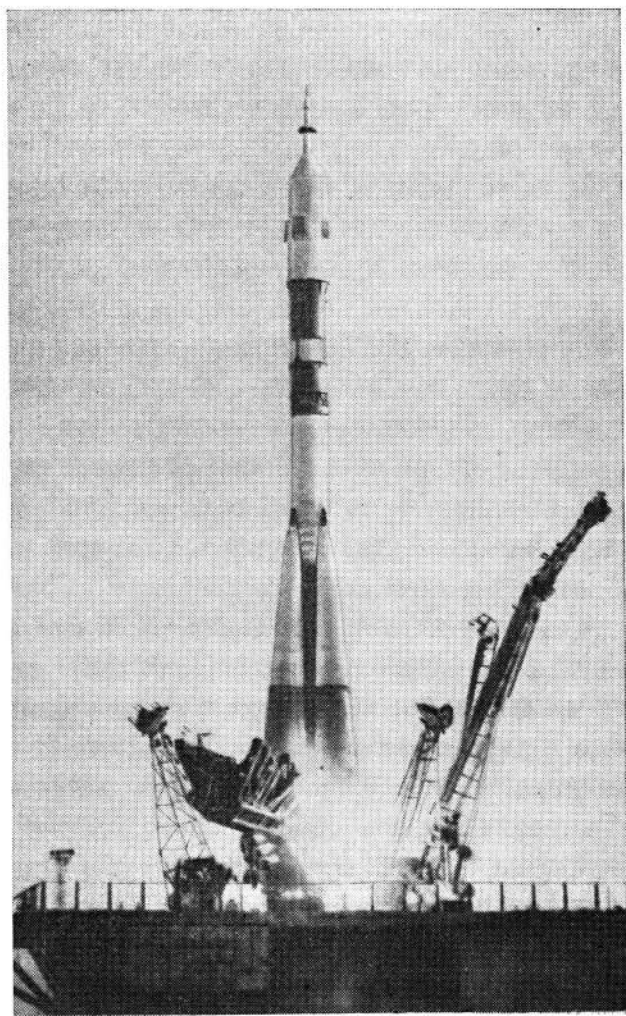
যাত্রাশুরুর আগে

খুলে দিই। সিলিণ্ডার থেকে ঘনীভূত বায়ু স্পেস্‌স্যুটে আসতে থাকে। হাতে-বাঁধা যন্ত্রের সাহায্যে চাপ পরীক্ষা করে দেখি। সব কিছুই ঠিক আছে। আমরা উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত»।

মহাজাগতিক রুটিন পৃথিবীর রুটিনের তুলনায় অনেক নিখুঁত। যদি ট্রেন বা বিমান চলাচল মিনিটের হিসাবে হয়, তাহলে উৎক্ষেপণ-সমাহারে সবকিছুই সেকেণ্ডের হিসেবে চলে। এ কারণে কাজের রুটিন মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য, পূর্বনির্ধারিত অনুক্রমে সব কাজ সম্পন্ন করা উচিত।

উৎক্ষেপণ-সমাহারের প্রতিটি অংশই বিশেষ ধরনের নিখুঁত ঘড়িতে সজ্জিত, যা সময়ের এককীকরণ পদ্ধতি সৃষ্টি করে। এর সঙ্কেতের ফলে বিভিন্ন সিস্টেমের, স্টার্টিং কমপ্লেক্স এবং সমগ্র উৎক্ষেপণকেন্দ্রের কার্যাবলি সমন্বয় করা সম্ভব; এই সংকেতের সাহায্যে রকেটের প্রাক্‌যাত্রাকালীন প্রস্তুতির, উৎক্ষেপণ ও উড্ডয়ন কালে বহুসংখ্যক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের কাজের শুরু ও অন্তের সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রাক্‌যাত্রাকালীন সব কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্টার্টিং দলের শেষ প্রতিনিধিরাও এখন আশ্রয়স্থলে চলে যাচ্ছেন। পাঁচমিনিটের প্রস্তুতি ঘোষণা করা হয়েছে। এখন অদূরে বাংকারে অবস্থিত কমাণ্ড-পোস্টে রকেট ও নভযান নিয়ন্ত্রণের সবকিছু কেন্দ্রীভূত হয়েছে। টি. ভি. পর্দায় নভচারীদের শান্ত মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে। তাদের সাথে প্রতিনিয়ত বেতার যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

উড্ডয়নের আর কয়েক সেকেণ্ড বাকি। রকেট থেকে সার্ভিস-টাওয়ার ও কেব্‌ল-মাস্তুল সরানো হচ্ছে।

স্টার্ট! ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজ সবকিছুকে বধির করে তোলে। রকেটের নীচে থেকে ক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অগ্নিঝড় চতুর্পার্শ্বের সবকিছুকে গিলে ফেলছে। তবে এ অনুভূতি

প্রতারণামূলক। গ্যাস নির্গমনকারী নলগুলি উত্তপ্ত গ্যাসকে উৎক্ষেপণমঞ্চ ও রকেট থেকে দূরে চালিত করে। এখন ইঞ্জিনগুলি পূর্ণ শক্তিতে কাজ শুরু করেছে এবং তাদের আকর্ষণ-বল রকেটের ওজনকে ছাড়িয়ে গেছে। সমর্থনকারী বাহু থেকে মুক্ত হয়ে মহাকাশযানটি কেঁপে ওঠে, ধীরে ধীরে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন, ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অবশেষে ঊর্ধ্বে আকাশ পানে ছুটে চলে।

«আদেশ শোনা গেল: 'উত্তোলন,' এবং আমরা দূর থেকে বজ্রধ্বনি শুনতে পেলাম — এই শব্দ, বহুনীচে প্রথম স্তরের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ। বজ্রনাদ তীব্রতর হচ্ছে, সকল ধ্বনিই একত্রিত হয়ে অখন্ড গর্জন হচ্ছে। অবশেষে রকেট উৎক্ষেপণমঞ্চ হতে ধীরে ধীরে আলাদা হচ্ছে। তারপর একটু আন্দোলিত হয়ে ঊর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে। উড্ডয়ন শুরু হল। আমরা পৃথিবীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি: '40 সেকেন্ড — উড্ডয়ন স্বাভাবিক...'। যতক্ষণ পর্যন্ত ইঞ্জিন কাজ করছে, ততক্ষণ বিশেষজ্ঞরা প্রতিপন্ন করে যাবেন যে, ইঞ্জিনের কাজের পরামিতি হিসাবের সাথে সমন্বিত আর মহাকাশযানের কৌণিক বিসরণ গ্রাহ্যসীমার মধ্যে।

রকেট ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর দূরত্বে উড়ছে। তবে উৎক্ষেপণ-সমাহারের সাথে তার যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। অপটিক্যাল যন্ত্রপাতির লেন্সের সাথে সাথে মহাকাশযানের উপর দৃষ্টি রাখে রাডার স্টেশনের এ্যানটেনা। টি. ভি. পর্দায় মহাকাশযানটিকে চলমান উজ্জ্বল বিন্দু বলে মনে হয়। নভযানের রেডিও তরঙ্গে উৎক্ষেপণ-সমাহারের সব ক'টি বেতারকেন্দ্রই সমন্বিত।

ওভার-লোডিং বাড়ছে। ভিক্‌তর গরবাতকো রিপোর্ট দিচ্ছেন: 'অবতরণ-মডিউলে চাপমাত্রা স্বাভাবিক।' বাস্তবত, আমাদের কেবিনে (অবতরণ- মডিউলে) আগের মতই স্বাভাবিক 'কক্ষমধ্যস্থ' অবস্থা বজায় আছে। মহাকাশযান আরও ঊর্ধ্বে উঠছে। শুনতে পাচ্ছি,
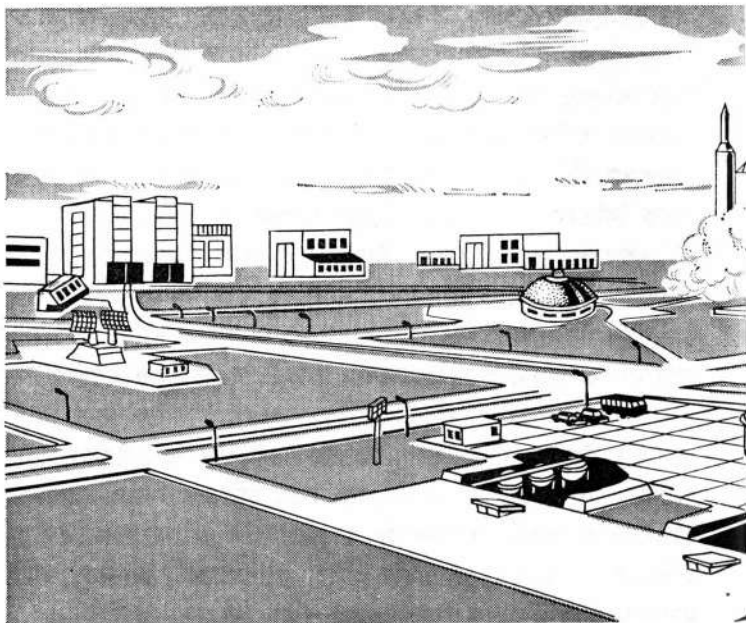
উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

প্রথম স্তরের কপিকলকে বিচ্ছিন্নকারী পাইরোচাক (pyrochuck) কিভাবে কাজ করতে শুরু করল। সাথে সাথেই ওভার-লোডিং কম হতে শুরু করেছে। এবার 'রকেট-রেলগাড়ীর' অবশিষ্ট অংশকে দ্বিতীয় স্তরের ইঞ্জিনসমূহ লক্ষে নিয়েছে এবং ওভার-লোডিং পুনরায় বাড়ছে।

বায়ুমন্ডলের ঘন স্তরগুলি নীচে পড়ে থাকছে। এখন আর লঘুকৃত (rarefied) বায়ু নভযানের জন্য বিপজ্জনক নয়। শীর্ষক ফ্লো-রাউন্ডের পাল্লা খুলে যাচ্ছে এবং নীচে পতিত হচ্ছে। অবগুণ্ঠিত
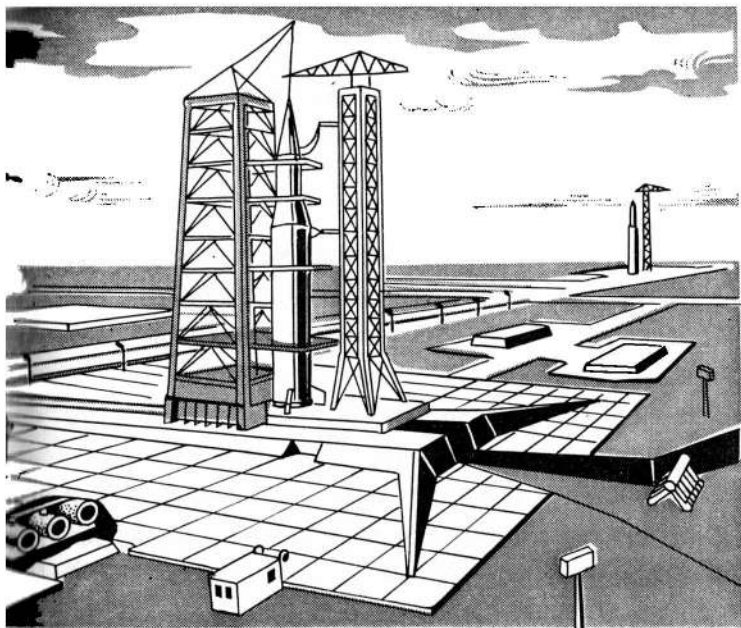
পোর্টহোলে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ ও উজ্জ্বল অকম্পিত নক্ষত্ররাজী দেখতে পাচ্ছি: পৃথিবীর যে দিক জুড়ে এখন রাত, সে দিক দিয়ে আমাদের 'সায়ুজ-২৪' নভযান কক্ষপথে প্রবেশ করছে। দ্বিতীয় স্তরটিও নীচে পতিত হচ্ছে এবং তৃতীয় স্তরের ইঞ্জিনগুলি কাজ করতে শুরু করেছে। এখন আমরা প্রায় সমান্তরালভাবে উড়ে চলেছি। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ হওয়ার জন্য নভযানটিকে প্রথম মহাজাগতিক বেগ লাভ করতে হবে।

যন্ত্রপাতির কম্পনধ্বনি শোনা যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে কেউ যেন

প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে নভযানটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটু আগে যে বেল্টগুলি আমাদেরকে আসনের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছিল, মুহূর্তের মধ্যে আমরা সেই বেল্টগুলিতে ঝুলছি। যানমধ্যস্থ জার্নালগুলি আর হাতকে আকর্ষণ করে না, একেবারে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুতায় বাঁধা পেন্সিল। ওজনশূন্যতা!

যানমধ্যস্থ সিস্টেমগুলি রুটিনমাফিক পরীক্ষা করতে শুরু করছি — তবে এবার কক্ষপথে। কয়েকমিনিটের মধ্যেই পোর্টহোল দিয়ে সূর্যের চোখ ধাঁধাঁনো আলো এসে পোঁছতে শুরু করল। নীচে এবং ডানদিকে পৃথিবীর বক্র দিগন্তরেখা, শুভ্র মেঘপুঞ্জ সহ সুনীল বায়ুমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমাদের নীচে ভেসে চলেছে বন আর মাঠ, সমুদ্র, হ্রদ আর নদী-নালা, বরফে আবৃত পর্বতচূড়া। এখনই কাজ শুরু করতে হবে। অধিনায়ক নিয়ন্ত্রণের ফলাফল রিপোর্টে জানানো প্রায় শেষ করে ফেলেছেন এবং কক্ষপথে প্রথম ম্যানুভারের প্রস্তুতির সময় হয়েছে।»

কক্ষপথে নভযান

বেশীদিনের কথা নয় — ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ইউরি গাগারিনের কিংবদন্তীর মত প্রখ্যাত 'ভস্‌তোক' নভযানটি মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছিল। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক নভযান মহাশূন্যে ঘুরে এসেছে।

এই যানগুলি বহুলাংশে পরস্পরের সদৃশ। এ কারণে আমরা যেভাবে মোটরগাড়ী বা বিমানের কথা বলি (গাড়ী বা বিমানের ট্রেডমার্ক বা রকমভেদের হিসাব না করে), ঠিক তেমনিভাবে নভযানের কথা বলতে পারি।

নভযানের নির্মাণ প্রণালী। আমরা সোভিয়েত নভযান 'সায়ুজ-এর, যা 'ভসতোক' ও 'ভসখোদ' নামের নভযানগুলির স্থান দখল করেছে, দৃষ্টান্তে নভযানের সাথে আমাদের পরিচয় শুরু করবো। এই নভযানের দৈর্ঘ্য ৭·৫ মিটার, সর্বোচ্চ ব্যাস প্রায় ৩ মিটার এবং যানটি তিনটি মূল মডিউলের সমন্বয়ে গঠিত।

দীর্ঘদিনব্যাপী মহাশূন্যে উড্ডয়নকালে নভচারীরা কক্ষপথ-মডিউলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। কক্ষপথ-স্টেশনের সাথে নভযানের ডকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ডকিং ইউনিটটিকেও এই মডিউলে স্থাপন করা হয়। কক্ষপথে স্থাপনের সময়, ডকিং এবং পৃথিবীতে অবতরণের সময় নভচারীরা যে অবতরন-মডিউলে অবস্থান করেন তার সাথে কক্ষপথ-মডিউলকে সংযুক্ত করে বৃত্তাকার হ্যাচ-ওয়ে।

অন্তর্বর্তী হ্যাচ-ওয়েটিকে বন্ধ করে অবতরণ-মডিউলকে নির্ভরযোগ্যরূপে কক্ষপথ-মডিউল থেকে অন্তরিত করা হয়। এর ফলে উন্মুক্ত মহাশূন্যে বিচরণের জন্য কক্ষপথ-মডিউলকে বায়ুশূন্য করে স্লুইস-চেম্বার বা জল-কপাট প্রকোষ্ঠ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। অবতরণ-মডিউলে নভচারীদের জন্য বিশেষ ধরনের আসন আছে। ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ ও কক্ষপথ হতে অবতরণের সময়কার ওভারলোডিং-কে সহজে সহনীয় করার জন্য নভচারীরা এ আসনগুলিতে না বসে, শুয়ে থাকেন। এজন্য আসনগুলিতে চালকদের দেহের সঠিক মাপের তথাকথিত ফর্ম-ফিটিং কাউচ (form-fitting couch) আছে।

আসনের বাম ও ডানদিকে কন্ট্রোল-নব আছে। এই নবগুলি ঘুরিয়ে নভযানকে তার ভরকেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরানো যায় অথবা মহাশূন্যে নভযানের দিক পরিবর্তন করা যায়। সন্নিকটেই বেতার যোগাযোগ সিস্টেম চালু করার বোতাম। স্পেসস্যুট পরে কাজ করার সময় এটা খুবই সুবিধাজনক।

নভযান 'সায়ুজ'
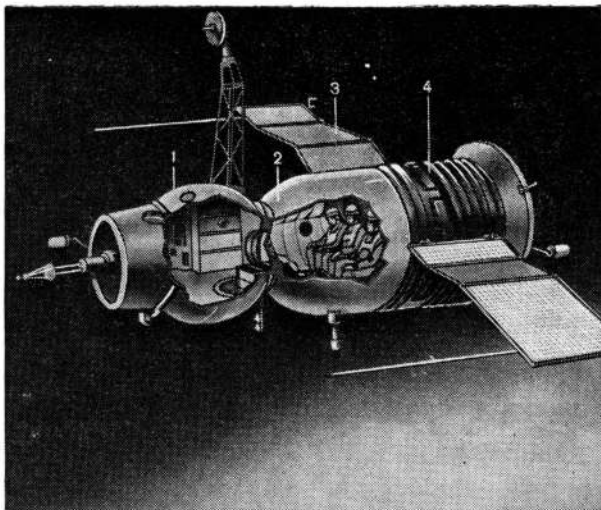
1 — কক্ষপথ-মডিউল; 2 — অবতরণ যন্ত্র; 3 — সৌরব্যাটারীসমূহের প্যানেল; 4 — এ্যাসেম্বলি-মডিউল

নভচারীদের সামনে নভযান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় প্যানেল। তার ডানে ও বাঁয়ে নির্দেশক-সংকেত জ্ঞাপনকারী যন্ত্রপাতি। এখান থেকে নভযানের সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় প্যানেলে বহুসংখ্যক যন্ত্রপাতি আছে। তাদের কয়েকটির কথা এখানে বলবো।

মহাশূন্যে সব কাজই বাঁধা সময়ে চলে। স্পেস্-ঘড়িতে শুধু তৎকালীন সময় নির্দেশকই নয়, এখানে একটি স্টপ-ওয়াচও আছে, যাকে ইচ্ছামত চালানো ও বন্ধ করা যায়। আসলে ব্যাপারটা হল এই যে, নভযানের নিয়ন্ত্রণ অনেকগুলি নির্দেশাবলীর উপর নির্ভরশীল

এবং এই নির্দেশগুলি অতিসূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দিতে হবে।

আরও একটি চিত্তাকর্ষক যন্ত্র হল নেভিগেশান-গ্লোব। এই গ্লোবটি দেখে সবসময় জানা সম্ভব — এখন পৃথিবীর উপরিভাগের কোন অংশে উড়ে চলেছে নভযান। যদি আকস্মিকভাবে উড্ডয়ন সমাপ্ত করতে হয়, তাহলে নভচারী গ্লোব দেখে অবতরণস্থল পছন্দ করতে পারেন। গ্লোব দেখেই নভচারীরা জানতে পারেন কখন নভযানটি পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করছে এবং কখন পৃথিবীর ছায়া ত্যাগ করছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা, পৃথিবীর উপরিভাগে নভযানের অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদির জন্য এর প্রয়োজন। এই যন্ত্রের সাহায্যে নভচারী জানতে পারেন, ইতিমধ্যে কতগুলি পরিক্রমণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে পরিক্রমণের কোন পর্যায়ে যানটি অবস্থান করছে। অবশ্য প্যানেলের সব যন্ত্রের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তবে এটুকু আরও বলতে চাই যে, এখানে আরও কতগুলো সরঞ্জাম বসানো আছে, যার সাহায্যে কক্ষপথ-স্টেশনের নিকটবর্তী হওয়া এবং স্টেশনের সাথে নভযানের ডকিং প্রণালীটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অধিনায়কের সামনের কেন্দ্রীয় প্যানেলে বিভিন্ন রঙের একসারি সংকেত প্রদানকারী যন্ত্র স্থাপিত। সবুজ বাতি জ্বললে — 'সব কিছু ঠিক আছে', হলুদ বাতি জ্বলার অর্থ 'মনোযোগ দিয়ে দেখ', লাল বাতি অর্থাৎ 'বিপদ, সক্রিয় হও'! এ ছাড়াও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কম্পমান আলোর শিখার ইণ্ডিকেটর-প্যানেল এবং ধ্বনি-সংকেত ব্যবহৃত হয়। অবতরণ-মডিউলের হালের (hull) বহির্ভাগে অবতরণ-নিয়ন্ত্রক ইঞ্জিন এবং নিরাপদ অবতরণের ইঞ্জিন স্থাপিত।

অবতরণ-মডিউলের পিছনে তৃতীয় — এ্যাসেম্বলি মডিউলের অবস্থান। এখানে নভযানের মুখ্য ইঞ্জিনসমূহ অবস্থিত — ২০টিরও বেশী অনতিবৃহৎ মুরিং-মোটর ও অবস্থান-নির্দেশক ইঞ্জিন,

জ্বালানী-ট্যাঙ্ক, স্বয়ংক্রিয় এবং নভযানের বাসযোগ্য মডিউলে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার সিস্টেমের অংশবিশেষ স্থাপিত হয়। এ্যাসেম্বলি-মডিউলের বহির্ভাগে সৌর ব্যাটারির প্যানেল (সব 'সায়ুজ' নভযানে এ ধরনের ব্যাটারির প্যানেল নেই), এ্যানটেনা এবং তাপনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিকীরক স্থাপিত।

এখন আমরা নভোযানের সিস্টেম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো।

মহাজাগতিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। কক্ষপথে আবর্তনশীল 'সায়ুজ' উড়ন্ত পাখীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সৌর ব্যাটারীর উন্মুক্ত প্যানেলের 'ডানা' নভযানের এ সদৃশতার কারণ। নভযানের সিস্টেমসমূহ ও যন্ত্রপাতির কাজের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, যা তারা পায় সৌর ব্যাটারি (সৌর ব্যাটারি সূর্য-রশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে) এবং রাসায়নিক তড়িৎ-সঞ্চয়ক (chemical accumulator) থেকে। যানমধ্যস্থ নেটওয়ার্কে তড়িৎ-চাপ যখন নির্দিষ্ট মানের নীচে নামে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি তখন সৌর ব্যাটারিগুলিকে তড়িৎ-সঞ্চয়কের সাথে সংযুক্ত করে। এভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির ঘাটতি পূরণ করা হয়।

অবতরণ-মডিউলের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের পরেও শক্তিসঞ্চারক সিস্টেম তার কাজ শেষ করে না। অনুসন্ধানকারী রক্ষকদল না আসা পর্যন্ত বেতারযন্ত্রের এবং ট্রান্সমিটারসমূহের, জীবন-রক্ষক সিস্টেম, নভযান খুঁজে পেতে সাহায্যকারী আলোকসংকেত জ্ঞাপকের কার্যপ্রণালী অব্যাহত রাখে শক্তিসঞ্চারক সিস্টেম।

সম্প্রতি কিছুসংখ্যক নভযানে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হিসাবে ইন্ধন-উপাদান (fuel-element) ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের অসাধরাণ গ্যালভানিক কোষে (galvanic cell) রাসায়নিক শক্তি ইন্ধন ছাড়াই

তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এখানে অক্সিজেন-জারিত হাইড্রোজেনই হল জ্বালানী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তড়িৎপ্রবাহ ও জল উৎপন্ন হয়। পরে এই জল তাপ-নিয়ন্ত্রক সিস্টেমের জন্য বা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উচ্চমানের কার্যকারীতার সাথে সাথে ইন্ধন-উপাদানের একটি বিশেষ সদগুণ হচ্ছে এই যে, তড়িৎ-সঞ্চয়কের তুলনায় ইন্ধন-উপাদানের শক্তিধারণ ক্ষমতা ৪-৫ গুণ বেশী। তবে ইন্ধন-উপাদানের যে কোন ত্রুটি নেই তা নয়। তারমধ্যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এটা ওজনে খুব ভারী।

ঠিক এ কারণেই, এখনও পর্যন্ত মহাশূন্য গবেষণার কাজে পারমাণবিক ব্যাটারি ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কেননা এ ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয় (radioactive) রশ্মির হাত থেকে চালকদের বাঁচানোর জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার, সে ব্যবস্থার কারণে নভযানের ওজন বহুগুণ বৃদ্ধি পেত।

অবস্থান নির্দেশক প্রণালী। রকেটের শেষ স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর, জড়তার কারণে ক্ষীপ্রবেগে ধাবমান নভযানটি বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে থাকে। এই অবস্থায় কোথায় পৃথিবী এবং কোথায় 'আকাশ', নির্ণয় করার চেষ্টা করুন। ডিগবাজী খাওয়া অবস্থায় কেবিনের মধ্যে বসে নভচারীদের পক্ষে নভযানটির অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন, মহাজাগতিক বস্তুর অধ্যয়ন করা অসম্ভব। তেমনি অসম্ভব সৌর ব্যাটারীর পক্ষে কাজ করা। অতএব, নভযানটিকে বাধ্য করা হয় মহাশূন্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে এবং তার অবস্থান নির্ণয় করা হয়। জ্যোতিষিক নিরীক্ষণের জন্য কতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সূর্য অথবা চন্দ্রের আপেক্ষিক দিকস্থাপন করা হয়। সৌর ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎশক্তি পেতে হলে তার প্যানেলগুলিকে সূর্যের

দিকে মুখ-করে রাখতে হয়। দুটি নভযান কাছাকাছি আসার জন্য তাদেরকে একে অপরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করতে হয়।

নভযান অথবা মহাজাগতিক স্টেশনের দিকস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়: যেমন, অপটিক্যাল যন্ত্র, যার সাহায্যে নভচারীরা স্থানীয় লম্ব (পৃথিবী ও নভযানের ভরকেন্দ্রদ্বয়কে সংযুক্তকারী সরল রেখা) থেকে নভযানটির কৌণিক বিচ্যুতি নির্ণয় করেন। স্থানীয় লম্ব ইনফ্রা-রেড লম্ব-যন্ত্র দ্বারা নির্মাণ করা সম্ভব। যন্ত্রটি পৃথিবী ও মহাকাশের তাপের তুলনার ভিত্তিতে কাজ করে।

নভযানটিতে কতগুলি ছোট ছোট স্বক্রিয় ইঞ্জিন আছে। যেগুলিকে ক্রমাগতভাবে চালিয়ে বা বন্ধ করে যানটিকে তার যে কোন অক্ষের উপর ঘোরান যায়।

স্কুলের সহজ জলীয় লাট্টুর পরীক্ষার কথা স্মরণ করা যাক। লাট্টু থেকে বিভিন্ন দিকে সরু নালী দিয়ে জলের ফোয়ারা বের হয়। ফলে সুতায় ঝোলান লাট্টু ঘুরতে থাকে। নভযানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই প্রক্রিয়া হয়। যেহেতু যানটি মহাশূন্যে ওজনহীন সেইহেতু নভযানটিকে যে কোন একটি অক্ষের উপর ঘোরানোর জন্য কোন দুটি বিপরীতমুখী বহির্গমন নলযুক্ত মাইক্রোইঞ্জিন দরকার।

কোন নির্দিষ্ট সমন্বয়ে এই আকর্ষণীয় ইঞ্জিনগুলি চালু করার ফলে নভযানকে শুধুমাত্র ঘোরানই সম্ভব না, তার বেগ পরিবর্তন করা বা তাকে তার প্রারম্ভিক গমনপথ থেকে বিচ্যুত করা যায়।

কিন্তু স্বল্প আকর্ষণের ইঞ্জিন ব্যবহার করে নভযানের খুবই অল্প ম্যানুভার করা সম্ভব। গতিপথের আরও বেশী পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী মূল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হয়।

'সায়ুজ' নভযানগুলির ভ্রমণপথ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ২০০-৪৫০ কি. মি. উঁচুতে অবস্থিত। এত বেশী উচ্চতা থাকা সত্ত্বেও, যেখানে বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম, দীর্ঘ উড্ডয়নের সময় বাতাসে

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গতি হ্রাস করে ও উচ্চতা হারায়। যদি গতিপথকে ক্রমাগত সংশোধন না করা হয় তবে 'সায়ুজ' নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাতাসের ঘন স্তরে প্রবেশ করবে। কাজেই সময় সময় মুখ্য অথবা 'সংশোধনকারী-গতিরোধকারী' ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে নভযানের গতিপথের উচ্চতা বাড়ানো হয়ে থাকে। এই ইঞ্জিনকে কেবলমাত্র উচ্চতা বাড়ানোর জন্যই নয়, ডকিং-এর সময় দুটি নভযানকে কাছাকাছি আনার জন্য, কক্ষপথে বিভিন্ন ম্যানুভার করার জন্য এবং পৃথিবীতে অবতরণের সময় গতিরোধ করার জন্যও ব্যবহার করা হয়। দিক্‌স্থাপন মহাশূন্যেভ্রমণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু নভযানের দিক্‌স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, তাকে এই অবস্থানে সুস্থির করা দরকার। অবলম্বনহীন মহাকাশে এটা মোটেই সহজ কাজ নয়। সুস্থিরতার সবচেয়ে সহজ পথগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ঘূর্ণনের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে ঘূর্ণমান বস্তুর যে গুণ ব্যবহার করা হয় তা হল ঘূর্ণনের সময় বস্তু তার ঘূর্ণনের অক্ষ পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে। যেমন, ছোট বাচ্চাদের খেলনা-লাট্টু প্রায় না থামা পর্য্যন্ত নিজের অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। এই সূত্রের ভিত্তিতে নির্মিত গাইরোস্কোপ জাতীয় যন্ত্রাবলী নভযানের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ প্রণালীতে বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি নভযানের অবস্থান স্মরণ রাখে এবং নিজে থেকেই ইঞ্জিনগুলিকে চালু অথবা বন্ধ করে উক্ত অবস্থানকে ধরে রাখে। নভযানটি একটি বৃহৎ লাট্টুর মতন — তার ঘূর্ণন অক্ষ বেশ কিছু সময় মহাশূন্যে নিজ অবস্থান পরিবর্তন করে না।

যদি সূর্য-কিরণ সৌর ব্যাটারীর প্যানেলের উপর লম্বভাবে পড়ে তবে তাতে উৎপন্ন বিদ্যুতশক্তি সর্বাধিক হয়। অতএব, নভযানের এ্যাকুমুলেটারগুলিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয়কালে সৌরব্যাটারিগুলি সূর্যের দিকে মুখ-করে থাকা প্রয়োজন। এইজন্য নভযানটিকে ঘোরান

প্রয়োজন। প্রথমে, নভচারীরা যানটিকে ঘুরিয়ে সূর্যের অবস্থান খোঁজেন। বিশেষ একটি যন্ত্রের স্কেলের কেন্দ্রস্থলে আলো দেখা গেলে বোঝা যায় যে, যানটির অবস্থান ঠিক আছে। এরপর ছোট ইঞ্জিনগুলির সাহায্যে যানটিকে তার নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরিয়ে তার মুখ সূর্যের দিকে করা হয়।

নভযানের পরিচালনা। মহাকাশে নভযানের অবস্থান রক্ষা করার জন্য ঘূর্ণনই একমাত্র পথ নয়। অন্যান্য ক্রিয়া ও ম্যানুভার সম্পন্ন করে নভযানটিকে দিকস্থাপনকারী সিস্টেমের ইঞ্জিনসমূহের আকর্ষণ দ্বারা সুস্থির করা যায়। এটা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হয়। প্রথমে, নভচারীরা আনুষঙ্গিক ছোট ইঞ্জিনকে চালু করে যানটিকে ঘুরিয়ে প্রয়োজনীয় অবস্থানে আনেন। তারপর এই নিয়ন্ত্রণকারী সিস্টেমের সঙ্গে বিভিন্ন গাইরোস্কোপকে সংযুক্ত করা হয়। গাইরোস্কোপগুলি নভযানের অবস্থান 'স্মরণ' রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত নভযানটি নির্ধারিত স্থানে থাকে ততক্ষণ গাইরোস্কোপগুলি কোন সাড়া দেয় না অর্থাৎ দিকস্থাপনকারী ইঞ্জিনগুলিকে কোন সংকেত দেয় না। কিন্তু নভযানের অক্ষ পরিবর্তনের প্রতিটি মুহূর্তেই গাইরোস্কোপগুলি প্রয়োজনীয় ছোট ইঞ্জিনগুলিকে চালু হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ইঞ্জিনের আকর্ষণের ফলে যানগুলি পুনরায় ঘুরে প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে আসে।

অবশ্য নভযানকে সুস্থির করার জন্য গাইরোস্কোপ ব্যবহার না করে নভচারী নিজেহাতেই ইঞ্জিন চালু করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সঠিক অবস্থান জানা প্রয়োজন। ভূ-পৃষ্ঠে কোন চালক তার যানের অবস্থান নির্ণয় করতে বিভিন্ন স্থির বস্তুর সহায়তা নেন। মহাকাশে নভচারীরা এক্ষেত্রে নিকটবর্তী মহাজাগতিক বস্তুর ও দূরের নক্ষত্রমণ্ডলীর সহায়তা নিয়ে থাকেন।

'সায়ুজে'র নেভিগেটরের সামনে সর্বদাই নেভিগেশন গ্লোব থাকে। এটা 'পৃথিবী'র মডেল, কিন্তু সত্যিকার গ্রহের মতন কখনই মেঘাচ্ছন্ন থাকে না। এটা পৃথিবীর একটা সামান্য আয়তনীয় রূপায়ন নয়। উড্ডয়নের সময় দুটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে গ্লোবটিকে একই সময়ে দুটি অক্ষের চারিদিকে ঘোরান হয়। একটি অক্ষ পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরাল এবং অপরটি নভযানের কক্ষপথের সমতলের সাথে উল্লম্ব। প্রথম গতিটি পৃথিবীর আবর্তন গতিকে অনুকরণ করে এবং দ্বিতীয়টি নভযানের নিজস্ব গতিকে। গ্লোবটির উপর একটি কাঁচের ঢাকনা আছে, ও ঢাকনার উপরে একটি ক্রশচিহ্ন আঁকা থাকে। এর মাধ্যমেই আমাদের নভযানের অবস্থিতি দেখান হয়। যে কোন সময়ে নভচারীরা, এই যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারেন যে, তাদের যানটি পৃথিবীর কোন্ অংশের উপর দিয়ে যাচ্ছে। এই কাজের উদ্দেশ্যে নভচারীরা আমাদের অতিপরিচিত কৌণিক দূরত্বমাপক (Sextant) যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। মহাকাশীয় সেক্সট্যান্ট কিন্তু সামুদ্রিক সেক্সট্যান্ট অপেক্ষা ভিন্ন : এই যন্ত্র ব্যবহারের জন্য ডেকের উপর বার হওয়ার প্রয়োজন থাকে না, কেবিনে বসেই এর ব্যবহার করা যায়।

«কক্ষপথে পেঁছানর ঠিক পরেই আমরা প্রথম ম্যানুভারের জন্য তৈরী হলাম। মহাশূন্য-স্টেশনের সাথে সংযোগের জন্য প্রয়োজন নভযানটিকে তথাকথিত সাংযোজনীক কক্ষে নিয়ে আসা, যেখানে আমাদের সামনে ও কিছু উপরে 'স্যালুট-৫ উড়ছে।

একটি পোর্টহোল দিয়ে পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি। একটি হাতলকে ঘুরিয়ে ভিক্টর ভাসিলিয়েভিচ গোরবাতকো নভযানটির দিক পরিবর্তন করে চলেছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশেষ দৃকযন্ত্রে (optical instrument) পৃথিবী দেখা যায়। নভযান ঘোরাবার সময় একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে প্রয়োজনমত ইঞ্জিন চালু

করে। নভযানটি ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। একসময় দূরবীক্ষণযন্ত্রে পৃথিবীর ছবি দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপর নভযানকে এমনভাবে ঘোরান দরকার যে সংশোধক ইঞ্জিনের বহির্গমন-নলগুলি গতির বিপরীত দিকে ঘোরান থাকে। এই ক্রিয়াকে বলা হয় 'বিক্ষেপ'। কারণ, এর ফলে নভযান বিক্ষিপ্ত হয় ও আরও উঁচু কক্ষপথে চলে যায়।

এখন অধিনায়ক এই ম্যানুভারের কাজ শুরু করবেন। তিনি পুনরায় দূরবীক্ষণযন্ত্রে চোখ রাখলেন। ভূ-পৃষ্ঠের আকৃতি স্পষ্টভাবে যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে। আমাদের নীচে পাহাড় পর্বত খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে। যখন এই 'দৌড়'-এর দিক উপর থেকে নীচে হবে তখনই বোঝা যাবে যে, যানটি তার প্রয়োজনীয় স্থান দখল করেছে। হ্যাঁ, এখন ঠিক স্থানটি পাওয়া গেছে। এবারে গাইরোস্কোপগুলির সাহায্যে নভযানের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হল। এরপরে এই যন্ত্রগুলিই যানটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। নভযানের সামান্য নড়াচড়াতেই তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আদেশে ইঞ্জিনগুলি পুনরায় যানকে তার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সংশোধক ইঞ্জিনের কাজের সময় হয়ে এসেছে। মৃদু ধাক্কা অনুভব করতে পারলাম। ইঞ্জিনের কাজের সময় আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল। কয়েক সেকেন্ড কাজের পর ইঞ্জিন আবার বন্ধ হয়ে যায়। কক্ষের সংশোধন শেষ। আমরা নতুন কক্ষপথে এসে গেছি।»

গরমও নয় ঠান্ডাও নয়। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে নভযানটি কখনও আতপ্ত সূর্য-কিরণে ঢেকে যায়, কখনও বা হিমশীতল আঁধারে। কিন্তু নভশ্চারীরা সবসময়ই হালকা কাপড় পরে কাজ করেন — ঠান্ডা বা গরম কিছুই বোধ করেন না। কেননা

কেবিনের মধ্যে সারাক্ষণ মানুষের সহ্য করার মতন তাপ নির্দিষ্ট করা থাকে। এই অবস্থায় যানের যন্ত্রগুলিও ঠিকভাবে কাজ করে।

উড্ডয়নের পূর্বেই নভযানকে একটি ভ্যাকুম-স্ক্রিনিং আইসোলেশন দিয়ে ঢাকা হয়। এই ধরনের আইসোলেশনে পরপর কয়কে স্তর ধাতু-নির্মিত পর্দা থাকে, যার মাঝখানে উড্ডয়নের সময় বায়ুশূন্যতা (ভ্যাক্যুম) তৈরী হয়। এটা তপ্ত সূর্য-কিরণের পথে বেশ বাধা সৃষ্টি করে। স্ক্রীনগুলির মাঝে খুব কম তাপপরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্লাস-ফাইবার বা অন্য বস্তু থাকে।

নভযানের যে সকল অংশে কোন কারণে এই আইসোলেশন থাকে না সে সকল স্থানে আলোকরশ্মির শক্তিকে প্রতিফলিত করে — এমন কোন আবরণ থাকে। যেমন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের আবরণ তার উপর আপতিত তাপের মাত্র এক চতুর্থাংশ শোষণ করে।

এতদসত্ত্বেও এই ধরনের নিষ্ক্রিয় বস্তুর ব্যবহার করে নভযানকে উত্তাপের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব নয়। কাজেই নভযানগুলিতে বেশী সক্রিয় তাপনিয়ন্ত্রক বস্তু ব্যবহৃত হয়।

নভযানের বায়ুরোধক কামরার আভ্যন্তরীণ দেওয়াল ধাতুর নল দিয়ে ঘেরা। এই নলগুলির ভিতরে তাপ পরিবাহী বিশেষ তরল পদার্থ সঞ্চালিত করা হয়। নভযানের বাইরে তাপপ্রতিফলক হিমায়ন যন্ত্র (রিফ্লেক্টর-রেফ্রিজারেটর) সংযুক্ত করা থাকে যা আইসোলেশন দিয়ে ঢাকা নয়। এর সাথে নলগুলি সংযুক্ত করা হয়। সূর্য-কিরণে উত্তপ্ত তাপ পরিবাহী তরল পদার্থকে কামরা থেকে পাম্প করে এই রেফ্রিজারেটার যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া হয়, যার সাহায্যে অনাবশ্যক তাপকে পুনরায় মহাকাশে ফেরত পাঠান হয়। এরপর শীতল পদার্থ পুনরায় নভযানের ভিতর পাঠান হয়।

তাপপরিবাহী তরল পদার্থের পথ প্রয়োজনমতন বদল করা যায়। যদি নভযানের আভ্যন্তরীণ তাপ কমাতে হয় তবে উক্ত তরল পদার্থের

বেশীর ভাগটা রাখা হয় রেফ্রিজারেশন যন্ত্রে ও কমটুকু নভযানের ভিতরে। যদি তাপবৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে উত্তপ্ত তরল পদার্থের বেশী অংশ নভযানের অভ্যন্তরে পাঠান হয়। এই কাজ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। ফলে নাভযানের সকল অংশেই প্রয়োজনীয় তাপ বজায় থাকে। নভচারীরা নিজস্ব প্রয়োজনমত তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে পারেন।

তাপনিয়ন্ত্রক সিস্টেম দ্বারা যে শুধু মাত্র যন্ত্রপাতি, কেবিন ও বাতাস ঠাণ্ডা করা হয় তা নয়, এর সাহায্যে ইঞ্জিন, জ্বালানী প্রভৃতিকে গরম রাখা হয়। এরজন্য তাপ-প্যানেলকে সূর্য-কিরণের দিকে ঘুরিয়ে উত্তপ্ত তরল পদার্থকে পাম্পের সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়।

উত্তপ্ত বাতাস ঠাণ্ডা বাতাস অপেক্ষা হাল্কা। কাজেই, গরম বাতাস স্বভাবতই উপরে উঠে যায় ও নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসে ভরা থাকে। এর ফলে বাতাসে সঞ্চলন সৃষ্টি হয়। এই প্রাকৃতিক গুণের ফলে আপনার ঘরের যে কোন কোণেই তাপমাত্রা সাধারণত সমান থাকবে।

কিন্তু মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় এই সঞ্চালন সম্ভব নয়। অতএব কেবিনে সর্বদাই পাখার সাহায্যে বাতাসকে সঞ্চালিত করতে হয়।

মহাশূন্যে ঠিক পৃথিবীর মতই। ভূ-পৃষ্ঠে আমরা বাতাসের কথা চিন্তা করি না। আমরা স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিই। কিন্তু মহাশূন্যে শ্বাস নেওয়া একটি বিশেষ সমস্যা। নভযানের চতুর্দিক বায়ুশূন্য। নিশ্বাস নেওয়ার জন্য নভচারীরা পৃথিবী থেকে বাতাস সাথে নিয়ে যান।

মানুষ ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ গ্রাম অক্সিজেন গ্রহণ করে। নভযানে অক্সিজেনকে উচ্চচাপে গ্যাসীয় অথবা তরল অবস্থায় সিলিণ্ডারে

রাখা যায়। কিন্তু এইরূপে ১ কি. গ্রা. তরল অক্সিজেনের জন্য মহশূন্যে ২ কি. গ্রা. ওজনের ধাতুর সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়; আর উচ্চচাপ-পিষ্ট গ্যাসের জন্য আরও বেশী — ১ কি. গ্রা. অক্সিজেনের জন্য প্রায় ৪ কি. গ্রা. ওজনের সিলিন্ডার বহন করতে হয়।

তবে সিলিন্ডারের ওজনের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কেবিনে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিবর্তে এমন কতগুলি রাসায়নিক পদার্থ নেওয়া হয় যাতে অক্সিজেন আছে। কোন কোন ক্ষারধর্মী ধাতুর অক্সাইডে বা তার লবণে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন থাকে— যথা, হাইড্রোজেন পারক্সাইড। তা ছাড়াও এই অক্সাইডগুলির আরও একটি বিশেষ গুণ আছে: অক্সিজেন নিঃসরণের সাথে সাথে তারা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর গ্যাসগুলিকে বিশোষণ করে কেবিনের পারিমন্ডল পরিশোধিত করে।

মানবদেহ অক্সিজেন গ্রহণের সাথে সাথে কার্বন-ডাই অক্সাইড (অঙ্গারাম্লজান), কার্বন মোনোঅক্সাইড (অঙ্গারাম্লজ), জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য নিঃসারণ করে। নভযানের মডিউলগুলির আবদ্ধ আয়তনে পুঞ্জীভূত কার্বন ডাই ও মোনো অক্সাইড নভচরীদের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কেবিনের বায়ুকে ক্ষারধর্মী ধাতুর অক্সাইডের পাত্র — রিজেনারেটররে মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়: অক্সিজেন নিঃসারিত হয়, আর ক্ষতিকর সংমিশ্রণ বিশোষিত হয়। যেমন, এক কিলোগ্রাম পারঅক্সাইডে ৬১০ গ্রাম অক্সিজেন বিরাজমান এবং তা ৫৬০ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড পরিশোধন করতে পারে। বর্তমানে পটাশিয়াম পারঅক্সাইড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

« মাঝে মাঝে আমরা আমাদের কেবিনের পরিমন্ডলের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রণ করি। এজন্য নভযানে একটি বিশেষ সরঞ্জাম আছে — গ্যাস বিশ্লেষক যন্ত্র। যন্ত্রটিকে চালু করে সূচক থেকে জানা

যাবে — বায়ুতে অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও বাষ্পীয় জলের পরিমাণ কত?

এখন প্যানেলের আলোক-সংকেতে শান্ত সবুজ রঙ। অর্থাৎ রিজেনারেটরের মধ্য দিয়ে কেবিনের বাতাসকে বিতাড়িতকারী বায়ু-রন্ধ্র (ventilator) কাজ করছে। উড্ডয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ চালানো যেতে পারে। যদি কেবিনে প্রয়োজনের তুলনায় কম বা মাত্রাতিরিক্ত অক্সিজেন নিঃসারিত হতে থাকে, যদি কেবিনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড জমা হয়, স্বয়ংক্রিয় প্রহরী — গ্যাস বিশ্লেষণ যন্ত্র লাল বাতি জ্বালাবে। এ লাল বাতির দিকে দৃষ্টি না পড়া খুবই অস্বাভাবিক। তবুও আমরা যদি যথাসময়ে এই বিপদসংকেত না দেখে থাকি, তাহলে সাইরেনের তীব্র আওয়াজ আমাদের সতর্ক করে দেবে।»

অক্সিজেন ছাড়া নভচারীরা উড্ডয়নকালে জল ও খাবারের রসদও সাথে নিয়ে যান। পলিথীন আস্তরনের মজবুত আধারে জল সংরক্ষিত থাকে। জল যাতে খারাপ না হয়, যাতে স্বাদ না হারায় এ উদ্দেশ্যে জলে কিছু বিশেষ দ্রব্য — যথা, কনজারভেন্ট — স্বল্প পরিমাণে ঢালা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দশ লিটার জলে এক মিলিগ্রাম সিলভার-আয়ন দ্রবীভূত করলে এই জল অর্ধবর্ষব্যাপী পানের উপযোগী থাকবে।

জলের আধারের সাথে দুটি নল সংযুক্ত। নল দুটির একটি শেষ হয়েছে অর্গল-সম্বলিত মাউথপীসে (mouth piece), অপরটি পাম্প পর্যন্ত বিস্তৃত। পাম্পের সাহায্যে জলের আধারে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি ক'রে নভচারী মাউথপীসটিকে মুখ-গহ্বরে রাখেন; তারপর অর্গলের বোতাম টিপে তিনি জল পান করেন। কেবল এভাবেই মহাশূন্যে পান করা সম্ভব। ওজনশূন্যতায় খোলাপাত্র হতে জল

উপচে পড়ে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকার ধারণ করে কেবিনের মধ্যে ভাসতে থাকে।

প্রথম নভচারীরা মহাশূন্যে যে পেস্ট জাতীয় খাবার সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, 'সায়ুজ'-এর চালকরা তার জায়গায় প্রায় সম্পূর্ণ 'পার্থিব' খাবার খান। নভযানে একটি ছোট্ট রন্ধনশালাও আছে, যেখানে প্রস্তুত খাবার গরম করা হয়।

বহু ছবিতে নভচারীরা স্পেস-স্যুট পরা অবস্থায়, তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ বায়ুনিরোধক শিরস্ত্রানের কাঁচের ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। নভযানের বায়ুনিরোধ ব্যবস্থা বিকল হলে স্পেস-স্যুট নভচারীদের রক্ষা করে।

কেবিনের অভ্যন্তরে চাপ হ্রাস পেলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্পেস-স্যুটের সাথে ঘনীভূত বাতাসের সিলিন্ডার সংযুক্ত করে। উন্মুক্ত মহাশূন্যে কিম্বা অন্য কোন মহাকাশীয় বস্তুপৃষ্ঠে বিচরণের জন্যও স্পেসস্যুট প্রয়োজন।

মানুষের দেহের মাপের বায়ুনিরোধক কেবিনের সাথে প্রায়ই স্পেস-স্যুটের তুলনা করা হয়। এবং এটা ন্যায়সঙ্গত। স্পেস-স্যুট একটিমাত্র পোষাক নয়, বরং একটির উপর একটি পরিহিত পোষাকের সমন্বয়। সাদা রঙ তাপবিকিরক রশ্মিকে ভালভাবে প্রতিহত করতে পারে বলে স্পেস-স্যুটের উপরের তাপসহনকারী পোষাকটি সাদা রঙের। উপরের আচ্ছাদনের নীচে স্ক্রীণ-ভ্যাকুয়াম তাপ-অন্তরণ পোষাক আর তার নীচে — বহুস্তরের আবরণ। এর ফলে স্পেস-স্যুট সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধতার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

স্পেস-স্যুটের একটি আবরণ থাকে বায়ু চলাচলের জন্য। যে একবার রবারের দস্তানা বা জুতা পরেছে, সে জানে বায়ুনিরোধী পোশাক কত অসুবিধাজনক। তবে নভচারীরা এ ধরনের অসুবিধা ভোগ করেন না। স্পেস-স্যুটের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা তাঁদেরকে এ
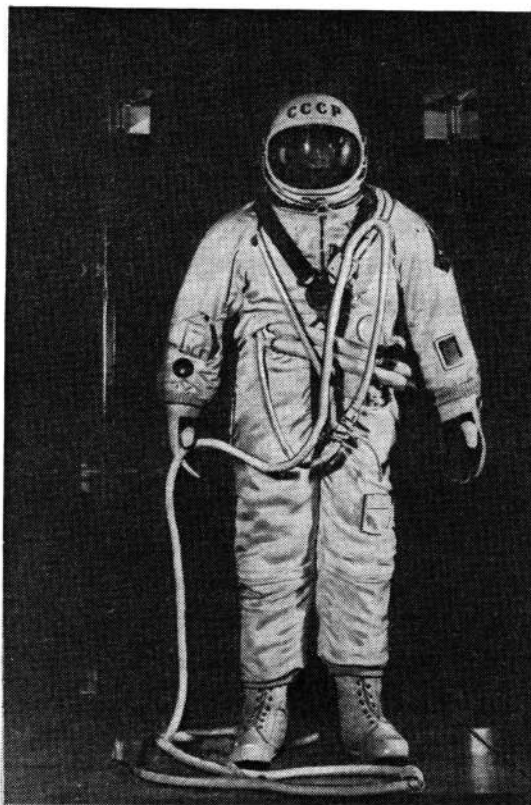
স্পেস্-স্যুট

অসুবিধার হাত থেকে অব্যাহতি দেয়। উন্মুক্ত মহাকাশে বিচরণকারী নভচারীর 'পোষাক-পরিচ্ছদ'র তালিকায় দস্তানা, জুতা, শিরস্ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত। শিরস্ত্রাণের পোর্টহোলে রে-ফিল্টর বসানো আছে, যা চোখ ধাঁধানো সূর্য-রশ্মির হাত থেকে চোখ রক্ষা করে।

নভচারীর পিঠে বিশেষ ধরনের থলি — হ্যাভার-স্যাক আছে। এই থলিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য অক্সিজেন মজুত থাকে এবং বায়ু পরিশোধন প্রণালীটিও এই থলির মধ্যে অবস্থান করে। নমনীয় স্ফীত-নল (hose) দ্বারা থলিটি স্পেস-স্যুটের সাথে সংযুক্ত। যোগাযোগ-তার এবং সেফ্‌টি-বেল্ট নভশ্চারীকে নভযানের সাথে বেঁধে রাখে। নভশ্চারীকে উন্মুক্ত মহাকাশে 'ভাসতে' সাহায্য করে নাতিবৃহৎ রিএ্যাকটিভ-মোটর। মার্কিন মহাকাশচারীরা পিস্তল আকারের গ্যাস-চালিত মোটর ব্যবহার করেছিলেন।

পৃথিবী সর্বদাই তোমার সাথে। রাত্রিবেলার নভযান উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটিকে বিশেষভাবে অস্বাভাবিক মনে হয়। নক্ষত্রখচিত আকাশের বুকে সুবৃহৎ এ্যানটেনাগুলিকে কালো, অদ্ভুত গঠনের ঝলে মনে হয়। রাত গভীর হওয়া সত্ত্বেও সার্ভিস-সেন্টারের জানালাগুলি উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের হিসাবে এখানে কাজের সময় নির্ধারিত হয় না, এখানে সময় নির্ধারিত হয় মহাশূন্যে উড্ডয়নের নির্ঘণ্ট অনুসারে।

আকাশে ছোট একটি তারা দেখা যায়। তারাটি স্থির নক্ষত্ররাজির মাঝে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। রিসীভিং এ্যানটেনার বহুটন ভারী পেয়ালাটি মন্থরগতিতে ঘুরে এই তারাটির উপর দৃষ্টি রাখছে।

অন্য এ্যানটেনাটি — ট্রান্সমিটিং এ্যানটেনা — এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ দূরত্বে ট্রান্সমিটারগুলি মহাশূন্য থেকে সংকেত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে না। আধুনিককালের পর্যটকদের পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত সহকারী — রেডিও তরঙ্গ নির্ভরযোগ্যভাবে নভযান ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল আয়তনজুড়ে পরস্পর থেকে
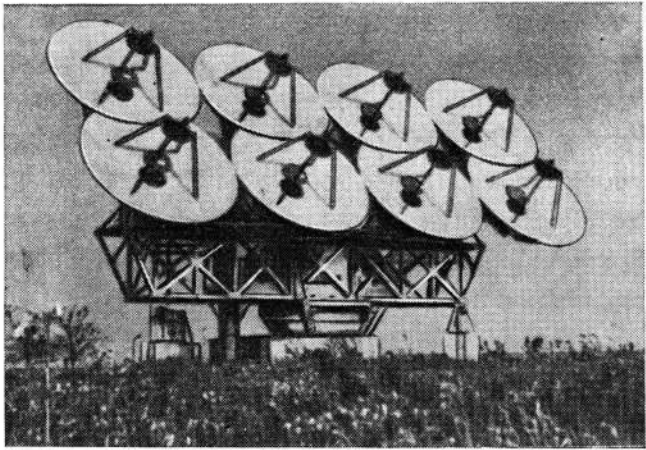
মহাজাগতিক যোগাযোগ কেন্দ্রের এ্যান্টেনা

নির্ভরযোগ্য দূরত্বে ভূমিস্থ নির্দেশক-পরিমাপক কমপ্লেক্স কেন্দ্রগুলি ছড়ানো। এদের নিয়ত সাহায্য ও তত্বাবধান ব্যতিরেকে কোন মহাশূন্য অভিযানই সম্ভবপর নয়।

মহাশূন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এতগুলি স্টেশনের প্রয়োজন কেন? আসলে ব্যাপারটা হল এই যে, প্রতিটি পরিমাপক কেন্দ্র নভযানের সাথে খুবই অল্প সময়ের জন্য (মাত্র কয়েক মিনিট) যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এরপর নভযানটি এই কেন্দ্রের রেডিও-ভিজ্যুয়ালিটির সীমারেখার বাইরে চলে যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে তেমন কোন তথ্য পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর নভযান ও উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মধ্যে যে তথ্য বিনিময় হয় তার আয়তন যথেষ্ট বড়। নভযান থেকে রেডিওতরঙ্গ শুধু নভচারীদের উড্ডয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত, তাঁদের স্বাস্থ্যগত,

নভচারীরা মহাশূন্যের উচ্চতা থেকে নতুন ও চিত্তাকর্ষক যা কিছু দেখেছেন — এসব সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্টই বহন করে আনে না, টেলিমেট্রিক্যাল পরিমাপের বহুল পরিমাণ তথ্যও বয়ে আনে।

নভযানে শত শত ডাটা-ইউনিট স্থাপিত হয়। এই ইউনিটগুলি সেখানেই স্থাপিত, যেখানে নভযানের গঠনের কোন না কোন গ্রন্থির তাপমাত্রা ও চাপ, বেগ ও ত্বরণ, পীড়ন ও কম্পন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হয় রীতিবদ্ধভাবে। নভযানে যানমধ্যস্থ সিস্টেমসমূহের অবস্থা নির্দেশ করে এমন কয়েকশ পরামিতি নিয়ত মাপা হয়। ডাটা-ইউনিটগুলি এই সব ভৌতিক রাশির মান তড়িৎ-সংকেতে রূপান্তরিত করে। পরে এই তড়িৎ-সংকেতগুলি বেতার মারফত পৃথিবীতে পাঠানো হয়। প্রতি সেকেন্ডে নভযানের রেডিও ট্রান্সমিটার ভূমিস্থ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে হাজার হাজার তড়িৎ-সংকেত পাঠায়। এবং এগুলোর অনেকেরই উপর উড্ডয়নের ভাগ্য নির্ভরশীল।

প্রশ্ন উঠতে পারে: টেলিমেট্রিক্যাল তথ্যের প্রয়োজন কিসের জন্য? নভচারীরা আছেন, আছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যার সাহায্যে নভচারীরা যানমধ্যস্থ সিস্টেমসমূহের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে সব প্রয়োজনীয় পরামিতি যদি নভযানের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে নিয়ে আসা হয়, তাহলে প্যানেলটি অত্যধিক বড় ও জটিল হবে। এছাড়াও উড্ডয়নকালে এমন কিছু পরামিতি লিপিবদ্ধ করা হয় যা শুধু কৃৎকৌশলীদের জন্য আকর্ষণীয়।

নভযানের সাথে যোগাযোগের প্রতিটি মিনিটকেই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। নভযান মধ্যস্থ বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির একটি হল কর্মসূচী-সময় নির্ধারক যন্ত্র। যন্ত্রটি পৃথিবী থেকে শুধুমাত্র একটি সংকেত গ্রহণ করে আর নভযানের জন্য অনেকগুলি নির্দেশ দান করে। কর্মসূচি আগে থেকে নির্ধারণ করা হয় এবং নভযানের যাত্রা শুরুর আগেই কর্মসূচী সময়-নির্ধারক

যন্ত্রে সেট করা হয়। ফলে নির্দেশপ্রদানের ক্রমানুসারিতা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। ভূ-পৃষ্ঠের সংকেতের ফলে প্রয়োজনীয় কর্মসূচীটি চালু হয় মাত্র। পরে পূর্বে নির্ধারিত ক্রমানুসারিতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হতে থাকে।

তবে নির্দেশাবলি ছাড়াও নভচারীদের কন্ট্রোল রুমের উপদেশ ও নতুন নির্দেশ, টেলিমেট্রিক তথ্যসমূহের প্রসেসিং-এর ফলাফল ইত্যাদি জানাতে হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে নভযানের উড্ডয়নের কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য ৫-১০ মিনিটে এসব করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের দেশের বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে পরিমাপ কেন্দ্রের একটি নেট-ওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। যে-সব জায়গার উপর দিয়ে নভযানটি উড়ে যায় সেই সব জায়গায় এই পরিমাপ-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থানকারী কেন্দ্রগুলির রেডিও-ভিশনের সীমারেখা আংশিকভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে নভযান এক রেডিও-ভিশন এলাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হওয়ার আগেই পার্শ্ববর্তী রেডিওভিশন-এলাকার আওতায় গিয়ে পড়ে। নির্দেশদানকারী পরিমাপ কমপ্লেক্সের প্রতিটি কেন্দ্রই নভযানের সাথে তাদের বার্তালাপ শেষ হতেই যানটিকে পরবর্তী কেন্দ্রের হাতে 'হস্তান্তর' করে। মহাশূন্য থেকে প্রাপ্ত সব তথ্য অনতিবিলম্বেই মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহিরেও মহাকাশীয় 'রিলেরেস' অব্যাহত থাকে। উড্ডয়ন শুরু হওয়ার বেশ কিছু আগেই সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির একস্পিডিশন-ফ্লিটের বিশেষভাবে সজ্জিত জাহাজসমূহ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়। এই অসাধারণ নৌবহরের একটি জাহাজের নাম হল 'নভচারী ভ্লাদিমির কমারোভ'। বড় বড় শুভ্র বলয়গুলি এই বিশাল আয়তনের জাহাজটিকে আরও আকর্ষণীয়
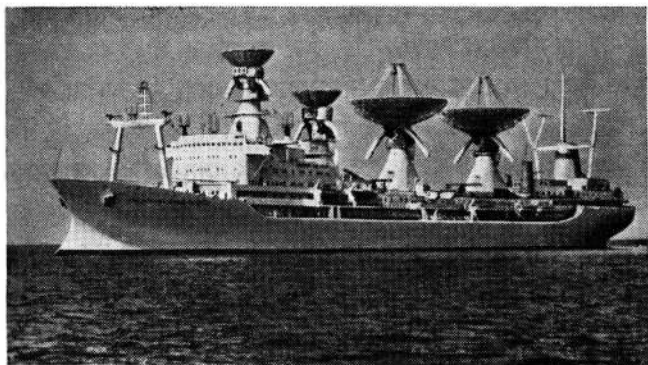
সোভিয়েত মহাশূন্য-গবেষণার নৌবহরের সর্বপ্রধান জাহাজ 'নভচারী ইউরি গাগারিন'

করে তোলে। এই বলয়গুলিতে এ্যানটেনার অধিবৃত্তাকার পেয়ালাগুলি ঘুরতে থাকে। গোলাকার আচ্ছাদন তাদের ঝড়-তুফান বা প্রকৃতির অন্য যে কোন বৈরীতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং সাথে সাথে সহজেই রেডিও তরঙ্গকে প্রবেশ করতে দেয়। স্থিরকারী সরঞ্জাম এবং বিশেষভাবে নির্মিত কমপিউটার যা কোন সামুদ্রিক আন্দোলনের সময় এ্যানটেনার ভিত্তিকে অনুভূমিক অবস্থায় ধরে রাখে। অনুষ্ঠানের সময় এক মুহূর্তের জন্যও সামুদ্রিক জাহাজ ও নভযানের মধ্যে যোগাযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় — সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাহাজের বহুসংখ্যক গবেষণাগারগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে, কমপিউটারে সুসজ্জিত।

সোভিয়েত 'স্পেস্'-ফ্লিটের অন্যতম জাহাজ 'নভচারী ইউরি গাগারিন' সহ অন্যান্য জাহাজগুলি ভারত, প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরে কর্তব্যরত।

পৃথিবীতে শুধুমাত্র যে নভযানের যাত্রীদের কথা শোনা যায় — তা নয়। ক্রু-মডিউলে স্থাপিত টি. ভি. ক্যামেরার সাহায্যে তাঁদেরকে দেখাও যায়। হাতে বহনযোগ্য ক্যামেরার সাহায্যে নভচারীরা তাঁদের মহাশূন্যস্থ বাড়ী হতে টি. ভি.-রিপোর্ট পরিচালনা করেন, টি. ভি.-দর্শকদের পৃথিবী, চাঁদ ইত্যাদি বিশদভাবে দেখতে সাহায্য করেন।

বেতার যন্ত্রের ফলে নভযানের সাথে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। নভযান মধ্যস্থ যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে যে-সব বেতার-সংকেত পাঠায় তা পৃথিবীতে অবস্থিত শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রগুলির সংকেতের তুলনায় বেশ দুর্বল। একারণেই রিসিভিং অধিবৃত্তীয় এ্যান্টেনাগুলি এত বিশাল আকারের। পেয়ালার ব্যাসে যত বেশী হবে মহাশূন্য থেকে তা তত বেশী তথ্য সংগ্রহ করবে।

মহাশূন্যে নভযান ও কৃত্রিম উপগ্রহের ট্রান্সমিটার ছাড়াও বেতার তরঙ্গের অন্যান্য উৎস বিরাজমান। তথাকথিত বেতার-নক্ষত্রগুলি পৃথিবীতে অদৃশ্য রশ্মি পাঠাতে থাকে। আর সূর্য হল বেতার তরঙ্গের শক্তিশালী জেনারেটর। নভযান থেকে পাঠানো সংকেতগুলি যাতে এই মহাকাশীয় বেতারধ্বনিকে অতিক্রম করে আসতে পারে, সেজন্য তাদের বেশ তীব্র করা দরকার। জটিল ফিল্‌টারের সিস্টেম সংকেতগুলিকে পরিশোধিত করতে সাহায্য করে।

মহাশূন্য থেকে তথ্যগুলি 'সাংকেতিক' ভাষায় এসে পেঁছে পৃথিবীতে। বড় আকারের স্পুলে যে-সব বেতার-সংকেত গৃহীত হয় তাদের সূক্ষ্মভাবে প্রসেসিং করা দরকার, যাতে করে তা বিশেষজ্ঞদের বোধগম্য হতে পারে এবং এটা খুব দ্রুত করা দরকার।

সর্বাধুনিক কম্পিউটারে (ইউনিভার্সাল কম্পিউটারসমূহ এক সেকেণ্ডে প্রায় দশ লক্ষ অপারেশন চালাতে পারে) সজ্জিত উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র দ্রুততার সাথে জটিলতম হিসাব-নিকাশ সুসম্পন্ন করে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কক্ষপথের সংশোধনের জন্য ডাটা প্রস্তুত করা

হয়, নির্দিষ্ট পর্যায়ে, দিন ও যোগাযোগের সেশনের জন্য কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। উড্ডয়নের শেষের দিকে ব্রেক চালু করার মুহূর্ত নির্ধারিত করা হয় এবং পৃথিবীতে নভযানটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রেকটিকে কতক্ষণ কাজ করতে হবে তাও ঠিক করা হয়।

বহুসংখ্যক কম্পিউটারে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা বহুল পরিমাণ টেলিমেট্রিক তথ্য প্রসেস করেন। প্রথমেই সেই সব ডাটা প্রসেসিং করা হয়, যা উড্ডয়নের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য জানা প্রয়োজন, আর পরে অপেক্ষাকৃত কম জরুরী তথ্যগুলিকে প্রসেস করা হয়। নভযান থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরে সেণ্টার উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে থাকে। একারণে নভযান যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য রেডিও-ভিশনের বাহিরে চলে যায়, কিম্বা ক্রু'রা বিশ্রাম নিতে থাকেন, তখনও সেণ্টারে একদল বিশেষজ্ঞ ব্যস্ত থাকেন।

উড্ডয়ন কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সামনে মহাকাশ অভিযানের অন্যতম দায়িত্বপূর্ণ পর্যায় — পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।

* আমরা অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নভযান 'সায়ুজ-২৪', 'সাল্যুৎ-৫' স্টেশন ত্যাগ করার পর এখন নিজের থেকেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য নভযানের কক্ষপথীয় বেগ কমাতে হবে, যাতে করে তা প্রথম মহাজাগতিক বেগের তুলনায় কম হয়।

এজন্য নভযানটিকে ব্রেক কসার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। অপটিক্যাল ভিউফাইণ্ডার দিয়ে পৃথিবীর উপরিভাগের দিকে লক্ষ্য রাখছি এবং ধীরে ধীরে নভযানটির দিক পরিবর্তন করছি। নিয়ন্ত্রণ প্যানেল থেকে ইঞ্জিন পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে নির্দেশাবলীকে জটিল

পথ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে আদেশগুলিকে গ্রহণ করে গাইরোস্কোপ এবং পরবর্তীতে লজিক্যাল ব্লকগুলির কাছে পৌঁছে দেয়। লজিক্যাল ব্লকগুলি ইঞ্জিনের কাজের সময়সীমা এবং তাদের চালু হওয়ার কম্বিনেশন নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু এরপরই নিয়ন্ত্রণকারী ভাল্‌ভগুলি চালু হয়। ফলে ইঞ্জিনে জ্বালানী আসতে পারে।

প্যানেলে বোতাম টেপার পরে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে — গাইরোস্কোপ কাজের জন্য তৈরী। পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হল— এবারে জ্বলে উঠল হ্যান্ড-এ্যাটাচ্‌ড কন্ট্রোলের বাতি। এবার নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের হাতল ঘুরালে সংকেতগুলি প্রথমে গাইরোস্কোপে ও পরে ইঞ্জিনে গিয়ে পৌঁছাবে। 'সায়ুজ' নভযানে ওরিয়েণ্টেশণ-ইঞ্জিন বিভিন্ন ধরনের: স্বল্প ঘাতের এবং বেশী ঘাতের। নতুন নির্দেশের পর পরই ওরিয়েনটেশণ ইঞ্জিনসমূহের বাতি জ্বলে ওঠে। এর অর্থ এই যে, স্বল্প ঘাতের ইঞ্জিন চালু হতে যাচ্ছে।

দলনেতা নিয়ন্ত্রণের হাতল ঘোরাতেই প্যানেলে বাতি মিট্ মিট্ করতে থাকে। অর্থাৎ ওরিয়েনটেশণ-ইঞ্জিনগুলি থেকে থেকে চালু ও বন্ধ হচ্ছে আর আমাদের নভযানের দিক পরিবর্তন হচ্ছে। অপ্‌টিক্যাল ভিউফাইন্ডারে পৃথিবীর 'দৌড়'-এর দিক পরিবর্তিত হচ্ছে আর ধীরে ধীরে আমাদের প্রয়োজনীয় অবস্থায় আসছে। নভযানের বেগ কমানোর জন্য তার সংশোধনকারী ব্রেক-ইঞ্জিনের বহির্গমন নলটিকে উড্ডয়নের দিক বরাবর থাকতে হবে। তাছাড়াও ভিউফাইন্ডারে পৃথিবী নীচে থেকে উপরের দিকে 'দৌড়াতে' থাকবে (আর গতিসঞ্চারের সময় ছিল ঠিক উল্টো — তখন ভিউফাইন্ডারে পৃথিবী উপর থেকে নীচের দিকে 'দৌড়াচ্ছিল')।

এখন আর বাতিগুলি মিট্ মিট্ করছে না। ওরিয়েনটেশন ইঞ্জিনগুলি থেমে গেছে এবং নভযানটি জড়তার কারণে ঘুরছে। কম্যান্ডার এখন হাতল প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন, আবারও

বাতি জ্বলে ওঠে। কৌণিক বেগ হ্রাস করতে শুরু করে পুনরায় চালুকৃত ইঞ্জিনগুলি। নভযানের আবর্তনের গতি মন্থর হয়ে আসে এবং অবশেষে একেবারে থেমে যায়। এখন প্রয়োজনীয় অবস্থায় পৌঁছানো গেছে। ব্রেকের জন্য মূল ইঞ্জিনটিকে চালু করা যেতে পারে। তবে পূর্বনির্ধারিত স্থানে যাতে করে নভযানটি অবতরণ করতে পারে সেজন্য আমরা ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই মূল ইঞ্জিনটিকে চালু করব।»

মন্দনের পর মডিউল থেকে নভযানটি আলাদা হয়ে যায়। এ্যাসেম্বলি-মডিউল এবং কক্ষপথ-মডিউল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তারা বায়ুমণ্ডলেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর অবতরণকারী যানটি নভচারীদের নিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

অবতরণকারী যানটির সাথে মোটরগাড়ীর বড় আকারের হেড-লাইটের বেশ মিল আছে।

এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। প্রথম সোভিয়েত নভযানগুলির অবতরণকারী যানগুলি গোলকার ছিল। মন্দন ও মডিউল বিযোজনের পর নভচারী সহ অবতরণকারী যানটি পৃথিবীর পথে, তথাকথিত ব্যালিস্টিক পথে অনিয়ন্ত্রিত উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরগুলিতে নভচারীরা তীব্র চাপের সম্মুখীন হন।

অবতরণের সময় যে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয় তা কমানোর জন্য নভযান নির্মাতারা বিমান নির্মাতাদের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। বিমান অবতরণ করানোর সময় বিমানচালক ডানার উত্তোলক শক্তি কমান। এখানে তিনি আক্রমণের কোণ বাড়ান বা কমান (বিমানের জন্য আক্রমণের কোণ হল বিমানের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ এবং বিমানের বেগের দিকের মধ্যবর্তী কোণ, আর নভযানসমূহের জন্য আক্রমণের কোণ হল নভযানের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ এবং প্রতিকূল গ্যাস প্রবাহের

মধ্যবর্তী কোণ), ফ্ল্যাপ্ টানেন এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্য নেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বিমানবন্দরের অবতরণস্থলের উপর উড়ন্ত যানের এ্যারোডিনামিক্যাল গুণাবলির পরিবর্তন ঘটে (উড়ন্ত যানের এ্যারোডিনামিক্যাল গুণাবলি বলতে উড্ডয়ন শক্তি এবং সম্মুখে রোধশক্তির সম্পর্ক বোঝায়)।

'সায়ুজ' নভযানের আকারও বায়ুমণ্ডলে উড্ডয়নকালে যানের উত্তরণ শক্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। অবতরণকারী যানে স্থাপিত স্বল্প ঘাতের জেট-ইঞ্জিনের সাহায্যে নভযানটিকে তার অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়ে উত্তোলন-বল-এর মান ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুতরাং এ্যারোডিনামিক্যাল গুণাবলীসম্বলিত অবতরণ প্রকৃত অর্থেই নিয়ন্ত্রিত অবতরণ।

উড্ডয়নের উচ্চতা ও দিক কৌশলের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে নভচারীদের উপর ক্রিয়াশীল উচ্চ চাপের পরিমাণ, ব্যালিস্টিক অবতরণের তুলনায় ২-৩ গুণ কমানো সম্ভব। এছাড়া, সুনিয়ন্ত্রিত অবতরণের ফলে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তণের সুনির্দিষ্ট জায়গায় যানটির পৌঁছানোর সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উত্তোলন-বল বাড়িয়ে আমরা অবতরণের বক্রপথ দীর্ঘায়িত করতে পারি, আর উত্তোলন-বল কমিয়ে উক্ত পথকে ছোটও করতে পারি। এভাবে, যেখানে উদ্ধারকারী দল অপেক্ষা করছে ঠিক সেখানে নভযানের অবতরণ সুসম্পন্ন করা সম্ভব।

তবে উচ্চচাপ ছাড়াও নভচারীরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তণের সময়ে আরও একটি বিপদের সম্মুখীন হন — তা হল অতি উচ্চ তাপমাত্রা। মন্দনের ইঞ্জিন চালু করার ফলে নভযানটি শুধুমাত্র তার পৃথিবী-পার্শ্ববর্তী কক্ষপথ ত্যাগ করতে পারে। তবে নভযানের মূল মন্দনটি সংঘটিত হয় বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতার ফলে। অবতরণ-যানটি যখন বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন তার সামনে

শব্দ-তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। উক্ত শব্দ-তরঙ্গের নভযানটিকে আক্রমণকারী বায়ু প্রবাহের তাপমাত্রা 3500°C-4000°C পর্যন্ত পৌঁছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা 6000°C।

ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে অবতরণের সময় সারা পথ জুড়ে নভযানের গতিকে ধীরে ধীরে মন্থর ক'রে তাপমাত্রা বহুলাংশে কমানো যেত। তবে এর জন্য দরকার হত বহুল পরিমাণ জ্বালানীর।

এক্ষেত্রে নভচারীরা আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ শেষে শুধুমাত্র ইঞ্জিনের সাহায্যে পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করলে, তারা সাথে করে বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত জ্বালানী নিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। আর এই জ্বালানীর ওজন হত নভযানের সর্বমোট ওজনের প্রায় অর্ধেক। তবে মহাশূন্যে পাঠানো প্রতি কিলোগ্রাম প্রয়োজনীয় বস্তুর গুরুত্ব এত অধিক যে, এ ধরনের জাঁকজকম কৃৎ-কৌশলীরা বরদাস্ত করতে পারেন না।

এ্যারোডিনামিক গুণাবলীসম্বলিত অবতরণের ফলে অবতরণকারী যন্ত্রের উত্তপ্ততা বহুলাংশে কমে যায়। ব্যালিস্টিক অবতরণের সময় নভযানের উপরিভাগ থেকে যত তাপ নিষ্কাশিত হয়, তার তুলনায় সুনিয়ন্ত্রিত অবতরণের সময় এর পরিমাণ দশগুণ কম। কিন্তু এই তাপমাত্রাও নভচারীদের আশ্রয়দানকারী ধাতব দেয়ালগুলিকে গলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এজন্য কৃৎকৌশলীরা তাপশোষণকারী পর্দা (এ্যাণ্টিহিট স্ক্রিন) নির্মাণ করেছেন। এই পর্দাটিকে অবতরণকারী যানের সামনের দিকে — সবচেয়ে উত্তপ্ত অংশে স্থাপন করা হয়।

তাপ কু-পরিবাহী বস্তুর এক বা একাধিক স্তর দ্বারা পর্দাটি নির্মিত। উষ্ণ ধারার কারণে পর্দার বাইরের অংশটুকু উত্তপ্ত হয়, এবং তারপর বিগলনের অবস্থাকে এড়িয়ে তা বাষ্পে পরিণত হয়। শক্তিশালী প্রতিকূল বায়ু জ্বলন্ত বস্তুর অংশসমূহ উড়িয়ে নিয়ে

যায় এবং অবতরণের সময় তাপশোষণকারী পর্দার ওজন অনেক কমে যায়। তবে নভযানের গঠনের কোন ক্ষতি হয় না। অবতরণকারী যানের বাইরে অগ্নিশিখা দাপাদাপি ক'রে পোর্টহোলের কাঁচের গায়ে দেখা দিলেও, মডিলের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা 10°C-20°C-এর বেশী বৃদ্ধি পায় না।

অবশেষে যানটির বেগ কমে সেকেন্ডে ২০০ মিটার-এ এসে পৌঁছেছে। পৃথিবী পর্যন্ত এখনও প্রায় ৯ কিলোমিটার পথ বাকী। এবার প্যারাসুটগুলিকে খোলা যেতে পারে। হ্যাচ-ওয়ের ঢাকনী তীব্রগতিতে খুলে যায় এবং একটি অনতিবৃহৎ রিটারডেশন-প্যারাসুট (যা যানটির অবতরণের বেগ কমায়) খুলে যায়।

আরও একটি নতুন বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে রিটারডেশন-প্যারাসুটের কাপড় ছিটকে যায়। অবতরণযন্ত্রের উপর প্রথমে স্ট্রেটিং প্যারাসুট এবং পরে বিচিত্র বর্ণের বিশালাকার মূল প্যারাসুটটি খুলে যায়। আরও একটি মৃদু বিস্ফোরণের পর বায়ুতে ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে তাপশোষণকারী পর্দার বিক্ষিপ্ত পেয়ালাটি নীচে নেমে আসে। যানটির ওজন হ্রাস পায় বলে স্বভাবতই অবতরণের বেগও কমে যায়।

নভচারী সহ কেবিনটি ধীরে ধীরে নামতে থাকে। মাটি স্পর্শ করতে শুধুমাত্র এক মিটার বাকী। আরও একটি বিস্ফোরণ। যানটির তলদেশ থেকে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সফ্‌ট-ল্যান্ডিং-এর বারুদ-ইঞ্জিন কাজ করতে শুরু করেছে। ধূলি-মেঘ কেবিনটিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। লিফ্‌ট থামার সময় যেমন একটি হাল্‌কা ধাক্কা অনুভূত হয়, তেমনি একটি মৃদু ধাক্কা অনুভূত হল। মহাশূন্য অভিযান শেষ হয়েছে। নভযানটি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছে।

এখন আমরা দেখবো কিভাবে আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণের পথ থেকে

নভযানগুলি ফিরে আসে। মহাশূন্য থেকে ফেরার সময় নভযান প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথচ্যুত হওয়ার সময় নভযানের যে বেগ থাকে, বর্তমান বেগ তার চেয়ে দেড়গুণ বেশী। অবতরণের সময় উচ্চ চাপ যাতে নির্ধারিত মান ছাড়িয়ে না যায় এবং নভযান যাতে নির্দিষ্ট স্থানে নামতে পারে এজন্য বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময়, কোণ ও স্থান সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

প্রথমত অবতরণের নির্ভুলতা নির্ধারিত হয় শর্তাধীন অনুভু দ্বারা। যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকতো তাহলে নভযান পৃথিবী ছাড়িয়ে যে ন্যূনতম দূরত্ব অতিক্রম করতো তাকে শর্তাধীন অনুভু বলা হয়। শর্তাধীন অনুভু নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশী হলে নভযান বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের খণ্ডিত স্তরগুলিতে অপেক্ষাকৃত ধীরে মন্দনপ্রাপ্ত হবে এবং অবতরণের নির্ধারিত স্থান ছাড়িয়ে যাবে। আর শর্তাধীন অনুভু নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম হলে নভযানটি নির্ধারিত স্থানে গিয়ে অবতরণ করবে না। আর শর্তাধীন অনুভুর বেলায় উচ্চতার হিসাবে কেবলমাত্র কিলোমিটার ভুলের ফলে নভযানটির অবতরণস্থলের হিসাবে ৫০ কিলোমিটার ভুল হবে। শর্তাধীন অনুভুর মান নির্ধারিত মানের চেয়ে ১০-২০ কিলোমিটার কম বা বেশী হলে যানটি হয় পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে উড়ে যাবে নয়তো যানের অভ্যন্তরে এমন বেশী উচ্চ চাপের সৃষ্টি হবে যা হতে দেওয়া উচিত নয়। ঠিক এমনভাবেই নভযানের উড্ডয়নের উপর বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবেশের কৌণিক ভ্রান্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আন্তঃগ্রহ নভযানকে অতি ক্ষুদ্র কোণে (প্রায় স্পর্শক বরাবর) বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করতে হবে। নির্ধারিত মান থেকে 1° বিচ্যুতি হলে ফল হবে মারাত্মক।

উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলীকে আন্তঃগ্রহ উড্ডয়ন পথের সীমাহীন

দূরত্বের সাথে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সুদূরগামী নভযানসমূহের ওরিয়েনটেশন ও নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমগুলিকে কৃৎকৌশলগতভাবে কতখানি উৎকৃষ্ট হতে হবে।

আন্তঃগ্রহ নভযানের নিয়ন্ত্রিত অবতরণের নক্শা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এক্ষেত্রে যানটি দু'বার বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে বলে ব্যালিস্টিক অবতরণের তুলনায় এই রকম অবতরণ বেশ জটিল। বায়ুমণ্ডলে প্রথম অনুপ্রবেশের সময় যন্ত্রটির আংশিক মন্দন হয়। আর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণের কাজ চালান হয় যাতে করে উত্তোলন-বল নভযানটিকে নির্ধারিত উচ্চতার নীচে নামতে দেয় না এবং যানটিকে পুনরায় মহাশূন্যে ফেরত পাঠায়। বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরগুলি থেকে বের হয়ে নভযান ব্যালিস্টিক পথে অনিয়ন্ত্রিত উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। বায়ুমণ্ডলে দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশের পূর্বে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যানটিকে ঘুরিয়ে প্রয়োজনীয় দিক বরাবর সুস্থির করে। পরবর্তী অবতরণের নভযানের সুনিয়ন্ত্রিত অবতরণের সাথে কোন পার্থক্য নেই। চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'জোনদ্-6' এবং 'জোনদ্-7' এবং মার্কিন নভযান 'এ্যাপোলো'র উড্ডয়ন সমাপ্ত হয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত অবতরণের মাধ্যমে, যেখানে যানগুলিকে দু'বার বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করতে হয়েছে।

কক্ষপথ-স্টেশন থেকে মহাশূন্যে। 'মানবজাতি চিরদিন পৃথিবীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে না। আলো ও স্থানের সন্ধানে সে প্রথমে ভীতসন্ত্রস্থ পা রাখবে বায়ুমণ্ডলের বাইরে। তারপর সৌরমণ্ডলের আশে পাশের সমস্ত জায়গা জয় করবে।' ১৯১১ সালে কেউই এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু ক. এ. ৎসিয়োলকোভ্স্কি তার চিন্তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছিলেন। ১৫ বছর পরে তিনি লিখলেন মানুষ কর্তৃক মহাশূন্য জয়ের 'ক্রিয়া প্রণালী'। এর পর

মাত্র পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তার চিন্তাধারার প্রায় অর্ধেকই আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

তাঁর পরিকল্পনায় ছিল ১৬টি কর্মসূচী। ষষ্ঠ কর্মসূচীতে বলা হয়েছে: 'রকেট ক্রমশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আরও উঁচুতে উঠবে ও দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে থাকবে। তবে মজুদ খাদ্য ও অক্সিজেনের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।' ৎসিয়োলকোভ্স্কি বলেছিলেন 'স্বক্রিয় যন্ত্র', আর আজ আমরা বলি নভযান। আরও বেশ ক'টি কর্মসূচী আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তারপর দশম কর্মসূচী: 'পৃথিবীর চারিদিকে মানুষের বাসভূমি ক্রমাগতই বেড়ে চলবে।' একবার চিন্তা করে দেখুন, ১৯২৬ সাল, গৃহযুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বস্তার ছাপ সবেমাত্র মুছে উঠতে সক্ষম হয়েছে আমাদের দেশ, মফঃস্বল শহর কালুগা...। এই সময় এ রকমের কথা! কিন্তু সেদিন যা ছিল নিতান্ত কল্পনামাত্রে, আজ তা আমাদের সামনে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। ডক্টর ক. প. ফিয়াক্তিস্তভ লিখেছেন: 'মহাশূন্যে মানুষের বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা আজ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবত, এই ধরনের শহরে সংযোজিত ইকোলজিক্যাল বৃত্তিতে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রে জীবনধারনের অবস্থা শুধু যে উপযোগী তাই নয়, চিত্তাকর্ষকও বটে। মহাশূন্যে অনুপ্রবেশের পর মানবজাতি তার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, আরও এগিয়ে যাবে...'।

অবশ্য, এ লক্ষ্য এখনও সুদূরপরাহত। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ক্রমাগত মহাশূন্যে অবস্থানকারী মানুষের সংখ্যা ও তার অবস্থানের সময় বৃদ্ধি করতে হবে। সাথে সাথে মানুষের বৈজ্ঞানিক ও উৎপাদনগত কর্মতৎপরতার সম্ভাবনা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে — মূলত নতুন ধরনের মহাকাশীয় যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। তা হল কক্ষপথ-স্টেশন।

স্টেশনটি হল বৃহৎ আকারের পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ, যেখানে মহাশূন্যচারীরা দীর্ঘকাল ধরে বাস ও কাজ করতে পারেন। নভযানের তুলনায় স্টেশনের বিশেষত্ব এই যে, কক্ষপথ-স্টেশন পৃথিবীতে ফেরত আসে না। শুধুমাত্র সময়ে সময়ে স্টেশনে কর্মরত মহাশূন্যচারী দল বদল হয় মাত্র।

মহাশূন্যে ডকিং। মহাশূন্যে নভযান পরিচালনা ও ডকিং-এর খুঁটিনাটি ভালভাবে আয়ত্ব না করা পর্যন্ত এ ধরনের স্টেশন নির্মাণ করা ছিল অসম্ভব। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় ডকিং সম্পন্ন করা হয়। ১৯৬৯ সালে 'সায়ুজ' সিরিজের নভযান কক্ষপথে সংযুক্ত হয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক স্টেশন তৈরী করে। ডকিং-এর পরপর হল যান বদল। উন্মুক্ত মহাশূন্যে নভচারীরা এক নভযান থেকে অন্য নভযানে গেলেন।

১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল মস্কো বেতারে জানানো হল: কক্ষপথ-স্টেশন 'সাল্যুৎ' মহাশূন্যে চলমান। শীঘ্রই সেখানে নভযান 'সায়ুজ-১১'-তে চড়ে এসে পৌঁছালেন গ. দোবরাভোল্স্কি, ভ. ভোলকভ এবং ভ. পাৎছায়েভ। স্টেশনটি এখন মানুষ-চালিত হল। স্টেশনটির আকৃতি সকলকে হতবাক করে দিল: মালবাহী রকেট সহ দৈর্ঘ্য — ২৩ মিটার, ওজন প্রায় ২৫ টন এবং প্রেসার-মডিউলগুলির আয়তন ১০০ ঘন মিটার।

নভযান থেকে নভচারীরা সিলিন্ডার আকারের ট্রানজিসন-মডিউলে ঢুকলেন। এখানে যন্ত্রপাতির কিছু অংশ এবং দূরবীণ 'ওরিয়ন'-এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এরপর মহাশূন্যীয় বাড়ীর মূল কর্মস্থল — ওয়ার্কিং-মডিউলের অবস্থান। স্টেশনের এই সর্ববৃহৎ অংশটি শঙ্কুর সাহায্যে
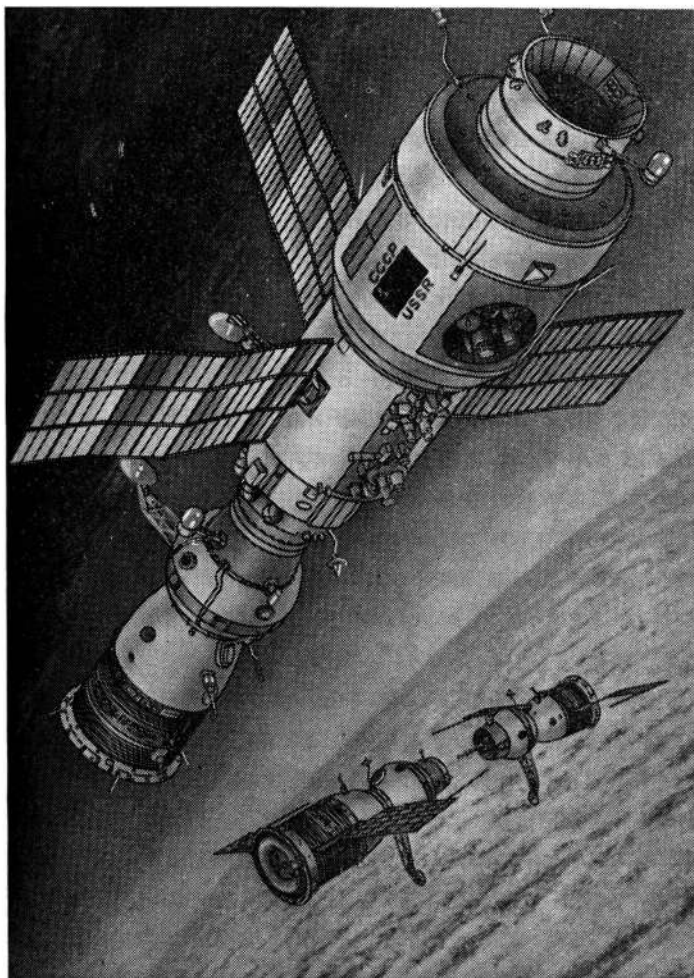
উড্ডয়নকালে কক্ষপথ-কম্‌প্লেক্‌স 'সাল্যুত-সায়ুজ' এবং সায়ুজ সিরিজের দু'টি নভযান ডকিং-এর উদ্দেশ্যে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে।

সংযুক্ত দুটি সিলিন্ডারের সমন্বয়ে গঠিত। এই সিলিন্ডারদ্বয়ের একটির ব্যাস প্রায় ৩ মিটার, অপরটির — ৪ মিটারের বেশী।

ছোট সিলিন্ডারটির মধ্যে নভচারীদের মুখ্য কর্মস্থল এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-প্যানেল অবস্থিত। শঙ্কু অংশে রাখা আছে নভচারীদের দৈহিক ব্যায়ামের সরঞ্জাম — 'স্টেডিয়াম' এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ও নিয়ন্ত্রণের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। স্বয়ংচালিত সড়কের সাহায্যে নভচারীরা হাঁটিতে ও দৌড়াতে পারেন।

ওয়ার্কিং-মডিউলেই শয্যা পাতা রয়েছে। নভচারীরা স্লিপিং-ব্যাগ-এর মধ্যে শুয়ে তাদের সুবিধামত অবস্থায় নিজেকে বেল্টের সাহায্যে বেঁধে নিতে পারেন। এখানেই রেফ্রিজারেটার, জল ও খাবারের মজুদ এবং খাবার গরমের সরঞ্জাম রাখা আছে। ওয়ার্কিং-মডিউলের দেয়ালের পাশেই সংশোধনকারী ইঞ্জিনের অবস্থান। এর সাহায্যেই কক্ষপথে স্টেশনটি তার ম্যানুভারিং সুসম্পন্ন করে। কক্ষপথ-স্টেশনগুলি অপেক্ষাকৃত কম উঁচুতে উড়ে। ৩০০-৫০০ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমন্ডলের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুভূত হয়। একারণে মাঝে মাঝে কক্ষপথ সংশোধন করে তার উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হয়।

স্টেশনের সিস্টেমসমূহ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কাজের জন্য বহুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন।

'সাল্যুৎ'-এর নভচারীদল বড় আকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়। নভযানটিতে দূরবর্তী নক্ষত্রসমূহের বর্ণচ্ছটা অবলোকন করতে সক্ষম এমন ধরনের স্বরগ্রাম-দূরবীনের কমপ্লেক্স — 'অরিয়ন' বসানো ছিল। বায়ুমন্ডলের বাইরে এই প্রথম এ ধরনের জ্যোতিষীয় মানমন্দির কাজ করছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় বহু সময় ব্যয় করলেও নভচারীদল মর্ত্যের কথা ভুলে যাননি। তাঁরা ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রগতি, বরফের আচ্ছাদন আর কৃষিখামারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বায়ু ও জলের

পরিচ্ছন্নতার মান নির্ণয়, খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের কাজকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ভূতাত্ত্বিক-চলচিত্র গ্রহণ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার উৎকর্ষের জন্য আরও বহুসংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। নভচারীরা তাঁদের পেশা থেকে বহুদূরের বিজ্ঞানের অপর এক শাখা — জীববিদ্যায়ও কিছু গবেষণা চালান।

এই ছোট এবং অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রথম কক্ষপথ-স্টেশন 'সাল্যুৎ'-এর নভচারীদলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল কত বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। স্টেশনটির উড্ডয়নকাল ছিল তিন সপ্তাহ। এই সময়ের মধ্যে নভচারীরা নির্ধারিত কর্মসূচী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। সারা পৃথিবী গ. দোবরাভোল্‌স্কি, ভ. ভোলকোভ এবং ভ. পাৎছায়েভের অমরকীর্তির যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈমানিক-নভচারী ভ. শাতালভ বলেছিলেন: 'আমরা, সোভিয়েত নভচারীরা উপলব্ধি করতে শিখেছি যে, মহাশূন্য বিজয়ের পথ অবিধিত, দুর্গম ও জটিল। কিন্তু কোন কিছুই মহাজাগতিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির গতিকে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধির স্পৃহাকে রোধ করতে পারবে না।'

১৯৭৩ সালের বসন্তে মহাশূন্যে উড়ল প্রথম মার্কিন কক্ষপথ-স্টেশন 'স্কাইল্যাব'। মহাশূন্যীয় গবেষণাগারটি (নামটির অনুবাদ করলে এ অর্থ দাঁড়ায়) 'স্যাটার্ন-৫' রকেটের তৃতীয় স্তর থেকে নির্মিত। তার জ্বালানী-প্রকোষ্ঠে বাস ও কর্মস্থানের সংকুলান হয়, আর অক্সিডাইজার প্রকোষ্ঠটিকে নিষ্কাশিত গ্যাসের জন্য নির্ধারিত করা হয়। স্টেশনটির সাথে সংযুক্ত জেটিবৎ গঠন জল-কপাট প্রকোষ্ঠের ফলে স্টেশনটির দৈর্ঘ্য বেড়ে ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়।

কক্ষপথে 'স্কাইল্যাব'-এর 'ডানা মেলা'র — সৌর ব্যাটারীর দুটি প্যানেল খোলার কথা ছিল। কিন্তু মহাশূন্যে উড্ডয়নের সময় সৌর ব্যাটারীর একটি প্যানেল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর দ্বিতীয়টা খুলতে

অসমর্থ' হয়। এছাড়া এই পর্যায়ে উল্কারোধী পর্দাটিও ছিড়ে যায়। ফলে নভযানে তাপমাত্রা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। সন্দেহের উদ্রেক হয় — স্টেশনে নভচারীদল পাঠানো কি উচিত হবে? তবুও ২৬শে মে নভচারী চ. কনরাড, প. ভেইৎস্ ও ড. কেরভিনকে নিয়ে 'এ্যাপোলো' নভযানটি স্টেশনের কাছে আসে। ডকিং-এর পর নভচারীরা তাদের নভযান ত্যাগ করার জন্য তাড়াহুড়া করলেন না। প্রথমে অক্ষত সৌর ব্যাটারীর প্যানেলটিকে খোলা দরকার ছিল। এজন্য দরকার উন্মুক্ত মহাশূন্যে বেরিয়ে স্টেশনের গঠন বরাবর প্যানেল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছানো। অবশ্য নভযানে করে ব্যাটারী পর্যন্ত 'উড়ে আসা' যেত। নভচারীরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলেন।

স্টেশনের সাথে সাথে উড্ডীয়মান নভযানের হ্যাচ-ওয়ে দিয়ে কোমর পর্যন্ত বের করে স্পেস্-স্যুট পরিহিত প. ভেইৎস ড্রেজার ছুরির সাহায্যে প্যানেলটিকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তবে তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন নভচারীরা স্টেশনের উপর তাপনিরোধী পর্দা — 'সৌর ছাতা' খুলে দেন। মহাশূন্যীয় গবেষণাগারে তাপমাত্রা কমে যায় এবং নভচারীরা কাজ করতে শুরু করেন।

জ্যোতিষিয় যন্ত্রপাতি দ্বারা নভচারীরা সূর্যকে নিরীক্ষণ করেন। এখান থেকে মানুষ বায়ুমন্ডলের বিঘ্ন ব্যতিরেকে দীর্ঘসময় ধরে দাগ ও বিস্ফোরণের অগ্রগতি অবলোকন করতে পারে। নভচারীরা সমুন্নতিও (Solar Prominence) দেখতে সক্ষম হন। তাঁরা কক্ষপথ থেকে রিপোর্ট পাঠান 'সমুন্নতি হল সূর্য অবলোকনের সময়ে আমাদের দেখা সর্ববৃহৎ ও অবিশ্বাস্য ঘটনা।' ১৯৬৯ সালে 'সায়ুজ-৬'-এর ফ্লাইট-ইঞ্জিনিয়ার সর্বপ্রথম মহাশূন্যে ঢালাই-এর কাজ সুসম্পন্ন করেন। এটা ছিল কক্ষপথে প্রথম প্রযুক্তিগত পরীক্ষা। বৈদ্যুতিক চুল্লি (যা 'স্কাইল্যাব'-এ স্থাপিত হয়েছিল) দ্বারা মার্কিন নভচারীরা এ বিষয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যান।

প্রথম নভচারীদল মহাশূন্যে একমাস অবস্থান করেন। পৃথিবীতে ফিরে আসার দু'সপ্তাহ আগে নভচারীরা অবশেষে নষ্ট হয়ে যাওয়া সৌর-ব্যাটারীর প্যানেলটি মেরামত করতে সমর্থ হন এবং তারা স্টেশনটিকে নতুন নভচারীদল গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেন। পরবর্তীতে যে নভচারীদল এলেন তারা মহাশূন্যে দু'মাস ধরে কাজ করেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা 'সাল্যুৎ'-কে আরও নিখুঁত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। কক্ষপথ-স্টেশনের নতুন নতুন ধরনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের নতুনত্ব প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ 'সাল্যুৎ'গুলিতে শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন আনা হয়।

আগে সৌর ব্যাটারীর প্যানেলগুলি স্টেশনের গায়ে লেগে থাকতো এবং সর্বাধিক পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ পাওয়ার জন্য স্টেশন ও নভযান উভয়কেই বহুক্ষণ ধরে সূর্যের দিকে মুখ-করে রাখতে হত। ঘূর্ণনের সাহায্যে এ অবস্থান রক্ষা করা হত। নতুন ধরনের 'সাল্যুৎ'-এর সৌর ব্যাটারীর প্যানেলগুলি কিছুটা স্বাধীনতা পায়। তারা এখন গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঘুরতে সক্ষম হল এবং তারা তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সঞ্চালকের সাহায্যে এটা করতে পারে। সৌর সংবেদনের সংকেত পেতেই প্যানেলগুলি নিজে থেকেই সৌর রশ্মির দিকে ঘুরে যেত। নিয়মিত সৌর-তাড়িত ম্যানুভারিং এখন আর অপরিহার্য থাকলো না। ফলে স্টেশনগুলি আরও স্বনির্ভর হল এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সময় বাঁচানো সম্ভব হল। কেননা সময় অপচয়কারী সমস্ত ম্যানুভারিং একেবারে বাদ দেয়া হল।

কক্ষপথ-গবেষণাগারের অভ্যন্তরেও নতুনত্বের সংযোজন হল। যেমন, 'সাল্যুৎ-4'-এ নভচারীরা তাদের প্রতিদিনের জঞ্জাল ধাতব পাত্রে সংগ্রহ করে বিশেষ জল-কপাট মাধ্যমে যানের বাইরে ফেলে দিতেন। এরপর জঞ্জালগুলি বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেত।

আভ্যন্তরীণ বাতাস থেকে যে আর্দ্রতা জন্ম নিত, 'সাল্যুৎ-4'-এ তারও সদ্ব্যবহার হত আরও ভালভাবে। 'সাল্যুৎ-৩'-এর নভচারীরা এই জল শুধুমাত্র ধোয়া-মাজার কাজে ব্যাবহার করতে পারতেন। এ জল এত পরিষ্কার ছিল যে 'সাল্যুৎ-4'-এর নভচারীরা এ জল পান করতেও সক্ষম হন। এভাবে কক্ষপথ-স্টেশনে পদার্থসমূহের পুনর্ব্যাবহারের কিছু চক্রের সৃষ্টি হয়। 'সাল্যুৎ-4 সর্বপ্রথম নভচারীদের শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভেলোরগেমিটারের আবির্ভাব ঘটে।

'সাল্যুৎ-4' তার পূর্ববর্তী নভযানগুলির তুলনায় বেশ উচুঁতে উড়তে থাকে। ফলে ট্রাজেক্টরির কোন সংশোধন ছাড়াই যানটি বহুদিন ধরে মহাশূন্যে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। যখন স্টেশনে কোন নভচারী ছিলেন না তখন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে। এক্ষেত্রে 'ক্যাসকেড' নামের নতুন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সিস্টেমটি স্টেশনের জন্য অপরিহার্য ওরিয়েনটেশন বজায় রাখত। 'সাল্যুৎ-4'-এ এই সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়। নভযানেই প্রয়োজনীয় ডাটা-প্রসেসিং করতে সক্ষম হওয়ার ফলে এই সিস্টেমটি নভচারীদের প্রতিদিন পৃথিবী থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য গ্রহণের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়।

কল্পনা করা যাক যে, দু'জন নভচারী মহাশূন্যে উড্ডয়নের প্রাক্কালে তৃতীয় জনকে তাঁদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে: চল, তিনজনে মিলে মহাশূন্যে কাজ করা যাক। দেখতেই পাচ্ছো, কত কাজ! শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তো কত! এছাড়া প্রতিনিয়ত কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের সময়সীমাও মনে রাখতে হবে, সময়মত রেডিও চালু ও বন্ধ করতে হবে, প্রতিবারই নতুন করে স্টেশনটির ওরিয়েনটেশন করতে হবে...। কিন্তু এসব যতই একঘেয়ে কাজ হোক না কেন, কাউকে না কাউকে এ কাজ তো করতেই হবে।

এখন থেকে তুমিই এসব কাজ করবে আর আমরা সত্যি সত্যি কিছু সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ পাবো। পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে আর স্বর্গসুখ উপভোগ করতে হবে না। একথা তুমি চিন্তাও করো না। আর জল ও খাবারের মজুদ শুধু আমাদের দু'জনের জন্য। কিছু মনে করো না যেন। আর কি? তুমি বিরতি ছাড়াই দিন-রাত কাজ করে যাবে। আর আমরা তোমাকে পৃথিবীতেও নিয়ে যাবো না। 'কাউকে তো স্টেশনে অবশ্যই থাকতে হবে...'

আসলে যদি এ ধরনের কথপোকথন হত, তাহলে এর উত্তর কি হত তা সহজেই বোধগম্য। তবে সত্য কথাটি হল এই যে, 'সাল্যুৎ-4' থেকে শুরু করে প্রত্যেক নভচারীদলেই আরও একজন ছিল যে এসব একঘেয়েমি কাজ করত। আমরা নিঃসন্দেহ যে পাঠক নিজেই বুঝতে পেরেছিল, এই তৃতীয় নভচারী কোন মানবসন্তান নন — রোবট। কিন্তু এটা কোন অবস্থাতেই মহাশূন্যে রোবটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ছোট করে না। বৈজ্ঞানিক নথিপত্রে রোবটটিকে স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন সিস্টেম 'ডেল্টা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্টেশনটি হল পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ এবং পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক স্টেশনের গতির বিশেষত্ব নির্ধারিত করে। যদিও এই সম্পর্ক অদৃশ্য, তবে তা অগ্রহণীয় নয়। উড্ডয়নের উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতি অনুভূত হয়, যা স্টেশনটির বেগ কখনও বা কম, কখনও বা বেশী মন্দিত ক'রে যানটিকে নীচে নামতে বাধ্য করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র এত বেশী জটিল যে যানটির পথে অদৃশ্য অসমতা দেখা দেয়। ফলে স্টেশনের কক্ষপথ মহাশূন্যে কিঞ্চিৎ 'ভাসমান' বলে মনে হয় এবং এর ব্যবহারের এই বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য মনে করেই প্রতি সেকেণ্ডে স্টেশনটির অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। হ্যাঁ, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতি সেকেণ্ডে এখানে বহু দশক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হয়।

আগে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে এ ধরনের হিসাব করা হত এবং তা নভচারীদলের কাছে পাঠানো হতো। ইথার তখন সংখ্যা আর কোড-শব্দে ভরে যেত বলে অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো সম্ভব হত না। শেষের দিকের 'সাল্যুৎ'-এর নভচারীদল এই একঘেয়ে কাজ থেকে একদম মুক্ত ছিলেন।

মানুষের সাথে রোবটের চেহারার বাহ্যিক মিল আজ আর রোবটের উৎকর্ষতার স্বীকৃতি নয়। 'ডেলাটা' কোনভাবেই তার নির্মাতাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। এটা হল কিছু সংখ্যক নাতিবৃহৎ ধাতব বাক্সের সমষ্টি যাতে রঙিন কি-বোর্ড ও ডিসপ্লে বসানো আছে। এতদ্বসত্ত্বেও রোবটের 'ইন্দ্রিয়শক্তি' আছে — রেডিও অল্টিমিটার (যা উড্ডয়নের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়), নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য স্টার-সিকার (star-seeker), গতি নির্দেশক এবং তার নিজস্ব 'মগজ' অথবা যাকে কম্পিউটার বলা হয়।

নভচারীরা 'ডেলটো'র প্যানেলের কাছে সাঁতরে আসেন এবং কয়েকটি বোতাম টিপে দেন। যন্ত্রটি থেকে মৃদু শব্দের সাথে পাতলা কাগজের টেপ বেরিয়ে আসে, যাতে বহু বর্ণ ও সংখ্যা লেখা থাকে। এই ডাটাটি নভচারীদলকে একদিন আগেই দিনের কর্মসূচী জানিয়ে দেয় — যোগাযোগ অধিবেশনের বিরতি, পৃথিবীর ছায়ায় অনুপ্রবেশ ও ছায়া থেকে বহির্গমন, কক্ষপথ কর্তৃক বিষুবরেখার সমতলের কর্তনের মুহূর্ত, প্রতিটি আবর্তনের সময়কাল এবং কক্ষপথীয় বিচ্যুতি। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই নভচারীরা উড্ডয়নের বিস্তারিত পূর্বাভাসের সাথে পরিচিত হন। তবে হিসাব-নিকাশ করাই শুধু 'ডেলটো'র কাজ নয়। নিজস্ব হিসাবের ফলাফলের সাহায্যে সে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। রোবটটি নিজেই যন্ত্র চালু বা বন্ধ করে, নিজেই ওরিয়েনটেশন ও স্থিতিশীলতার সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। আগে পৃথিবী থেকে পাঠানো নির্দেশেই তা করা হতো: 'অমুক নক্ষত্র

বরাবর যাও, এই অবস্থানে এত সময় ধরে থাকো,...' ইত্যাদি। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে নির্দেশসমূহ পাঠানো হত, স্টেশনটি শুধুমাত্র তা নির্দ্বিধায় বাস্তবায়িত করত। বর্তমানে 'ডেল্‌টা' তার স্মৃতিতে নক্ষত্র-ক্যাটালগ ও নক্ষত্র-ট্র্যাকিং কর্মসূচী ধারণ করে রাখে।

'ডেল্‌টা' অনেক কিছুই করতে সক্ষম। তবে সে সহজ কাজ করতেও অপারগ নয়। গবেষকরা ভালভাবেই জানেন যে, ঘন ঘন ইন্সট্রুমেন্ট-রিডিং কত একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর। নভচারীদের এজন্য শুধু 'ডেল্‌টা'র বোতাম টিপতে হবে। তাহলে রোবটটি রিডিং বা আলোকচিত্র গ্রহণের সঠিক সময় নির্দেশ করবে। আর অন্ধকারে এসব পরিমাপ গ্রহণ করতে হলে (জ্যোতিষপদার্থীয় পর্যবেক্ষণের সময় এটা প্রায়ই হয়ে থাকে) এধরনের সাহায্য শুধুমাত্র সুবিধাজনকই নয়, অপরিহার্যও বটে।

পরবর্তী স্টেশন — 'সাল্যুৎ-৫'-এরও পূর্ববর্তী স্টেশনগুলির তুলনায় বেশ কিছু নতুনত্ব ছিল। এদের একটি হল স্ট্যাবিলাইজেশন সিস্টেম। এখানে শুধুমাত্র জেট-ইঞ্জিনই ব্যবহৃত হয়নি, এখানে চুম্বক-ক্ষেত্রে ঝুলন্ত বল-ফ্লাইহুইলও ব্যবহৃত হয়েছে। যখন স্টেশনটি কোন অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয় (ধরা যাক যে, এটা হল নভচারী কর্তৃক 'দেয়ালে' ধাক্কা দেওয়ার ফলে), নিয়ন্ত্রণসিস্টেম থেকে সংকেত তড়িৎচুম্বকে যেতে থাকে, যা বল-ফ্লাইহুইলকে ঘোরাতে থাকে। এর ফলে যে রিঅ্যাকটিভ মোমেণ্টের সৃষ্টি হয় তা স্টেশনটিকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। স্টেশনে যদি শুধু জেট-ইঞ্জিন থাকতো তাহলে তা এত প্রয়োজনীয় জ্বালানী শুধুমাত্র স্ট্যাবিলাইজেশনের কাজে খরচ করত। আর 'সাল্যুৎ-৫'-এ বল-ফ্লাইহুইল সর্বাধিক গতিপ্রাপ্ত হলেই ইঞ্জিন চালু হত বলে বহু জ্বালানী বেঁচে যেত।

দুটি নভচারীদল স্টেশনে ৩০০-এর বেশী বিভিন্ন ধরনের গবেষণা

ও পরীক্ষা চালায়। ফলে বহু তথ্য পাওয়া যায় যা পৃথিবীতে পাঠানো দরকার ছিল। সাধারণত এটা রেডিও'র মাধ্যমে করা হয় অথবা তথ্যাবলি নভচারীদের সাথে পৃথিবীতে পাঠান হয়। 'সাল্যুৎ-৫'-এ আরও একটি ব্যবস্থা ছিল। সেখানে অবৃহৎ, ফেরতযোগ্য একটি যন্ত্র বসানো ছিল। এই যন্ত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ও যন্ত্রপাতি রাখা ছিল এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

১৯৭৭ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর 'সাল্যুৎ-৬' স্টেশনটিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। এই কক্ষপথ-স্টেশনটি নির্ভরযোগ্য মহাকাশীয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

এর আগে কখনও মহাকাশীয় জোটিতে এক সাথে দুটি জাহাজ লাগেনি এবং স্বল্পকালীন অতিথিদের স্বাগতিকের জাহাজে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনও এই প্রথম। এই প্রথমবারের মত নভচারীরা উড্ডয়নকালে কক্ষপথ থেকে শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ তথ্য পাঠাননি, তাঁরা পৃথিবীপৃষ্ঠে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত ফলাফলও ফেরত পান। এই উড্ডয়নের সময় আরও একটি নতুন ও জটিল কাজ সুসম্পন্ন হয় — রি-ডকিং ভবিষ্যতের মহাকাশীয় শহর ও কল-কারখানার নির্মাতাদের অন্যান্য গ্রহপৃষ্ঠে এই কাজটি প্রায়ই করতে হবে।

সপ্তাহ, মাস, বছর গড়িয়ে যেতে থাকল, নভচারীদলের পরিবর্তন হল। কিন্তু স্টেশনটি আগের মতই নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে যেতে লাগল। ফলে নভচারীরা নির্ধারিত কর্মসূচী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়নের ভাল সুযোগ পেলেন। প্রথমবারের মত স্বয়ংক্রিয় মালবাহী জাহাজ 'প্রগ্রেস' ব্যবহারের ফলে উড্ডয়নকাল বাড়ানো ও উড্ডয়ন কর্মসূচী আরও ফলপ্রসূ করা সম্ভব হয়। কক্ষপথ-স্টেশনের উড্ডয়ন যত দীর্ঘ হবে তার ইঞ্জিনঘরের ট্যাঙ্কগুলিতে জ্বালানীর পরিমাণ তত কম হবে। মহাকাশীয় ট্যাঙ্কার — মালবাহী জাহাজ 'প্রগ্রেস' সর্বপ্রথম মহাশূন্যে রিফুয়েলিং-এর কাজ সম্পন্ন করে।

বাহ্যত 'প্রগ্রেস'র সাথে 'সায়ুজ'র বেশ মিল আছে।

বাস্তবত 'সায়ুজ'র ভিত্তিতে 'প্রগ্রেস' নির্মিত হয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে জাহাজের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। স্বভাবতই অন্য একটি দায়িত্ব জাহাজের নির্মাণ কৌশলের উপর ছাপ ফেলেছে। যানটি এখন হল চালকবিহীন। নভচারীরা যে সিস্টেমগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের জায়গায় পৃথিবীর নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পালনের সিস্টেমের আবির্ভাব হল। জাহাজে নভচারীদল না থাকাতে প্রত্যাবর্তনকারী যানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় (এই প্রত্যাবর্তনকারী যানের অবতরণ ও নীচে নামার সিস্টেমগুলির প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে যায়)। তার জায়গা দখল করে জ্বালানী ও অক্সিডাইজারের জন্য নির্ধারিত ট্যাঙ্ক সম্বলিত মডিউল। আর কক্ষপথ-মডিউল (যেখানে জাহাজের নভচারীরা মহাশূন্যে তাদের মূল সময় অতিবাহিত করেন) 'প্রগ্রেস'র ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে মালবাহী মডিউল। জাহাজটি স্টেশনে বয়ে আনে এয়ার-রিজেনারেটর, ফিল্টার, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস, এ্যাবজরবার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। 'প্রগ্রেস' পানীয় জল, খাবার, মজুদ বায়ু, পরিষ্কার কাপড় ও আরও অনেক কিছুই পৌঁছে দেয়। প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আসে বিশেষ প্ল্যাণ্ট 'স্প্লাভ', অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম।

তেল স্থানান্তরের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নেয়া হয়। কেননা মহাশূন্যে এ ধরনের অপারেশন এই প্রথম। কক্ষপথে রিফুয়েলিং-এর কাজ সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হয়। তারপর নভচারীরা জাহাজ থেকে মালপত্র স্টেশনে নিয়ে জায়গামত রেখে দেন আর অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্যাকিং 'প্রগ্রেস'-এ রেখে দেন। কেননা, পরবর্তীতে 'প্রগ্রেস' বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রথম 'প্রগ্রেস', পরবর্তী মালবাহী জাহাজসমূহের সামনে দ্বার

খুলে দেয়। এভাবে 'পৃথিবী — কক্ষপথ' রুটটি মহাকাশীয় যোগাযোগের আরও একটি মাধ্যমের আওতাভুক্ত হয়।

'সাল্যুৎ-৬'-এর উড্ডয়নকালে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের যাত্রীবাহী জাহাজ 'সায়ুজ-T'-এর টেস্টিং হয়। 'সায়ুজ-T' সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনকারী 'সায়ুজ' জাহাজের স্থান দখল করে। আগের বাহ্যিক রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও নতুন জাহাজ আর তার পূর্বেকার জাহাজের মধ্যে ছিল অনেক তফাৎ। সর্বাগ্রে এই তফাৎ ছিল গতি নিয়ন্ত্রণের নতুন সিস্টেমে, যাতে প্রথমবারের মত অন্তর্ভুক্ত হয় বিশেষ ধরনের কম্পিউটার। ফলে জাহাজের উড্ডয়নকালে ও অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয়তা, নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও নভচারীদলের কাজ বহুলাংশে সহজ হয়ে পড়ে। যানমধ্যস্থ অন্যান্য সিস্টেমগুলির জায়গা দখল করে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের সিস্টেমসমূহ।

নভচারীরা 'সায়ুজ-T' তে করে চারবার উড়েছিলেন এবং প্রতিবারই তাদের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, এই যানটি আগেকার মডেলের তুলনায় সর্বদিক দিয়ে শ্রেয়।

নভচারীদের মাঝে মাঝে স্টেশন থেকে বের হওয়া প্রয়োজন। আবদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘকালীন অবস্থানই এর একমাত্র কারণ নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনেও এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নভচারীরা শুধুমাত্র যান মধ্যস্থ সিস্টেম ও যন্ত্রপাতিই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন না, জাহাজের বাইরের যন্ত্রপাতিও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। শুধুমাত্র এক্ষেত্রে নভচারী তার মহাকাশীয় বাড়ীর প্রকৃত কর্তা হতে পারেন।

স্টেশনে নভচারীদলের আগমনের দেড় সপ্তাহ পরে 'সাল্যুৎ-৬'-এর 'দরজা' প্রথম বারের মত খোলা হয়। গ. গ্রেচকো ও ইউ. রোমানেন্‌কো অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অতিথিবরণের জন্য প্রায় সবকিছুই তৈরী ছিল। তবে কিছু সন্দেহ ছিল বৈকি! দুমাস আগে

যখন 'সায়ুজ-২৫' স্টেশনের কাছে এসেছিল তখন তা স্টেশনের দ্বিতীয় ডকিং-গ্রন্থির কোন কোন অংশের ক্ষতিসাধন করে থাকতে পারে। তাই গ্রন্থিটি যাচাই করে দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর প্রয়োজনবোধে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতও অপরিহার্য। গ্রন্থিটি অক্ষত ছিল এবং বিশ দিন পরে ও. মাকারোভ ও ভ. জানিবেকভ-চালিত জাহাজ স্টেশনের গায়ে এসে লাগে।

এ সব সত্বেও পুনরায় উন্মুক্ত মহাশূন্যে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

নভচারীদের নতুন পোশাক। 'সাল্যুত-৬'-এ ভ্রমণকারী নভচারীরাই প্রথম নতুন ধরনের স্পেস্-স্যুট ব্যবহার করলেন। তাদের এই পোশাক আমাদেরকে মধ্যযুগের নাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মহাশূন্যীয় পোশাকের পরিকল্পকরা কিরাস-এর কথা মনে করে এই ধরনের স্পেসস্যুট তৈরী করেছিলেন। বহুপূর্বে যোদ্ধাদের জন্য পিঠ ও বুকের মাপে বাঁকানো দুইটি ধাতুর পাত বেল্টসংযুক্ত করে যে পোশাক তৈরী করা হত তাকে কিরাসা বলা হত। এখন এই কিরাসাই নতুন স্পেসস্যুটের ধড়ে পরিবর্তিত হল। অবশ্য এটা সত্যি যে মহাশূন্যে কেরাসা তার ওজন হারায়। কোন এক সময়ে এই ওজনই একে ফ্যাশন-বহির্ভূত হতে বাধ্য করে।

মহাশূন্যে বহির্গমনের পূর্বমুহূর্তে নভচারীদের ধারাবাহিক কার্যকলাপের তালিকায় এমন একটি নির্দেশ ছিল: 'স্পেসস্যুটে প্রবেশ'। হ্যাঁ, এই স্পেসস্যুট পরতে হয় না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। যেমন করে দরজার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, ঠিক তেমনি করেই এই স্পেসস্যুটের পিঠে অবস্থিত হ্যাচ-ওয়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা হয়। হ্যাচ-ওয়ের ঢাক্‌নীর উপরের থলিতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী রাখা আছে। রুক্ষ ধড়ের সঙ্গে

কাঁচের পোর্টহোলযুক্ত শিরোস্ত্রান আঁটকানো আছে। হাত ও পায়ের আবরণগুলি আগের মতই নরম থাকে। স্পেসস্যুটে নভচারীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের এবং স্বাভাবিক মিক্রোক্লাইমেট সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে। ফলত, মহাশূন্যে নভচারীদের প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা বজায় রাখা সম্ভব। নভচারীদের পূর্বের পোশাকের তুলনায় এখনকার পোশাকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় থলিগুলি এমনভাবে লাগানো থাকে যে সবকিছু একটি পোশাকে পরিণত হয়। এইভাবে স্পেসস্যুটে প্রয়োজনীয় বোতামের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কমানো সম্ভব হয়। উপরোক্ত উভয় কারণেই স্পেসস্যুটের বিপদমুক্ততা ও স্থিতিশীলতা বাড়ে।

'স্যালুট-6' কক্ষপথ-স্টেশনে অন্যান্য অনেক নতুন যন্ত্রপাতিও পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাই স্টেশনটিকে যথার্থভাবেই উড়ন্ত নভপদার্থবিদ্যার মানমন্দির ও কক্ষপথে অবস্থিত কর্মশালা বলা চলে।

নভপদার্থবিদ্যার আধুনিক পদ্ধতিগুলি সত্য সত্যই বিস্ময়কর তীক্ষ্ন দৃষ্টির অধিকারী। বেতার-দূরবীন আন্তর্নক্ষত্রীয় মহাশূন্যে অবস্থিত পৃথক পৃথক অণুগুলিকেও পর্যবেক্ষণ এবং সনাক্ত করতে পারে। রঞ্জনরশ্মি-দূরবীন এসব অণুর গঠন বর্ণনা করে। আর গামা-জ্যোতির্বিদ্যা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে কী রয়েছে তা দেখার ক্ষমতার অধিকারী। এই সবকিছুই এত বেশী দূরে অবস্থিত যে প্রকৃতি জগতে সবচেয়ে দ্রুতগামী আলোক রশ্মি সেখান থেকে এসে পৌঁছাতে কয়েকশ বছর এমন কি কয়েক হাজার বছর লেগে যায়।

কিন্তু মহাজাগতিক গামারশ্মি বিচ্ছুরণ আমাদের ভূপৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব বায়ুমণ্ডল ওই রশ্মিকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে। অপর পক্ষে এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোকতরঙ্গের তুলনায় কয়েক কোটি গুণ ছোট হওয়ায় তা চোখে দেখা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই দুই বাধাই অতিক্রম

করতে সক্ষম হয়েছেন। মানবচক্ষু গঠনে আপেক্ষিকভাবে অনুন্নত বলে বিশেষ ধরনের কাউন্টার-রেজিস্টার নির্মিত হয়েছে। আর কৃত্রিম উপগ্রহ যন্ত্রপাতিকে বায়ুমন্ডলের ঘনস্তরগুলির বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছে।

মহাজাগতিক গামা রশ্মির বিচ্ছুরণ থেকে অনেক কিছু জানা সম্ভব হতে পারে। প্রতিবিশ্বের অস্তিত্ব মহাবিশ্বে থাকলে এই রশ্মি তার সাক্ষ্য দেবে অথবা তা ছায়াপথের কয়েলরূপে গঠন ব্যাখ্যা করবে। গামারশ্মির ভাষায় মহাশূন্য থেকে পাওয়া প্রতিবেদনের কল্যাণে মহাবিশ্বের নতুন মডেল গঠন বা পুরাতন মডেলকে খন্ডন সম্ভব হবে।

যাহোক, 'স্যালুত-6" — এর গামা-দূরবীন 'এলেনা' কিন্তু মহাজাগতিক তত্ত্ব বিনাশক ভূমিকা দাবি করেনি। অনতিকায় এই যন্ত্রের সরলতর উদ্দেশ্য ছিল — ভবিষ্যতে কক্ষপথে অবস্থিত দূরবীন নির্মাণে কৃৎকৌশলীদের কী ধরনের উপাদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করা। 'এলেনা' দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করে।

'স্যালুট-6' কক্ষপথ-স্টেশনে মহাজাগতিক বেতার দূরবীন **KPT-10** মহাশূন্যে প্রথমবারের মত পরীক্ষা করে দেখে। এই নতুন যন্ত্রটিকে, বহনকারী আসন্ন মালবাহী নভযানটির কেবিনে ভাঁজ করা অবস্থায় ও যথেষ্ট কষ্টে আঁটান হয়। তাতো হবেই, কেননা যন্ত্রটির এ্যান্টেনাটির ব্যাস 10 মিটার এবং একে যে কোন স্টেশনের নিজস্ব আয়তনের সাথে সহজেই তুলনা করা চলে। কক্ষপথে এত বিশাল কাঠামোর সংযোজনও এই প্রথম। অচিরেই সূর্যালোকে চকচক্ করা বিশাল ধাতব 'ছাতাটি' কক্ষপথ-স্টেশনটিকে শোভিত করে।

মহাশূন্যে মানমন্দির — বেতার জ্যোতির্বিদদের অনেকদিনের স্বপ্ন। কারণটি কেবল এই নয় যে, পৃথিবীতে তাদের যন্ত্রপাতি বাস্তবিক পক্ষে চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। ওজনহীনতার স্বাধীনতা

কৃৎকৌশলীদের আকৃষ্ট করে। সাংবাদিক ইয়া. গলাভানোভ লিখেছেন 'ওজনহীন স্থাপত্যশিল্পে আয়তনের কোন বাঁধা-ধরা সীমা-পরিসীমা নেই। আমি মনে করিনা যে, 25 কিলোমিটার উঁচু দালান তৈরি পৃথিবীতে সম্ভব হতে পারে — কিন্তু মহাশূন্যে তা সম্ভব'। অপর পক্ষে ওজনহীন অবস্থায় সীমাহীন ক্ষিপ্রতার সুযোগ রয়েছে। বেতার-জোতির্বিদ্যার এ্যান্টেনার জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

KPT-10-এর সাহায্যে নভচারীরা ছায়াপথ ও সূর্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং 'পালসার'র কণ্ঠস্বর, শুনতে সক্ষম হন। এই যন্ত্রে পৃথিবীর দিকে তাক করে ভূপৃষ্ঠ, সাগর, মহাসাগর ও আবহাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। সর্বদর্শী বেতার তরঙ্গ দিনে ও রাতের বেলায় যে কোন আবহাওয়াতেই পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে।

এই উড্ডয়ন কার্যক্রমের অন্যতম নাটকীয় ঘটনাটির সাথেও KPT-10 সংশ্লিষ্ট। পর্যবেক্ষণ শেষ হবার পর — বলা যেতে পারে যে, 'যবনিকাপাতের পর' — দূরবীন, ক্রুদের এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা উপহার দেয়। এ্যান্টেনাটি ডকিং-সমাহারের বাইরের দিকে সংযোজিত ছিল। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ওখানে রেখে দেয়ার অর্থ দাঁড়াত যে, স্টেশনটি তার দুটি 'ডকিং বার্থ'-এর একটি হারায়। এই বার্থটিতেই মালপরিবাহী নভ-ট্যাঙ্কার 'প্রগ্রেস' ভিড়ে। তাই এ্যান্টেনাটিকে সেখান থেকে বিযুক্ত করে কক্ষপথ-স্টেশন থেকে সরান প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। 'নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী' এটাই হওয়া উচিৎ ছিল। এই শব্দগুলি দেখে ভুললে চলবেনা যে কাজটি কত জটিল। মহাশূন্যকে বাসযোগ্য করে তুলতে আমাদের আরো দীর্ঘদিন কাজ করে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে অনেক কিছুই আমাদের প্রথমবারের মত করতে হবে। মানুষের অবিদিত এই

পরিবেশে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে আমরা বহুধরনের বাধার সম্মুখীন হব।

এবারেও এমনটি ঘটেছে। এ্যাণ্টেনার সুবৃহৎ কাঠামোটি কক্ষপথ-স্টেশন থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সোজাসুজি অগ্রসর না হয়ে একটু বেঁকে যায় এবং ফলত, তা ডকিং-মডিউলের নিশানার বেরিয়ে-আসা কোনায় আটকে পড়ে। প্রথমে নভচারীরা ভেবেছিলেন যে, এটা সহজেই সরিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বোঝাটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় 'স্যালুট' স্টেশনটি ম্যানুভার করেও কোন ফল পাওয়া যায় না। বরং এ্যাণ্টেনাটি আরো বেশী ঘুরে যায় এবং শক্তভাবে স্টেশনটিকে আঁকড়ে রাখে।

নভচারীরা বিষয়টি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে নভযান থেকে মহাশূন্যে বেরিয়ে এসে হাত দিয়ে এ্যাণ্টেনাটিকে সরিয়ে ফেলার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমবারের মত 'স্যালুট-6' স্টেশনে পরীক্ষাকৃত 'পৃথিবী-মহাশূন্য' টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়। পৃথিবীতে কাজটি সম্পন্ন করার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয় এবং টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে কক্ষপথ-স্টেশনে তা প্রেরণ করা হয়। পরিচালনাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনাটি বিবেচনা ও আলোচনা করে কক্ষপথ স্টেশনের ক্রুরা এই কঠিনতম কাজটি সাফল্যের সাথে সমাধা করেন।

'স্যালুট-6' কক্ষপথ-স্টেশনটি সত্যিকার অর্থেই প্রযুক্তিগত গবেষণাগারের সাথে তুলনীয়। এতে রাখা দু'টি বৈদ্যুতিক ঢালাই চুল্লীর একটি 'ধাতুসঙ্কর' প্লাণ্টে ওজনহীন পরিবেশে বিভিন্ন ধাতুসঙ্কর, সেমিকণ্ডাক্টার পদার্থ সামগ্রী, অপটিক্যাল লেন্স তৈরি করা হয়। একই সাথে নভচারীরা 'কৃষ্টাল' নামক প্লাণ্টেও কাজ করেছেন। এই চুল্লীটি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ কাজের জন্য নির্ধারিত

ছিল। চুল্লীটি কেবল চারটি পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে সেমিকন্ডাক্টার উৎপাদন করত।

কম্পিউটার পরিচালিত এই চুল্লীগুলি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হত।

বিবিধ ধাতবপৃষ্ঠে ধাতব আস্তর দেয়ার যন্ত্রপাতিও 'স্যাল্যুট-6'-তে সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ, কক্ষপথ-স্টেশন, মালপরিবাহক ইত্যাদি নভযানগুলিতে আস্তর লাগানোর কাজটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: পুরো সময়ে নির্ধারিত তাপমাত্রা বজায় রাখা, আয়ন সৃষ্টিকারী রশ্মির বিকিরণ থেকে প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

যে কোন নভযান যতবেশী সময় উড্ডয়নলিপ্ত থাকে, মহাশূন্য ততবেশী তার বহিরাবরণীতে ছাপ ফেলে। ক্ষুদ্র উল্কা কণিকা, নাতিদীর্ঘ সৌররশ্মির বিকিরণ, তাপমাত্রার ঘন ঘন ও তীব্র পরিবর্তন, সুগভীর শূন্যতা এসবই নভযানের বহিরাবরণীর আস্তরকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে। আজকাল যখন মহাশূন্য উড্ডয়ন কার্যক্রমের দৈর্ঘ্য মাসে হিসাব না করে করা হয় বছরে, তখন বহিরাবরণীর আস্তর মেরামত করার প্রশ্ন অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ জন্যই 'বাষ্পীকারক' নামক প্লান্টটিকে পরীক্ষা করে দেখা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যেমনটি আশা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি — মহাশূন্যে প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া পৃথিবীর মত অতিবাহিত হয়নি। প্রাথমিক পরীক্ষার সময়ই গবেষকদের কতগুলি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা মনে করেছিলেন যে, ধাতু বাষ্পীকরণ ও ঘনীভবনে ওজনহীনতা সম্ভবত তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে না। এই মূল নীতির ভিত্তিতেই মহাশূন্যে আস্তরক-আবরণী তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেখানে উৎপাদিত নমুনাগুলিতে অসাধারণ ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্ম বিশিষ্ট আবরণী

পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরু নমুনাগুলিতে এধরনের বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। পুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীতে আবরণীগুলি তাদের মসৃণতা ও চকচকে ভাব হারায়। কিন্তু মহাশূন্যে তৈরী আবরণী যত বেশী পুরু হয় তত বেশী তা আয়নার মত ঝক্‌ঝক্‌ করে।

বলা চলে যে, কক্ষপথে এধরনের প্রাথমিক পরীক্ষা এক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আগামীতে খুব সম্ভবত 'বাষ্পীকারক' পিস্তলের আকৃতি লাভ করবে। এর সাহায্যে নভচারীরা রঙ-করার যন্ত্রের মত সময় সময় তাদের মহাশূন্য আবাসে ধাতব-বাষ্প ছিটাবেন। আবার এমনও হতে পারে যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির কাজ তাঁরা বেতার যোগে নিয়ন্ত্রণ করবেন। যাহোক সময় আসলেই এ সম্পর্কে সবকিছু জানা যাবে।

এ জাতীয় যন্ত্র-উপকরণের সাহায্যে মহাশূন্যে কেবল পুনঃস্থাপন ও মেরামত কাজই হবে না, বৃহদাকার কাঠামোও নির্মাণ করা যাবে — এ সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যায় না। কক্ষপথে উৎপাদিত আবরণীর ঝকঝকে অতিকায় প্রতিফলক মহাশূন্যে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে তা পৃথিবীতে পাঠাবে। মহাশূন্যে অবস্থিত বিশাল আয়না ফসলের ক্ষেতে দিবা-ভাগ বৃদ্ধি করবে, সুবৃহৎ বেতার এ্যণ্টেনা দূরতম জগতের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে...

'স্যালুট-6' কক্ষপথ-স্টেশনটি দীর্ঘায়ু মহাশূন্যবাসীতে পরিণত হয়েছে। চার বছরের বেশী সময় তা একের পর এক ঘূর্ণনচক্র অনুসরণ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। স্টেশনটি ২০ টি যাত্রীবাহী 'সায়ুজ' ও 'সায়ুজ-T' নভযানকে স্বাগত জানিয়েছে। ১২ টি মালবাহী নভযান 'প্রগ্রেস' নিয়মিতভাবে তার কক্ষপথ-জীবনকে দীর্ঘায়িত করেছে। পাঁচটি অভিযাত্রীদল ক্রমান্বয়ে 'স্যালুট-6' স্টেশনে কাজ করেছে। এদের প্রতিটি দলই মহাশূন্যে অবস্থানের সময়ের একে

অপরের রেকর্ড ভেঙ্গে আজ তা ১৮৫ দিনে উন্নীত করেছে। সব মিলিয়ে তিন তিন বার নভচারীরা স্টেশনটির বায়ুরোধক কেবিন থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত মহাশূন্যে কাজ করেছেন। স্টেশনটি ১১ বার অতিথিবরণ করেছে এবং এদের ৯ জন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক।

1982 সালের গ্রীষ্মে 'স্যালুট-6' তার উড্ডয়ন কার্যক্রম শেষ করে। ইতিমধ্যে 'সালুটে-7' — পরবর্তীতে তার স্থান দখলকারী — তিন মাস ধরে মহাশূন্যে অবস্থান করছিল। এই স্টেশনটির আরোহীরাও অনেক কিছুই প্রথমবারের মত সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেন।

যেমন, কক্ষপথ-স্টেশনটি এভাবেই প্রথম বৈকান্দ্র নভযান উৎক্ষেপণকেন্দ্রের শাখায় পরিণত হয়। 1982 সালে মে মাসে 'স্যালুট-7' থেকে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ 'ইসক্রা-2' উৎক্ষিপ্ত হয়। মস্কো বিমানচালনা ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা কৃত্রিম উপগ্রহটির নক্শা প্রণয়ন ও তা নির্মাণ করেছেন।

প্রায় তিন বছর আগে এই ইন্সটিটিউটে নির্মিত প্রথম 'ইসক্রা-1' কৃত্রিম উপগ্রহটি কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়। বেতার সরঞ্জামে সজ্জিত এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সোভিয়েত ও বিদেশী বেতার যোগাযোগ ক্লাবগুলি একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হত। উৎক্ষেপণের পর প্রথম মাসেই একশটিরও বেশী দেশের বেতার যোগাযোগ ক্লাবের সদস্যরা কৃত্রিম উপগ্রহটি ব্যবহার করেন। এদের অনেকেই একে অপরের কাছ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে ছিলেন।

কক্ষপথ-স্টেশনের স্লুইজকক্ষকে 'স্যালুট-7'-এর ক্রুরা উৎক্ষেপণমঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন। স্টেশনটিতে দুটি এমন কক্ষ রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলার জন্য এবং উম্মুক্ত মহাশূন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর কাজে ক্রুরা এগুলি ব্যবহার

করেন। নভচারীরা নিজেরা অবশ্য এ সময়ে বায়ুরোধক মডিউলে অবস্থান করেন।

'মহাশূন্য স্লুইজ'-এর গঠন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া যাক। এই ব্যবস্থাটি দুটি গোলাকার কাঠামো সমন্বয়ে গঠিত। এদের দ্বিতীয়টি প্রথমটির মধ্যে অবস্থিত এবং ঘূর্ণনক্ষম। বায়ুনিরোধক মডিউল ও মহাশূন্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্য স্লুইজকক্ষের বাইরের দিকে অবস্থিত কাঠামোতে প্রবেশ ও নিষ্কাশন — দুটি ছিদ্রপথ রয়েছে। ভেতরকার গোলাকৃতি কাঠামোর ছিদ্রপথ অবশ্য একটি। এই ছিদ্রপথে বর্জ্যপদার্থ বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত আধার কক্ষটিতে প্রবেশ করে। কাজটি চলার সময় ভিতরকার গোলকটির অপর অংশটি কক্ষের নিষ্কাশন পথকে খুব ভালোভাবে বন্ধ করে রাখে। কাজটি শেষ হলে নভচারীরা প্রবেশদ্বারের কপাট বন্ধ করে এমনভাবে আভ্যন্তরীণ কাঠামোকে ঘুরাতে থাকেন যাতে ছিদ্রপথ নিষ্কাশন পথের উপর পড়ে। এরপর স্প্রীংয়ের সাহায্যে ঠেলা দিয়ে কন্টেইনারকে বাইরে ফেলে দেয়া হয়।

কক্ষপথ-স্টেশনটি যখন মস্কো বিমানচালনা ইন্সটিটিউটের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বেতার-দৃশ্যমান এলাকায় অবস্থান করছিল তখন কৃত্রিম উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

উড়ন্ত নভযান-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ঠেলা খেয়ে কৃত্রিম উপগ্রহটি ধীরে ধীরে স্টেশনটি থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে উড়তে থাকে।

'স্যালুট-7'-এ স্থাপিত রঞ্জনরশ্মি দূরবীনের সাহায্যে নভচারীরা জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তুর রশ্মি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেন। আমাদের দেশ আয়তনে যথেষ্ট বড় হওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে নির্বাচিত যে কোন নক্ষত্র বা ছায়াপথকে পৃথিবীর ঘূর্ণন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে একের পর এক মানমন্দির থেকে অনুসরণ করা সম্ভব। এ ধরনের গবেষণা

ও মহাশূন্য থেকে পর্যবেক্ষণ — এসব মিলিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্যাবলী পাওয়া গেছে।

কক্ষপথ-স্টেশনটির প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির মধ্যে নতুন কিছু যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের জানা 'ধাতুগলণ' ও 'কৃস্টাল'-এর সাথে নতুন 'করউন্ড' প্লান্ট যুক্ত হয়েছে।

'স্যালুট-6' ও 'স্যালুট-7'-এর অভিযাত্রা পূর্ববর্তী অভিযাত্রাগুলি থেকে কেবল তাদের উড্ডয়ন সময়ের দীর্ঘতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশ্নেই পৃথক ছিল না। মহাশূন্যে একই সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে নিয়োজিত দুটি নভযানকে সংযুক্ত করে কক্ষপথ সমাহারের আয়তন ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের কক্ষপথ-স্টেশনগুলি নভস্থাপত্য শিল্পে অভূতপূর্ব মডেল সৃষ্টি করেছে।

এইভাবে, বিজ্ঞানী ও ডিজাইনারদের নিয়মিত প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের 'মহাশূন্যে অধিবাস'-এর প্রকৃত চেহারাটা আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

আজকাল মহাশূনীয় প্রযুক্তিবিদ্যার স্রষ্টাদের চিন্তাধারা আরো দূরে অগ্রসর হচ্ছে।

হতে পারে, মহাশূন্যে ভবিষ্যতের কক্ষপথ-স্টেশনগুলি আধুনিক দালানগুলির মতই বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্লক দ্বারা নির্মিত হবে। প্রথমে স্টেশনের প্রত্যেকটি অংশ পৃথিবীর নিকটস্থ কক্ষপথে পরিবহন ও তারপর সেগুলি একসঙ্গে জড় করা হবে। পৃথক-পৃথক বাসস্থান-মডিউলগুলি বায়ুরুদ্ধ হতে হবে, যেন অনেক বড়সড় উল্কাপিন্ডও কক্ষপথ-স্টেশনকে তার কর্মস্থল থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

কোন কোন পরিকল্পনায় মহাশূন্যে কৃত্রিম মহাকর্ষ-বল সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিবর্তে কক্ষপথ-স্টেশনের মন্থর ঘূর্ণনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাভিমুখী বল ব্যবহার করা যেতে পারে। এর থেকে ভবিষ্যত কক্ষপথ-স্টেশনের

আকার বহুলাংশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্টেশনের জন্য নানা ধরনের গঠন প্রস্তাবিত হয়েছে: বিশাল আংটি-আকৃতি, চক্রাকৃতি, নক্ষত্রাকৃতি ইত্যাদি।

নভযানে চড়ে দূরবর্তী অন্তঃগ্রহ যাত্রার জন্য দরকার মধ্যবর্তী কক্ষপথ-স্টেশন। এই ধরনের ঘাঁটিতে অন্তঃগ্রহ যাত্রার বিশাল নভযান নির্মাণের সাজসরঞ্জাম রাখা সম্ভব হবে। কেননা, পৃথিবী থেকে এমন বিশাল নভযানকে মহাশূন্যে পরিবহন করা এমনকি সর্বোচ্চ শক্তিশালী রকেটের পক্ষেও সম্ভব নয়। বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী কক্ষপথ-স্টেশন মহাশূন্যে প্রকৃত উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সৃষ্টি করবে।

মহাশূন্যে সহযোগীতা

আজ থেকে ষাট বছর আগে যখন মুষ্টিমেয় ক'জন মহাশূন্য অভিযানের স্বপ্ন দেখতেন তখন মহান রুশ বিজ্ঞানী ক. ৎসিওলকোভস্কির কাল্পনিক কাহিনী 'পৃথিবীর বাইরে' প্রকাশিত হয়। মফঃস্বল শহরের স্কুল-শিক্ষক তাঁর গ্রন্থে প্রথম মহাশূন্যে ভ্রমণ কেমন হবে তার একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থে বিবৃত ৎসিওলকোভস্কির বহু উল্লেখযোগ্য চিন্তাই আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে অন্য একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হল — এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কিভাবে আন্তর্জাতিকতার বিশাল শক্তিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই তাঁর কাল্পনিক নভযানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের স্থান হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে ছিলেন সুপণ্ডিত। আর সবাই মিলে তাঁরা ছিলেন এক বন্ধুসুলভ কুদল। অবশেষে এই স্বপ্নটিরও বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার দিনও সমাগত।

১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে (যারা একসাথে শান্তির উদ্দেশ্যে মহাশূন্যে গবেষণা ও ব্যবহারের কাজ চালিয়ে আসছে) মানুষ-চালিত নভযান ও স্টেশনগুলির উড্ডয়নে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই সব উড্ডয়ন সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। ১৯৭৬ সালেই চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড ও জার্মান গণপ্রজাতন্ত্র থেকে ভবিষ্যৎ নভচারীদের প্রথম দলটি সোভিয়েত নভচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে পৌঁছায়। এই ভাবেই বন্ধুসুলভ দেশগুলির যৌথ মহাশূন্যে গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

আজ বহুদিন ধরেই নটি সমাজতান্ত্রিক দেশ 'ইন্টারকস্‌মস্‌' কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করছে। তারা শুধুমাত্র যে এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছে তা নয়, তারা এই কর্মসূচীর ফলে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক ফলসমূহকে কাজে লাগাচ্ছে। এই সহযোগীতার বিশালতাকে অনুভব করার জন্য উক্ত কর্মসূচীর মূল দিকসমূহের নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট।

বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চেকোশ্লাভাকিয়াতে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে 'ইন্টারকস্‌মস্‌' সিরিজের বিশটিরও বেশী উপগ্রহ এবং প্রায় পনেরটি হাই-অল্‌টিচ্যুড রকেট সজ্জিত করা হয়। উক্ত দেশসমূহে নির্মিত যন্ত্রপাতি সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ 'কস্‌মস্‌', 'মিতিওর', স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'প্রাগনোজ', নভযান 'সায়ুজ'-এ স্থাপন করা হয়। সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তৈরী, দূরবর্তী বেতার ও টেলিফোন যোগাযোগ সম্পন্ন ও টি. ভি. অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তাছাড়া সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্য থেকে উক্ত দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান চালান হয়।

এগ্রলি হল সমাজতান্ত্রিক দেশসম্হের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চমানের পরিচায়ক। তবে মহাশূন্যে গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যের চরম নিদর্শন হল মানুষ-চালিত নভযানের উড্ডয়ন। ১৯৭৮ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৮ সালের মে মাস পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে সবকটি মৈত্রীসুলভ দেশের নাগরিকেরা মহাশূন্যে উড্ডয়নে অংশ নিয়েছে। নভযান 'সায়ুজ' এবং কক্ষপথ-স্টেশন 'সাল্যুত-৬'-এ সোভিয়েত নভশ্চারীদের সাথে মহাশূন্যে উড্ডয়নে অংশগ্রহণ করেছেন: চেকোশ্লোভাকিয়ার ভ. রেমেক, পোল্যাণ্ডের ম. গেরমাশেভ্স্কি, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের জ. ইয়েন, বুলগেরিয়ার গ. ইভানভ, হাঙ্গেরীর ব. ফারকাশ, ভিয়েতনামের ফাম তুয়ান, কিউবার আ. মেনদেস, মঙ্গোলিয়ার জ. গুরাগচা এবং রোমানিয়ার দ. প্রনারিউ। প্রতিটি উড্ডয়নের স্থায়ীত্ব ছিল এক সপ্তাহের একটু বেশী। আন্তর্জাতিক নভশ্চারীদল 'সাল্যুৎ-৬' স্টেশনে (যেখানে ইতিমধ্যেই সোভিয়েত নভশ্চারীদের একটি মূল দল কর্মরত) এসে সোভিয়েত নভশ্চারীদের সাথে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতেন।

কক্ষপথ-স্টেশনকে প্রায়ই মহাশূন্যস্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার বলা হয়ে থাকে। তবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই নামকরণটি খুব একটা সঠিক নয়। এমন কোন গবেষণাগারের কল্পনা করা কঠিন যেখানে বিজ্ঞানীরা একই সাথে জ্যোতিষ-পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা, আবহাওয়া ও প্রযুক্তিবিদ্যায় গবেষণা চালাচ্ছেন। আমাদের জানামতে এত বিশাল বৈজ্ঞানিক কাজ সুসম্পন্ন করা কোন ইন্সিটিটিউটের সাধ্যাতীত, তবে উঁচুমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে এতগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণা একসাথে চলতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য রয়েছেন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞ। আর আন্তর্জাতিক নভশ্চারীদলের সদস্যদের একই সাথে বিভিন্ন

পেশায় (অনেক ক্ষেত্রে এই পেশাগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ) দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়েছে।

কক্ষপথ-স্টেশনের অতিথিরা তাদের সময়ের এক বিরাট অংশ ব্যয় করেন পৃথিবী এবং মূলত আপন আপন দেশের ভূ-পরিধি অধ্যয়নে। এসব দেশের স্বতন্ত্র ভৌগলিক, ভূ-তাত্ত্বিক, আবহাওয়াগত এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে গবেষণার কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যৌথ সোভিয়েত-ভিয়েতনাম নভচারীদলের পর্যবেক্ষণের মূল আকর্ষণ ছিল মেকং নদীর ব-দ্বীপে সঞ্চরণ এবং প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি, কিউবার নভচারীসম্বলিত ক্রু মুক্তির দ্বীপ — কিউবার ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের (বিশেষত, পিনারদেল-রিও এলাকার) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, হাঙ্গেরীর জল-বিশেষজ্ঞরা তাদের নভচারীর কাছ থেকে বালাতোন হ্রদ ও দুনাই নদী সম্পর্কে নতুন তথ্য পান, আর জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের ভূ-তত্ত্ববিদরা যৌথ উড্ডয়নের ফলে তাঁদের দেশের পাহাড়ী এলাকার গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

অবশ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নভচারীদলের জন্য মহাশূন্য থেকে পৃথিবী সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয় তার মধ্যে অনেক মিলও ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বায়ুমন্ডলের দূষিতকরণ, আবহাওয়া সংক্রান্ত জটিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, বন এবং আবাদযোগ্য কৃষিভূমির অবস্থা, ভূ-গঠনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ছিল সকল নভচারীদলের গবেষণার বস্তু। এখানে আমরা ভূ-তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। বাস্তবত, সব আন্তর্জাতিক নভচারীদল নিজ নিজ দেশের ভূ-গঠনে তথাকথিত বলয়-গঠন বা রিং-স্ট্রাকচারের অনুসন্ধানকাজ চালান।

মহাশূন্যে উড্ডয়নের আগে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের এই

অস্বাভাবিক গঠনগুলির বেশীর ভাগই আমাদের অজানা ছিল। পরে মহাশূন্য থেকে প্রেরিত চিত্রে বিভিন্ন অদ্ভুত ধরনের গোলাকৃতি, অর্ধচাপ, বলয় ইত্যাদি দেখা যায়। এই সব অদ্ভুত বলয়গুলি সব মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তাদের কোন কোনটির আয়তনও বিশাল। সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার হল যে আগে কেন তাদের দেখা যায়নি। বিশালায়তন গঠনগুলিকে শুধুমাত্র দূর থেকে দেখা সম্ভব। অর এই রহস্যময় বলয়গুলির ব্যাস কখনো কখনো কয়েকশ কিলোমিটার।

ভূ-পৃষ্ঠে পরিচালিত গবেষণার ফলে কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। মহাশূন্য থেকে যেসব জায়গায় বৃত্তসদৃশ আকৃতি পরিলক্ষিত হয়, সেসব জায়গায় উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি। এই অদ্ভুত বলয়গুলি বন আর মরুভূমির ঘন স্তর পেরিয়ে জলরাশি আর পর্বতমালাগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত গঠনের সময় ভূত্বকের উপরিভাগে যে স্তরগুলির সৃষ্টি হয় তার বহু নীচে বলয়-গঠনগুলির অবস্থান।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে প্রায় পাঁচশ' কোটি বছর আগে পৃথিবী বড় আকারের চাঁদের মত দেখতে ছিল। আমাদের এই গ্রহে এবং তার উপগ্রহে ভূ-গর্ভ হতে ম্যাগমা অগ্নিস্রোত উপরে আসতো। শীতল হওয়ার সময় তারা বিশেষ ধরনের বিশালায়তন শিলাপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এই শিলাপিণ্ডের চারিপাশে অধিক ভেদ্যতার বলয়ের — গভীর বলয়াকৃতি ভাঙ্গনের — সৃষ্টি হয়। হয়ত এ জন্যই এই অঞ্চলগুলি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা এখন পর্যন্ত ঐ সব অঞ্চলো ভূত্বকের অভ্যন্তরে মৌলিক পদার্থের তেজষ্ক্রিয় বিভাজন চলছে, যার ফলে বিরাট পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। স্বভাবতই, এই তাপ বিগলিত বস্তুসমূহের ফাটল দিয়ে নির্গমন করছে। আর ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ যদি ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকে তাহলে

সেখানে ভূমিস্তর ও গাছপালা কম হবে এবং তা পার্শ্ববর্তী ভূমিস্তর ও গাছপালা থেকে ভিন্ন হবে। আপাতদৃষ্টিতে এরকম মনে হয়। আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই যে, মহাশূন্য থেকে এমনটি মনে হয় — আপাত দৃষ্টিতে। এই অনুমানকে প্রমাণ করে এমন তথ্য আজ আমাদের হাতে আছে। উদাহরণস্বরূপে, কতকগুলি রিং-স্ট্রাকচার উত্তাপ-বৈষম্যের সাথে জড়িত। আরও একটি তথ্য — পৃথিবীর রিং-স্ট্রাকচার ও চাঁদের সমুদ্রের মধ্যে সদৃশতা। পৃথিবীর কিছু সংখ্যক উপবৃত্তের উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত মাসকোনের কথা — চাঁদের গোলাকার সমুদ্রে দ্রব্যের ঘনীভবনের কথা উল্লেখযোগ্য।

বলয়াকৃতি ভাঙ্গন দুর্লভ ধাতুর অবস্থানের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-অভ্যন্তরে বিরাজমান অন্যান্য মূল্যবান খনিজের সন্ধানের ব্যাপারেও রিং-স্ট্রাকচারের ভূমিকা কম নয়। দেখা গেছে যে, হীরক ও ফসফরাস-আকরিক সম্বলিত শিলারাশি উপবৃত্তের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করে, আর অভ্রের অবস্থান উপবৃত্তের বহির্ভাগে। আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, কোকিং কয়লার কিছু স্তরের অবস্থান সেখানে, যেখানে বিভিন্ন রিং-স্ট্রাকচার পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে।

বেশ ক'টি সমাজতান্ত্রিক দেশে পূর্বে অপরিচিত রিং-স্ট্রাকচারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফলে ভূ-তত্ত্ববিদরা তাঁদের অনুসন্ধান কাজকে আরও সুগঠিত ও ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূ-তাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী সম্বন্ধে গবেষণার জন্য 'সাল্যুৎ' স্টেশনে যে আন্তর্জাতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় তার ফলে বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণের জন্য, মহাশূন্য থেকে প্রায় ষাট হাজার আলোকচিত্র, স্পেকটোগ্রাম, ডাইরী-লেখনী ইত্যাদি পেয়েছেন।

প্রতিটি আন্তর্জাতিক অভিযানের অনুষ্ঠানসূচীতে স্পেস-টেক্‌নোলজি সম্পর্কিত গবেষণা স্থান পেয়েছে। 'সাল্যুৎ-৬' স্টেশনের উড্ডয়নকালে বৈদ্যুতিক গলন-চুল্লী 'স্প্লাভ' ও 'ক্রিস্‌তাল'-এ বিভিন্ন উপাদানের তিনশ'রও বেশী নমুনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে পঞ্চাশটি নমুনা পাওয়া গেছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিজ্ঞানীদের সাথে যৌথভাবে উদ্ভূত পদ্ধতির সাহায্যে। আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন শেষে পৃথিবীতে নিম্নলিখিত জিনিসগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়: জ্যোতিষ-পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তাপ বিকিরণ নির্ণয়কারী যন্ত্রপাতির জন্য ওজনহীনতায় প্রাপ্ত স্ফটিক, ইলেকট্রোনিক্যাল অপটিক্‌স্ সহ মাইক্রোইলেকট্রনিক্‌স্ কৃৎকৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় উপপরিবাহী উপকরণ, ল্যাজার সৌরব্যাটারী এবং থার্মোকাপল তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য কেলাস। 'স্প্লাভ' ও 'ক্রিস্‌তাল' প্ল্যান্টে যে পরীক্ষা চালানো হয় তাতে কিউবার আগ্রহে সংযোজিত হয় আরও কিছু একস্‌পেরিমেন্ট। এই একস্‌পেরিমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল মহাশূন্যে জৈব সংযোজনের মনোক্রিস্‌ট্যাল উৎপন্ন করা। উল্লেখযোগ্য যে, কক্ষপথের প্রথম দিনগুলি হল নভচারীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এই সময়ে ওজনহীনতায় অভ্যস্ত হতে হয়, দেহকে পুনর্গঠিত হতে হয়। ফলে শুধুমাত্র অপ্রীতিকর অনুভূতির উদ্ভবই হয় না, কর্মক্ষমতাও বহুলাংশে হ্রাস পায়।

ক্ষণস্থায়ী হলেও একের পর এক আন্তর্জাতিক নভচারীদলের উড্ডয়নের ফলে চিকিৎসাবিদরা অনভ্যস্ত পরিবেশে শারীরিক অভিযোজনীয়তার এই চরম সময়কে যথাযথ অধ্যয়নের সুযোগ পান। একারণে যৌথ উড্ডয়নের সময় শরীরসংক্রান্ত গবেষণাগুলির কর্মসূচী পূর্বেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক চাহিদার পরিপূরণ ও সমন্বয় সাধন।

দেহকোষে অক্‌সিজেন সংপৃক্তি নিয়ে গবেষণার জন্য

চেকোশ্লাভাকীয় বিশেষজ্ঞরা একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। আরও কয়েকটি নভচারীদল এই প্রণালী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। পোল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও রুমানিয়ার চিকিৎসকরা কার্ডিও-ভাসকুলার সিস্টেমের কার্যপ্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নভচারীদের মানসিক কার্যক্ষমতা নিয়ে গবেষণা চালান জার্মান গণপ্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর বিশেষজ্ঞরা। কিউবায় নভচারীদের জন্য গতিসঞ্চালন ও আঙ্গুলের অনুভূতিশীলতার পরিবর্তনের মূল্যায়নের সমন্বয় সংক্রান্ত গবেষণার একটি বিশেষ প্রণালীর উদ্ভাবন করা হয়। ক্রীড়াবিদ ও রোগীদের জন্য বিশেষ ধরনের জুতা নির্মাণের ক্ষেত্রে কিউবার যে অভিজ্ঞতা আছে তাকেও কাজে লাগানো হয়। এ ধরনের জুতা পায়ের গোড়ালীতে চাপ প্রয়োগ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে চলার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এভাবে, এই বিশেষ জুতা ব্যবহারের ফলে উড্ডয়নকালে যে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় তার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আন্তর্জাতিক উড্ডয়নগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইজারের কার্যপ্রণালীও পর্যবেক্ষণ করা হয়। পোল্যান্ডের, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের এবং হাঙ্গেরীয় নভচারীসম্বলিত কু'দল স্বাদ, শ্রুতি, দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার পরিবর্তন ইত্যাদিও নির্ণয় করেন।

পৃথিবীপৃষ্ঠে যা কিছু জীবন্ত তারা প্রতিনিয়তই মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব অনুভব করে। এটা এতই স্বাভাবিক যে আমরা প্রাণিজগতের গঠন ও পরিবর্তনের উপর যে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব আছে — এ কথা ভুলে যাই। মাধ্যাকর্ষণ বলের ফলেই তো উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগত (মানুষ সহ) তাদের বর্তমান বাহ্যিক রূপ লাভ করেছে। মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণেই আমরা প্রাণিজগতকে আজ এমনটি দেখতে পাচ্ছি। স্বভাবতই পৃথিবীপৃষ্ঠে ও মহাশূন্যে প্রধান প্রধান বায়োলজীয় প্রণালীসমূহের মধ্যে মৌলিক তফাৎ আছে।

তবে এই পার্থক্যগুলি কি ধরনের—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে পরীক্ষা চালাতে হবে।

প্রতিটি মহাশূন্য অভিযানের অপরিহার্য অংশ ছিল বায়োলজীয় গবেষণা। আন্তর্জাতিক নভচারীসম্বলিত উড্ডয়নকালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'সাল্যুৎ-৬' স্টেশনে, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রে উদ্ভূত দেহকোষ, কিউবা থেকে নিয়ে আসা ইস্টের কোষ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় উৎপন্ন ক্লোরেলা, ভিয়েতনামের ফার্ন ও নীলাভ-সবুজ শ্যাওলার উপর গবেষণা চালান হয়।

১৯৮২ সালের ২৪শে জুন বৈকানুরের উৎক্ষেপণকেন্দ্র হতে সোভিয়েত ও ফরাসী নভচারীদের নিয়ে 'সায়ুজ-T-6' নভযানটি উৎক্ষিপ্ত হয়। মহাশূন্যে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল নতুন সোভিয়েত কক্ষপথ-স্টেশন 'সাল্যুৎ-৭'। এই স্টেশনে তখন কর্মরত ছিলেন সোভিয়েত নভচারী আ. বিরিয়োজভ এবং ভ. লেবেদেভ। সমাজতন্ত্রিক দেশের নভচারীদের মতই ফরাসী নভচারীও (পশ্চিম ইউরোপের প্রথম মহাশূন্যচারী) কক্ষপথে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এবারও নভচারীরা চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ফ্রান্সে তৈরী আলট্রাসোনিক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা নির্ণয় করেন, শিরা-উপশিরায় রক্তসঞ্চালনের গতি এবং তাদের জ্যামিতিক আকৃতি নিরূপন করেন। 'পোজা' নামের পরীক্ষাটিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং গতিসঞ্চারক সিস্টেমের পারস্পারিক ক্রিয়া, এবং অন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যমে—স্টেশনে দুটি নভচারীদলের যৌথ অবস্থানকালে মাইক্রোফ্লোরের গঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সোভিয়েত-ফরাসী নভচারীদল জ্যোতিষ-পদার্থবিদ্যায় বেশ কিছু গবেষণা সুসম্পন্ন করেন। দুটি বিশেষ ধরনের সুবেদী ক্যামেরার সাহায্যে তাঁরা আমাদের ছায়াপথের বাইরে অবস্থানকারী বহুদূরের

আলোর উৎসের আলোকরশ্মি সহ রাত্রির আকাশের অতি মৃদু আলোক বিকিরণ রেকর্ড করেন। বায়ুমণ্ডলের বাধার কারণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ অসম্ভব বলে উক্ত আলোকচিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

ফরাসী বিজ্ঞানীরা এই উড্ডয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতুসম্বলিত অ্যাম্পিয়ুল তৈরী করেন, যা মহাশূন্যে বৈদ্যুতিক চুল্লী 'ক্রিস্তাল'-এ উত্তপ্ত করা হয়। ওজনহীনতার পরিবেশে একটি ধাতুর অন্য ধাতুতে বিসারিত (diffuse) হওয়ার পদ্ধতিগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের ধাতুসমূহকে যা পৃথিবীপৃষ্ঠে পরস্পরের সাথে মেশে না, মহাশূন্যে একসাথে মিশিয়ে গলানো হয়।

সোভিয়েত-ফরাসী নভচারীরা বায়োলজীয় গবেষণাও চালান। এদের একটিতে মহাশূন্যে অণুজীবের উপর বিভিন্ন ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক্সের প্রতিক্রিয়া কি—তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই সব গবেষণা নভচারীদের জন্য ফলপ্রসূ ঔষধ প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। সাফল্যের সাথে মহাশূন্য অভিযান শেষে নভচারীদল পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বলেন: 'এই উড্ডয়নের ফলে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন তথ্য লাভ করেছেন, যা চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যা, স্পেশ-জিওলজি ও জ্যোতির্বিদ্যাকে নতুন সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক নভচারীদলের যে সমস্ত মহাশূন্য অভিযান সুসম্পন্ন হয়েছে বা আগামীতে যে সমস্ত অভিযান সুসম্পন্ন হবে—তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ফরাসী প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত বাণী প্রযোজ্য।

'সায়ুজ'-'অ্যাপলো' : মহাশূন্যে করমর্দন

যে কোন নভযানের অভিযাত্রীরা সংকটময় অবস্থার মুখোমুখি হতে পারেন। এই অবস্থায় তারা যাতে নিরুপায় হয়ে না পড়ে সেজন্য বিভিন্ন দেশের নভচারীদের কেবল বিপদগ্রস্ত সহকর্মীদের তৎক্ষণাৎ সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি থাকলেই চলবে না, এজন্য কারিগরি সম্ভাবনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম দুই মহাকাশবিজয়ী বৃহৎশক্তি এমন উপাদান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭২ সালের মে মাসে আমাদের দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে উল্লেখিত হয়েছে: মহাশূন্যে মানুষের উড্ডয়নকে বিপদমুক্ত ও ভবিষ্যতে যৌথ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ চালাবার লক্ষ্যে সোভিয়েত ও মার্কিন মানুষচালিত নভযানের পরস্পরের নিকটে আসা ও ডকিং-তন্ত্র উদ্ভাবনের কার্যপরিচালনায় উভয় দেশ চুক্তিবদ্ধ হল।

এধরনের প্রথম উড্ডয়নের জন্য মহাশূন্যে বহু অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী নভযানকে নির্বাচিত করা হয়। সায়ুজ নভযানটি মহাশূন্যে বহুবার ডকিং করেছে। এধরনের নভযানগুলি কক্ষবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা-স্টেশন 'সাল্যুট'-এ নভচারীদের নিয়ে যাওয়া-আসা করে। মহাশূন্যে মার্কিন নভযান আপলোও নতুন নয়।

মহাশূন্যে ডকিং-এর অভিজ্ঞতা সোভিয়েত ও মার্কিন কৃৎকৌশলীদের যথেষ্ট কাজে লেগেছে। কিন্তু মহাশূন্যে পরস্পর স্বাধীনভাবে নির্মিত নভযানগুলি কক্ষপথে অভিন্ন এক অবস্থায় পরিণত করার জন্য নির্মাণকৌশলে পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এদের উভয়কে উভয়ের সহায়ক করে নির্মাণ করতে হয়েছে। সোভিয়েত বৈমানিক-নভচারী ন. রুকাভিশনিকভ এই সহায়ক শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'যদি একটি

চাবি কোন তালা খুলতে সাহায্য করে তবে এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তারা পরস্পরের সহায়ক'। এই ধারণাকে আরো সম্প্রসারণ করে বলা যায় যে, তালা ও চাবি এই দুটি জিনিসের মধ্যে চাবি সবসময়ই 'সক্রিয়' ভূমিকাসীন। খোলা বা বন্ধ করার অপেক্ষায় থাকাই এক্ষেত্রে তালার কাজ। একইভাবে, যে কোন ডকিং-এর শরিক দুটি নভযানের একটি সক্রিয় এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো'র জন্য একই রকমের ডকিং কলাকৌশল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে দুটি নভযানের যে কোন একটি অপরটির নিকটবর্তী হয়ে তার সাথে ডকিং করার সামর্থ রাখে।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'সায়ুজ-অ্যাপলো' কর্মসূচির মার্কিন পরিচালককে সাংবাদিকরা নতুন কলাকৌশলের গঠন কেমন হবে ও তা কিভাবে কাজ করবে — এ সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলেন। ডক্টর লান্নির উত্তরটি ছিল খুব ছোট এবং তা অনুবাদ করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। তিনি আঙুল ফাঁক করে দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে দেন এবং তারপর দু'হাত এক-করে এমনভাবে চেপে ধরেন যেন এক হাতের আঙুলগুলিকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরে। বাস্তবিকপক্ষে, 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো'র নতুন ডকিং কলাকৌশল একজন মানুষের দুই হাতের মত একে অপরের সদৃশ।

ডকিং। নভচারী ও মহাশূন্যচারীদের এক নভযান থেকে অপর নভযানে যাওয়ার জন্য কেবল ডকিং যথেষ্ট কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডুবুরীদের কথা মনে করা প্রয়োজন। কেন অতল গভীরতা থেকে ধীরে ধীরে, খুব সতর্কতার সাথে উপরে ভেসে ওঠে? কারণ চাপ হঠাৎ করে কমে যাওয়ার (জলের নীচে সবসময়ই চাপ উপরিভাগের চেয়ে বেশী) ফলে রক্তে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন বুদ্‌বুদ্‌ আকারে রক্ত

থেকে নির্গত হয়। এমন গ্যাসীয় প্রতিবন্ধক রক্তনালীতে থ্রম্বসিস্ সৃষ্টি করে। এ থেকে মাংসপেশী ও রক্তনালীতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

সোভিয়েত নভযান থেকে মার্কিন নভযানে গেলে নভচারীদের অদৃষ্টে এমনটিই ঘটত। আসলে ব্যাপার হল এই যে, 'সায়ুজ'-এর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বস্তুত কোন পার্থক্যই নেই। সেখানকার বায়ুমণ্ডলের চাপ ও উপাদানগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতই। কিন্তু 'অ্যাপলো'র মডিউলগুলিতে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রায় তিনগুণ কম এবং সেখানকার বাতাস বিশুদ্ধ অক্সিজেনে গঠিত।

উভয় নভযানে একই ধরনের বায়ুমণ্ডল নির্বাচন করাই সহজতম পন্থা ছিল। কিন্তু এর ফলে কমপক্ষে একটি নভযানের বিভিন্ন প্রণালী ও গঠনের ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হত। এই জন্যই একটি আপসমূলক পথ বের করা হয়। যৌথ অভিযাত্রাকালে চাপমাত্রা বদলের বিকার এড়ানোর লক্ষ্যে 'সায়ুজে'র চাপমাত্রা কিছুটা কমানোর ও 'অ্যাপলোর' চাপমাত্রা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পৃথক উপাদানে গঠিত তাদের বায়ুমণ্ডল যাতে মিশে না যায় তার জন্য ডকিং-মডিউল নামক বিশেষ স্লুইজকক্ষের মাধ্যমে নভযানগুলির সংযুক্তি স্থির হয়। কোন নভচারী বা মহাশূন্যচারীকে এই মডিউলে প্রবেশ করে তার নভবাসগৃহের দরজা অবশ্যই বন্ধ করতে এবং অভ্যর্থনাকারী নভযানের বায়ুমণ্ডলের অনুরূপ পরিবেশ স্লুইজকক্ষে সৃষ্টি করতে হবে। তারপরই কেবল বুক ফুলিয়ে অতিথি হওয়া যাবে।

একে অপরকে ভালোভাবে বোঝার জন্য অতিথি ও গৃহস্বামীদের একই ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। মার্কিন মহাশূন্যচারীরা রুশ ভাষায় ও সোভিয়েত নভচারীরা ইংরেজীতে একে অপরের সাথে কথা
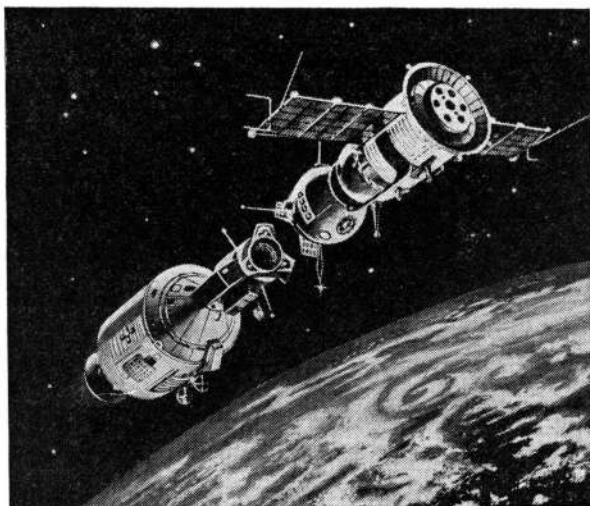
যৌথ উড্ডয়নকালে 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো' নভযান দুটি

বলবেন — উভয়পক্ষের জন্যই সমান সুবিধাজনক এমন একটি রকমফের বেছে নেওয়া হয়। আলেক্সেই লিওনভ ও ভালেরি কুবাসভের ইংরেজী উচ্চারণ খুব একটা যে ভাল হত তা নয়, আর টমাস স্টাফোর্ড, ভেন্স ব্রান্ড, ও ডোনাল্ড স্লেইটনের জন্য রুশ শব্দগুলি বেশ কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও মহাশূন্যচারী ও নভচারীরা একে অপরকে খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমীর প্রেসিডিয়ামে, 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো' নভযানের আগামী মহাশূন্য উড্ডয়নে উভয়পক্ষের প্রস্তুতি ও কর্মসূচির প্রস্তুতিপর্বের কাজের মূল্যায়ন সংক্রান্ত দলিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে যৌথ উড্ডয়নের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই মস্কো সময় বিকেল তিনটে ২০ মিনিটে বৈকানুর উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে সোভিয়েত নভযান 'সায়ুজ' যাত্রা শুরু করে। এর সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে কেনাভেরাল অন্তরীপ থেকে মার্কিন নভযান 'অ্যাপলো' রওয়ানা হল। পরবর্তী দু'দিন নভযানগুলি পৃথকভাবে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে এবং তারপর কক্ষপথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে।

এখন নভচারী ও মহাশূন্যচারীদের করা কতকগুলি যৌথ পরীক্ষার কথা বলব।

অনেক গলন্ত পদার্থ ঠান্ডা হয়ে কেলাস বা ক্রিষ্টালের আকার ধারণ করে। ঠান্ডা হওয়ার সময় উত্তপ্ত তরল পদার্থের অণুগুলির বিশৃঙ্খল বিচলন মন্দীভূত ও সুশৃঙ্খল হয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি অণু তার নির্ধারিত স্থান দখল করে ও সেখানেই জমাট বাঁধে। ফলে কেলাসবন্ধনের সুসংবদ্ধ কাঠামো গঠিত হয়।

নানা ধরনের শক্তির প্রভাবে এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এগুলির অন্যতম প্রধান কারণ। এর অনুপস্থিতিতে কেলাসবন্ধন প্রক্রিয়া কেমন হবে? পরীক্ষণীয় পদার্থটি মৌলিক হলে ভালই হয়। কিন্তু কল্পনা করুন যে, ভিন্ন দুটি ধাতুর সংকর পেতে হবে। এদের একটি আবার অপরটি থেকে হাল্কা এবং তার গলনাঙ্কও কম। এই অবস্থায় এদের উত্তপ্ত করলে দ্বিতীয় ধাতুটি গলতে শুরু করার আগেই প্রথম ধাতুটি গলে পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে। বিবিধ ধাতুর মধ্যে যতখুশি এমন জোড়া বের করা সম্ভব। কিন্তু এদের সমাহার অদ্বিতীয় যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণের অধিকারী হতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে সেমিকন্ডাক্টারের কথাই ধরা যাক। এগুলির উৎপাদনের সময় মূল উপাদানের সঙ্গে অল্প পরিমাণ খাদ মেশান হয়। যেমন, জার্মেনীয়ামের সঙ্গে সিলিকনের মিশ্রণ।
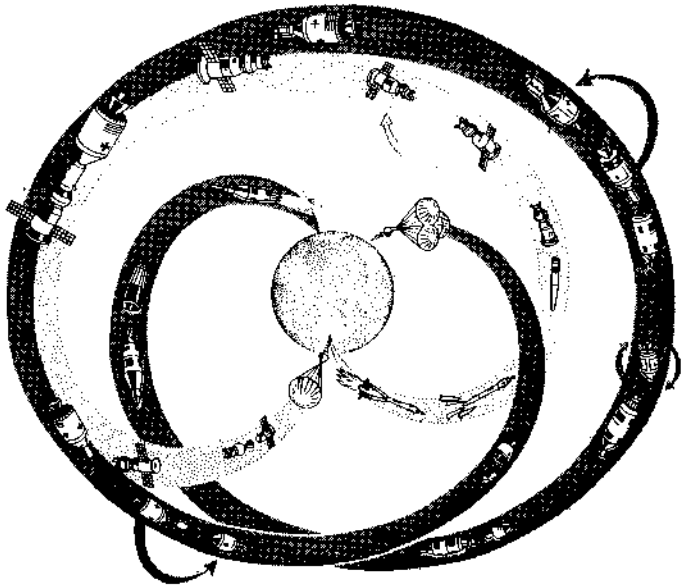
'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো' নভযানদ্বয়ের উড্ডয়নের নক্শা

টেলিভিশনের পর্দায় অনেকেই বহুবার মহাশূন্য থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখেছেন। ওজনহীন অবস্থায় মানুষ ও বস্তুর রূপ সম্ভবত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কী অনুভূতি নিয়ে নতুন নতুন যৌগিক ধাতুর উদ্ভাবক, ধাতুনিষ্কাশন বিশারদ ও প্রযুক্তিবিদরা এসব দেখেন — তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ওখানে কাজ করতে পারলে বেশ হত! এমন সম্ভাবনা তাদের জন্য এসেও ছিল।

মার্কিন নভযান 'অ্যাপলো' একটি ক্ষুদ্রচুল্লি নিয়ে কক্ষপথে যায়। বিভিন্ন ধাতুর নমুনাসহ ক্যাপসুল সোভিয়েত নভচারীদের সঙ্গে ছিল।

যেসব প্রক্রিয়া কারখানার প্রযুক্তিবিদের জন্য কষ্টসাধ্য অথবা পার্থিব পরিবেশে একেবারেই অসম্ভব তেমন কতগুলি প্রক্রিয়ার পুনরুৎপাদন মডেল এক একটি ক্যাপসুলে করা হয়েছিল। এই ক্যাপসুলগুলির একটি সিলিকন ও জার্মেনিয়াম, অপরটি হাল্কা এলুমিনিয়াম ও ভলফ্রেমের ভারীবল ও তৃতীয়টি এলুমিনায়ম চূর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

শেষোক্ত পরীক্ষাটি বলবেয়ারিং উৎপাদনকারী কারখানার কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে। জানা কথা যে, ওজনহীন পরিবেশে তরল পদার্থের ফোঁটা গোলাকার বলে পরিণত হবে। তৃতীয় ক্যাপসুলটি এই ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নির্ধারিত ছিল।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা গলনচুল্লির সাহায্যে পরীক্ষাচালনার প্রস্তাব দেন। আর তাদের সোভিয়েত সহকর্মীরা পরীক্ষা-কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। সোভিয়েত ও মার্কিন নভচারীরা সম্মিলিতভাবে এই পরীক্ষাকার্যে অংশ নিয়েছেন।

ফরমাইশমত সূর্যগ্রহণ। সৌরমুকুট কেবল পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে। উল্লেখ্য যে, পুরো বিশ শতকে সর্বমোট মাত্র ছয় ঘণ্টারও কম সময় সৌরমুকুট পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। গ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীকে একে অপরের সাথে আপেক্ষিকভাবে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। নভ-বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী এমন ঘটনা খুব একটা ঘন ঘন ঘটে না। প্রায় বিশ বছর ধরে মানুষ স্বনির্মিত গ্রহ ও চন্দ্র নিয়মিত মহাশূন্যে পাঠাচ্ছে। এগুলির সাহায্যে সূর্যগ্রহণ ঘটান সম্ভব নয় কি? বর্তমানে কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটানো সম্পূর্ণ বাস্তবসঙ্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে এসে পড়ে তখন আমরা ঐ জ্যোতিষ্কচক্র দেখতে পাই না। ফলত সূর্যগ্রহণ ঘটে। কৃত্রিম চন্দ্র, সূর্যকে ঢেকে ফেলার জন্য খুবই ছোট। কিন্তু আমরা জানি যে, দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে নৈকট্য তার আকার বর্ধিত করে। তাহলে সমস্যাটি সমাধানের উপায় রয়েছে। এজন্য পর্যবেক্ষণকারীকে কৃত্রিম চন্দ্রের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর নভযান সহজেই কাজটি করতে পারে।

এইভাবে 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো' উড্ডয়নের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীতে 'কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ' পরীক্ষা অন্তর্ভূক্ত হয়।

যৌথ উড্ডয়নের চতুর্থ দিনে নভচারী লিওনভ ও কুবাসভ অনেকবারের মত আবারও তাঁদের পেশা বদলান। তাঁরা এবারে জ্যোতির্বিদে পরিণত হন। আর তাঁদের নভযান 'সায়ুজ' পৃথিবীর ও 'অ্যাপলো' চন্দ্রের ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষাটি শুরু হবার আগে সংযুক্ত অবস্থায় নভযান দুটি সূর্য বরাবর সরল রেখায় অবস্থান গ্রহণ করে। এদের মধ্যে 'অ্যাপলো' অপর নভযানটির তুলনায় সূর্যের কাছে ছিল। তারপর নভযানগুলি পৃথক হয়ে যায়, তাদের ইঞ্জিন চালু করা হয় এবং তারা একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই অবস্থায় মার্কিন নভযানটি সূর্যকে ঢেকে রাখে ও 'সায়ুজচারীদের' জন্য সূর্যগ্রহণ সৃষ্টি করে।

'অ্যাপলো'র দিকে মুখ-ফিরিয়ে থাকা 'সায়ুজ' নভযানটির — ডকিং-তন্ত্রের কপাটের মধ্যস্থলে গোলাকার জানালা — ইলুমিনেটর ছিল। এখানে পরীক্ষা চলাকালে ক্যামেরার লেন্স চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। প্রোগ্রাম-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রব্যবস্থা ক্যামেরার বিভিন্ন স্পীডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৌর মুকুটের ছবি তোলে।

দুই নভযানের মধ্যকার দূরত্ব ২০০ মিটারের বেশি এবং কৃত্রিম চন্দ্র 'অ্যাপলো' সৌরচক্রের দ্বিগুণ আয়তন নেওয়ার পর নভযানগুলি

পুনরায় ডকিং-এর লক্ষ্যে একে অপরের কাছে আসতে শুরু করে। মানুষের সৃষ্ট প্রথম সূর্যগ্রহণ প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়।

কাজটি সহজ মনে হয়, তাইনা? কেবল আমাদের ভোলা উচিৎ নয় যে, সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর উপর দিয়ে দলগতভাবে উড়েচলা নভযানের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে। 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো', পরবর্তী পরীক্ষায় তাদের কেবল একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে ও আবার কাছে আসতে হয়নি, একত্রে মহাশূন্যে উচ্চমানগত ম্যানুভারও সম্পন্ন করতে হয়েছে।

পৃথিবীর ছাদে। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ও চালক সম্বলিত নভযান যেখানে ওড়ে সেই জায়গা আর সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রদের ঘিরে রাখা মহাকাশ সম্পূর্ণ এক নয়। এই উচ্চতায় পৃথিবীর উপস্থিতি অনুভূত হয়। সেখানে বায়ুমণ্ডলও রয়েছে। অবশ্য সেখানকার বাতাস ডানাযুক্ত উড্ডয়নক্ষম যন্ত্রকে (বিমান) ভেসে থাকতে সাহায্য করতে পারে না। ভূপৃষ্ঠের উপরে ২০০-২৫০ কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে বায়ুমণ্ডলের বিরল অণু-পরমাণুর অস্তিত্বই কেবল অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তবুও তারা কৃত্রিম চন্দ্রের তীব্রগতি রোধ করে। সমগ্র জীবজগৎকে ধ্বংসের ভয়াবহ আশঙ্কাযুক্ত সৌর ও মহাজাগতিক রশ্মির মুখোমুখি তারাই প্রথম হয়। এসব কারণেই ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি ও তার গুণাগুণ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহ ও কক্ষবর্তী পরীক্ষাগারগুলি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো'র নভচারীরা এ বিষয়ে গবেষণায় তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের পৃথিবীর বায়বীয় বহিরাবরণী গঠনকারী সকল উপাদানের মধ্যে, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরমাণুগুলি পাওয়া সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার। কারণ,

নির্বিশেষ একাকীত্ব তাদের খুবই অপছন্দ। এরা তাদের সদৃশ পরমাণুর সাথে অত্যন্ত দ্রুত মিলিত হয়। এর ফলে আমাদের সামনে আর পরমাণু থাকে না—তা অণুতে পরিণত হয়। এই সব মৌলিক পদার্থের মুক্ত পরমাণুর পরিমাণ না জেনে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন।

'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো' তাদের কক্ষপথের উচ্চতায় এ সকল অদৃশ্য কণার উপস্থিতির ঘনত্ব নির্ণয় করেছে। এই কাজে অদৃশ্য রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন নভযানে অতিবেগুনী রশ্মি সৃষ্টিকারী যন্ত্র ও সোভিয়েত নভযানে এই রশ্মি প্রতিফলিত করার কৌশল বসান হয়েছিল। এই পরীক্ষার সময় নভযানগুলি একটি অপরটির উপর দিয়ে যায়: 'সায়ুজ' কক্ষপথ বরাবর শায়িত অবস্থায় আর 'অ্যাপলো' তার উপরে 'মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে' ছিল। এই অবস্থায় তাদের মধ্যকার দূরত্ব ছিল কয়েকশ মিটার থেকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত।

'অ্যাপলো'র উৎস থেকে পাঠান রশ্মি সায়ুজে বসান বিশেষ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে মার্কিন নভযানে ফিরে যায়। এরকমভাবে রশ্মিগুলিকে প্রতিবারই তাদের নভযানগুলির মধ্যকার দূরত্বকে দু'বার অতিক্রম করতে হয়েছে। এইভাবে তারা নিজেদের পথে পড়া পরমাণুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরেছে।

এইমাত্র আমরা পৃথিবীতে জীবনরক্ষক হিসাবে বায়ুমণ্ডলের কথা বলেছি। কিন্তু পুরু বায়বীয় ঢাক্না দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা মহাশূন্যের উপর নির্ভরশীল থাকি। এই প্রভাব নানাভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সর্বাগ্রে তা জৈব প্রক্রিয়া ও ঘটনার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পর্যায়ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। নভচারী ও মহাশূন্যচারীরা বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করেছেন।

জীবনের ছন্দ। বসন্ত এসে গেছে। ক্ষেতে-খামারে সবুজের সমারোহ। মটরের ক্ষেতে সবুজ পাতা এসেছে। দিনের আলো পাতাগুলিকে সূর্যের দিকে টানতে থাকে। আর রাতের বেলায় তারা এলিয়ে পড়ে, যেন সারাদিনের কাজের পরে খুবই শ্রান্ত। পৃথিবীর ঘূর্ণনের তালে তাল মিলিয়ে প্রতিদিনই এমনই ঘটছে।

আমরা মাটি সহ একটি চারাগাছকে অন্ধকার ভাঁড়ারঘরে রাখি। উদ্ভিদটি এ অবস্থায়ও তার অভ্যাস পরিবর্তন করবে না। সম্পূর্ণ অন্ধকারেও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উত্তোলিত পত্র দ্বারা দ্বিপ্রহর চিহ্নিত করবে। আর মধ্যরাত্রে পাতাগুলি এলিয়ে পড়বে। এ হল তথাকথিত দৈনন্দিন ছন্দচক্রের একটি উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা সামুদ্রিক কম্বোজ জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি প্রতিদিনের নিয়মিত জোয়ার-ভাটা শুরু হওয়ার সময়গুলি দীর্ঘদিন মনে রাখে। এরই তালে তালমিলিয়ে, ওই সময় তাদের খোলসের ভাঁজ করা পাল্লা খুলে যায়। এ হল চান্দ্র ছন্দচক্র। এই ছন্দচক্র সমুদ্রোপকূলবাসী অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে দেখা যায়। এসব ছাড়াও বিভিন্ন রকমের বাৎসরিক ও মাসিক ঋতুচক্রের অস্তিত্ব জীব-জগতে দেখা যায়। পৃথিবীর সকল জীবই এসব চক্র মেনে চলে, এর মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করে।

কিন্তু মহাশূন্যে এর অন্যথা হয় কি? ওজনহীনতা, ওভারলোড, মহাজাগতিক রশ্মি, ইত্যাদি কি জৈব-ঘড়ির গোপন রহস্যপূর্ণ কৌশলকে নষ্ট করে ফেলে না? অথবা এর প্রভাবে তার চলনকালের কোন রকম পরিবর্তন ঘটে কি? দেহাঞ্চল গঠনকারী ছত্রাক নামক এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার জীবাণুকে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য বাছাই করা হয়। এরা সাধারণত মাটিতে বসবাস করে। কিন্তু 'সায়ুজ' ও 'অ্যাপলো' নভযানে জায়গা পেয়ে তারা

মহাশূন্যচারীর মর্যাদা লাভ করে। আদৌ খামখেয়ালী নয় বলে ছত্রাকটি গবেষণার কাজে অত্যন্ত উপযোগী। তার ছত্রাকাধারে কঠিন খাদ্যবস্তুর উপর স্পষ্ট ও দৃষ্টিগোচর বলয় গঠন করে। একদিনে একটি বলয় গড়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই চেপ্টাগোল পাত্রটিতে — যেখানে ছত্রাক বৃদ্ধি পাচ্ছে — এমন চিত্র দেখা যাবে যা গাছের কাটা-কান্ডে পরিলক্ষিত দাগ মনে করিয়ে দেয়। এই ছত্রাকের অন্যান্য অনেক গুণাগুণও রয়েছে যা তাকে মহাশূন্যে যাওয়ার ছাড়পত্র পেতে সাহায্য করেছে। সে দিনের আলো ও রাতের আধারের পরিবর্তন খুব ভালভাবে মনে রাখতে পারে এবং কোন রকম বাধা না পেলে ঐ তাল মেনে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে।

বাৎসরিক বলয়গুলি শুধু গাছের বয়স নির্ধারণেই বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে না, তাদের অতীত জীবন জানতেও সহায়ক হয়। যেমন প্রচন্ড গরম ও খরার বছরে গাছের বৃদ্ধি মন্দীভূত হয়, ঐ বছরের বলয়গুলি দেখতে অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। ছত্রাকটির বেলায়ও এমনটি ঘটে। ছত্রাকটির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার জীবন-ছন্দচক্র ও স্বাভাবিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে।

উড্ডয়ন কার্যক্রম চলার সময় নভচারী ও মহাকাশচারীরা নিয়মিত তাদের ছত্রাক-পাত্রের ছবি তুলতেন এবং ডকিং হওয়ার পর এর অংশবিশেষ তারা নিজেদের মধ্যে বদল করেছেন। ছবিগুলি থেকে ওজনহীন পরিবেশে ছত্রাকের জীবন কেমন কেটেছে তাই কেবল বোঝা যায় না, তাতে ছত্রাকাধারে মহাজাগতিক কণিকার আঘাতের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অতএব এই পরীক্ষা থেকে জীবদেহে মহাজাগতিক রশ্মি কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে — তা বুঝতে সাহায্য করবে।

এসম্পর্কে অজ্ঞতা মহাজাগতিক রশ্মি থেকে মানুষকে — যারা অদূর ভবিষ্যতে কোন এক সময় দীর্ঘস্থায়ী অন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন — রক্ষাকারী উপকরণাদি উদ্ভাবনের কাজে জটিলতার সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন দেশের নভযানের প্রথম যৌথ উড্ডয়নের কর্মসূচীর বর্ণনা শেষ করছি এই অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈমানিক-নভচারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আলেক্সি লিওনভের কথা দিয়ে; "আমাদের উড্ডয়নের প্রস্তুতি চলাকালে সোভিয়েত ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের নির্মিত কারিগরি ভিত্তি, 'সায়ুজ'-'অ্যাপলো' কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সকলের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া যা আগামী দিনে বৃহৎ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক নভপরীক্ষণমালার ভিত্তি সূচনায় এবং বিশ্বশান্তি সুদৃঢ়করণে সহায়তা দেবে"।

ভারতের মহাশূন্য অভিযান

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই প্রথম মহাশূন্যে গবেষণা শুরু করে। মহাশূন্য অভিযানের যুগ শুরু হওয়ার পর পরই ভারতের নিজস্ব মহাশূন্য গবেষণার আরম্ভ। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠায়, ঠিক তখনই উত্তর ভারতের নৈনিতাল মানমন্দিরে উক্ত উপগ্রহটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য স্টেশন তৈরী করা হয়। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে মহাশূন্য গবেষণার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। 'উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক মহাশূন্যে গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, — ভারতের মহাশূন্য গবেষণার পথিকৃৎ ডা: বিক্রম সারাভাই লিখেছিলেন, — তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস — আমাদের

দেশে মানুষ ও সমাজের সেবায় অগ্রগামী প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা কারও চেয়ে পিছনে পড়ে থাকবো না।'

১৯৬২ সালে একদল বিশেষজ্ঞ রকেট উৎক্ষেপণের জন্য জায়গা নির্বাচন করেন। জায়গাটি ছিল ত্রিবান্দ্রাম শহরের দশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত থুম্বা গ্রাম। বর্তমানে থুম্বায় বেশ কিছু হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত উৎক্ষেপণ সমাহারটি পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে। গত বিশ বছরে ভারতে মহাশূন্য গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রথমদিকের নাতিবৃহৎ রকেটগুলির (যারা কয়েক কিলোমিটার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিল) স্থান আজ দখল করেছে চার-স্তরের ১৭ টন ওজনের কঠিন জ্বালানী দ্বারা চালিত রকেট, যা ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে 'রোহিনী' নামের ভারতের দুটি উপগ্রহকে কক্ষপথে পৌঁছে দিয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা মহাশূন্যে ভারী উপগ্রহ বহন করতে সক্ষম এমন ধরনের আরও শক্তিশালী রকেট নির্মাণের কথা চিন্তা করছেন।

ভারতের প্রথম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' কে ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হতে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। ভারতের মহাশূন্য গবেষণার প্রথম যানটির নামকরণ করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবানুসারে। এভাবে ভারতের জনগণ তাদের আপন জাতীয় নেতার — পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতশাস্ত্রবিদ — স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের সুযোগ পেল। আসলেই উপগ্রহটির নামকরণ যথার্থ হয়েছে। উপগ্রহের অভ্যন্তরে স্থাপিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলি জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে সার্থক গবেষণা চালিয়েছে। 'আর্যভট্ট'র পর 'ভাস্কর-১' ও 'ভাস্কর-২' নামক দুটি উপগ্রহ একই পথ পরিক্রমণ করে। এই উপগ্রহদুটি মহাশূন্য থেকে ভারতের সীমারেখার উপর গবেষণা চালিয়ে দেশের অভ্যন্তরের বহুসংখ্যক সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট কার্যাদি

সম্পন্ন করে। দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমী বৃষ্টির ফলে ভারত প্রায়ই ধ্বংসকারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'ভাস্কর'-এ টি.ভি. সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয় যাতে করে আগে থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হয় এবং এসব যন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বভাসের জন্য নির্ভুল তথ্য পাঠানো হয়। মহাশূন্য থেকে পাঠানো চিত্র (শুধুমাত্র 'ভাস্কর' পাঠিয়েছে প্রায় এক হাজার চিত্র) ভারতের ভূ-তত্ত্ববিদরা ব্যবহার করেছেন খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজে। এই চিত্রসমূহের উপর ভিত্তি করে তাদের ফসল সংক্রান্ত পূর্বাভাস তৈরী করে, বনরক্ষকরা তাদের বনসম্পদের উপর দৃষ্টি রাখে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সহযোগিতার ফলে ভারতে তরুণ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে একটি বেশ বড় দল গড়ে উঠেছে, যা সফলতার সাথে উপগ্রহ এবং উপগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ, উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ, কক্ষপথ থেকে পাঠানো তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেসিং-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যকার সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে উভয় দেশের মাটিতে দুদেশের প্রথম সারির মহাশূন্য-বিশেষজ্ঞদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে যৌথ গবেষণাকার্যের ফলাফল ও সম্ভাবনা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়।

ভারতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ শুধুমাত্র সুবিধাজনকই নয়, অধিকন্তু উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, এ ধরনের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত সুলভ। ১৯৮৩ সালে দিল্লী টি.ভি. কেন্দ্র সোভিয়েত উপগ্রহ 'রাদুগা'তে স্থাপিত রিট্রান্সমিশন যন্ত্রের সাহায্যে অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করে। উপগ্রহটি জিওস্টেশনারী কক্ষপথে অবস্থান করছে এবং পৃথিবীর সাথে তাল

মিলিয়ে আবর্তন করছে। ঐ একই বছরে বহুবার ব্যবহারের উপযোগী মার্কিন নভযান 'স্পেস্-শাট্ল' থেকে দেশের অভ্যন্তরে বেতার ও টেলিফোন যোগাযোগ এবং কৃষিঅঞ্চলে টি. ভি. অনুষ্ঠানের যৌথ রিসিভিং সুনিশ্চিত করার জন্য একটি উপগ্রহ নিক্ষেপ করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে মহাশূন্য গবেষণার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে, ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সচেষ্ট। ভারতের মহাশূন্য গবেষণা সংস্থার (যার কেন্দ্র বাঙ্গালোর শহরে অবস্থিত) সভাপতি অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাশূন্য গবেষণা ও মহাশূন্যকে ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন যে, মহাশূন্য-প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলির সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, ভারত অন্যান্য দেশের সাথে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে প্রস্তুত। আর এটা হল সে ধরনের অভিজ্ঞতা — যা একসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে বিনিময় করেছিল।

মহাশূন্য গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সহযোগীতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ও ভারতীয় নভচারীদের যৌথ মহাশূন্য অভিযানের প্রস্তুতি। প্রাক্তন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেঝনেভ তাঁর ভারতসফর কালে এ প্রস্তাব দেন। তাঁর এ প্রস্তাব কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হয় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানান। লোকসভায় বক্তৃতাদান কালে তিনি বলেন যে, 'ভারত বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ থেকে সরে থাকতে পারে না। এ কারণেই আমরা সোভিয়েত প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করছি। এই সহযোগীতার ফলে আমাদের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের

পরিধি বৃদ্ধি পাবে, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর সরকারী মৈত্রী সফরের প্রাক্কালে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন যে, প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীদের মধ্য হতে নির্বাচিত দুজন ভারতীয় সামরিক বৈমানিক ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত নক্ষত্রনগরীর ইউরি গাগারিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছেন এবং সেখানে তাঁরা যৌথ মহাশূন্য অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছেন।

— আমি যদি নির্বাচিত না হতাম, তাহলে আমার খুবই খারাপ লাগত, — নক্ষত্রনগরীতে ভারতীয় ও সোভিয়েত সাংবাদিকদের বললেন স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মা। তিনি তার বন্ধু ভারতীয় বিমান বাহিনীর উয়িং কমান্ডার রবিশ মালহোত্রার মতই সানন্দে প্রশ্নের উত্তর দেন।

তাঁদের উভয়েরই জন্ম পাঞ্জাবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন শহরে। ৪৫ বছর বয়স্ক রাকেশ শর্মার বাবা-মা বাস করতেন পাতিয়ালা শহরে, আর ৩৯ বছর বয়স্ক রবিশ মালহোত্রা লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে শর্মার পিতা-মাতা হায়দ্রাবাদে বসবাস করেন, আর মালহোত্রার মা — কলকাতায়। তাঁরা উভয়েই কারাক্‌ভাসলে অবস্থিত জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমিতে পড়াশুনা করেন, আর তার আগে শর্মা হায়দ্রাবাদের নিজামী কলেজ ও মালহোত্রা কল্‌কাতায় লেখাপড়া শেষ করেন।

মালহোত্রা এবং শর্মা — উভয়েই টেস্ট পাইলট। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বিমানে উড্ডয়ন করেছেন — প্রথম জন — ৩৪০০ ঘণ্টা, আর দ্বিতীয় জন — ১৬০০ ঘণ্টা। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় নভচারীদ্বয় উড্ডয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

যৌথ মহাশূন্যে অভিযানের জন্য ভারতীয় নভচারীদের

'সায়ুজ-T' সিমুলেটরের কেবিনে মালহোত্রা তার সহকর্মীর সঙ্গে

প্রস্তুতিপর্বকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা রুশ ভাষা শেখেন, স্পেস্-নেভিগেশন, চিকিৎসাবিদ্যা এবং জীববিদ্যার মৌলিক প্রত্যয়সমূহের সাথে পরিচিত হন, নভমণ্ডল এবং নভযান পরিচালনার ব্যবস্থাদির অধ্যয়নের কোর্স শেষ করেন। সাথে সাথে তারা গবেষণাগার-বিমানে ট্রেনিং-ফ্লাইটে (শিক্ষামূলক উড্ডয়নে) অংশ নেন। এই টেনিং-ফ্লাইটের সময় তাঁরা কিভাবে ওজনহীনতায় কাজ করতে হয় — তা শেখেন, বিশেষ ধরনের লিংক-ট্রেইনারে অনুশীলন নেন এবং ব্যায়াম চর্চার সাহায্যে শরীর পোক্ত করেন।

অল্প কিছুদিনের ছুটির (এ সময়ে ভারতীয় নভচারীরা দেশে গিয়েছিলেন) পর শুরু হয় প্রস্তুতি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই সময়ে উভয় ক্রু'দলের সব কজন সদস্যই ক্লাসে অংশ নিতে থাকেন। সোভিয়েত ও ভারতীয় নভচারীরা 'সায়ুজ-T' জাতীয় নভযানে

(যাতে তাঁরা মহাশূন্যে উড্ডয়ন করবেন) ট্রেনিং নেন, উড্ডয়ন-কর্মসূচী এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের পদ্ধতিসমূহ অধ্যয়ন করেন, দ্রুততার সাথে এবং সঠিকভাবে পরস্পরকে বুঝতে শেখেন।

ক্রু'র সাথে অতিথিদের কক্ষপথ গবেষণা-স্টেশনে অন্যান্য গ্রহের গঠনপ্রণালী সংক্রান্ত, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান এবং চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষা চালাতে হয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মহাজাগতিক উড্ডয়নের মাধ্যম (যেখানে ওজনহীনতার সাথে বায়ুশূন্যতা ও সৌর-শক্তি সংযুক্ত হয়েছে) মহাশূন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। মহাশূন্য অভিযানের এই অংশ মহাজাগতিক অনুসন্ধান নামে পরিচিত। সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও নভচারীরা মহাজাগতিক প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন। ১৯৬৯ সালে 'সায়ুজ-৬' নভযানের ক্রু'রা সর্বপ্রথম কক্ষপথে নভযান ঝালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরীক্ষাসমূহ মূলত চালানো হয় কক্ষপথ-স্টেশনে। সোভিয়েত-ভারত যৌথ ক্রু'দলেরও এই পরীক্ষা চালানোর কথা।

যদি বলা হয় যে, নভচারীর সবকিছু জানা উচিত — তাহলে অতিশয়োক্তি করা হবে। তবে একথা ঠিক যে, এ ধরনের আর একটি পেশা খুঁজে পাওয়া দুস্কর, যেখানে মানুষের এত সর্বমুখী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। যৌথ সোভিয়েত-ভারত ক্রুদলকে চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যাসহ অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে।

রেকর্ডকাল দীর্ঘ উড্ডয়নগুলি মহাজাগতিক চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে। তবে এখনও বহু প্রশ্ন আছে যাদের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কারণে যে কোন নতুন পদক্ষেপ, সে যত লঘুই হোক না কেন, তার গুরুত্ব যথেষ্ট। ভারতীয়

উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত — মালিশেভ, শর্মা ও স্ত্রিল্‌কোভ

ডাক্তার ও প্রকৌশলীরা কক্ষপথে হৃৎপিণ্ডের আচরণ গবেষণার জন্য একটি মৌলিক যন্ত্র নির্মাণ করেছেন, শরীরের ভারসাম্যতা নিয়ন্ত্রণকারী ভেস্টিবুলার প্রণালীর অব্যবস্থা বিভিন্ন পেশীর উপর মহাজাগতিক উড্ডয়নের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য যোগ-ব্যায়ামকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন।

এই যৌথ উড্ডয়নের প্রস্তুতিপর্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান সংক্রান্ত শিক্ষাকোর্স। নভচারীরা মাতৃভূমির বিশাল প্রান্তর পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকচিত্র গ্রহণ করতে শেখেন। যে কোন আলোকচিত্রের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন নির্ভর করে উক্ত চিত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুস্পষ্ট অংশসমূহের (ডীটেল) পরিমাণের উপর। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে আলোকচিত্রের বিশদতা বিবৃত করার ক্ষমতার উপর। আলোকচিত্রে যত বেশী

ডীটেল্‌ দেখা যাবে, ততই তার মান উন্নত বলে গণ্য হবে। তবে সবসময়ই এমনটি হয় না।

মহাশূন্যে থেকে প্রতিটি বৃক্ষকে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব নয় (যা সম্ভব হলে বনবিভাগের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই খুবই সন্তুষ্ট হতেন)। তবে মহাশূন্যে থেকে তোলা আলোকচিত্রে এমন অনেক কিছুই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। পশ্চিম ইউরোপ কিম্বা ভারতের আয়তনের সমতুল্য বিশাল এলাকাকে একটি মাত্র চিত্রে ধরে রেখেছে এমন আলোকচিত্রে অভিজ্ঞ চোখ নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের ভূ-গঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবে। বিশালাকার ভূতাত্ত্বিক বস্তুসমূহকে আড়ালকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডীটেলের অনুপস্থিতি এক্ষেত্রে সহায়তা করে। মহাজাগতিক উচ্চতার কারণে কোন এলাকার ভূ-গঠনের বিভিন্ন ডীটেলসমূহকে (কাছ থেকে দেখলে যাদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়) একতাবদ্ধ করা এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশকে গুণগত একটি নতুন পরিপূর্ণ চিত্রে একত্রিত করা সম্ভব হয়। এজন্য মহাশূন্যে থেকে তোলা চিত্রগুলিতে গ্রহের কঠিন আবরণের গভীর স্তরসমূহের গঠন দেখা যায় — যেন অপেক্ষাকৃত পরে স্তুপীকৃত পল্লবের ঘন পর্দার আড়াল থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পর্যবেক্ষক (নভচারী অথবা স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ) যতই উপরে উঠবে তার দৃষ্টি ততই গভীরে গিয়ে পৌঁছাবে।

এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। তবে এ কারণে অবশ্য ভূ-তত্ত্ববিদ্‌রা মহাজাগতিক 'এক্স-রে' কে ব্যবহারিক কাজে লাগানো থেকে বিরত হননি। তবে মহাশূন্যে থেকে সরাসরিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আধার খুঁজে পাওয়া সম্ভব — একথা ভাবা বোকামি হবে। এখানে আমরা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলতে চাইছি। মহাশূন্যে থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকতে পারে এমন ভূ-তাত্ত্বিক গঠন খুঁজে পাওয়া সম্ভব (উদাহরণস্বরূপ ভূত্বকের ভাঙ্গনের কথা বলা যেতে

পারে)। মহাশূন্যে থেকে প্রাপ্ত আলোকচিত্রের সাহায্যে ভূত্বকের গঠনপ্রণালী ভালভাবে বোঝা যায় এবং এর ফলস্বরূপ ভূত্বকে মানুষের প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। 'সাল্যুত' মহাশূন্য-স্টেশনগুলিতে পৃথিবীর পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হল সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মান বিশেষজ্ঞদের তৈরী এবং জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের 'কার্ল সিয়েস ইয়েনা' নামক গণপ্রতিষ্ঠানে নির্মিত ম্যাল্টিজোনাল ক্যামেরা — MKF-6M। অবশ্য, প্রায় দু'শ কিলোগ্রাম ওজনের এই যন্ত্রটিকে ক্যামেরা বলা যেতে পারে শুধুমাত্র বিশেষ শর্তে। আসলে এটা হল দু'টি লেন্স সম্বলিত জটিল যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্বলিত একটি বেশ জটিল সিস্টেম।

অন্য যন্ত্রটি হল সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত কার্টোগ্রাফিক ক্যামেরা — KATA-140। এই ক্যামেরায় তোলা প্রতিটি চিত্রই পৃথিবীপৃষ্ঠের কয়েকশ' কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাকে আবৃত করে এবং আলোকচিত্রে মাত্র দশ মিটার (বা এর কাছাকাছি) মাপের ডীটেলসমূহ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

অবশ্য, কক্ষপথ-স্টেশন থেকে যে-সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করা হবে তা ভারতের ভূখণ্ডের প্রথম মহাজাগতিক আলোকচিত্র নয়। এখানে কৃত্রিম উপগ্রহ 'ভাস্কর'-এর কথা (যা দীর্ঘসময় ধরে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছে) স্মরণ করা যেতে পারে। তবে উক্ত আলোকচিত্রগুলি গ্রহণ করেছিল স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা, আর 'সাল্যুৎ' নভযানে ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে থাকবেন নভচারীরা। এ দু'টোর মাঝে তফাৎ আকাশ-পাতাল। মহাশূন্যে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলার আগে নভচারীরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে চাক্ষুষভাবে দৃশ্যপট অবলোকন করেন, পছন্দকৃত এলাকার বিভিন্ন দৃশ্যাবলি চিহ্নিত করেন, কি পরিমাণ আলোতে ছবি তোলা উচিৎ হবে — তাও নির্ণয় করতে

পারেন এবং কোন্ ক্যামেরা ও রীল ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে — তাও স্থির করতে পারেন। ভারতের ভূতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের নভচারীদের জন্য যানমধ্যস্থ কর্মসূচী নির্ণয়কালে ঠিক একথাটি স্মরণ রেখেছিলেন।

মানুষচালিত নভযানে, মহাশূন্য অভিযানে ভারতের অংশগ্রহণ মহাশূন্য বিজয়ের ইতিহাসে একটি গুণগত নতুন পদক্ষেপ। এর দ্বারা আরও একবার প্রমাণিত হয় যে, এশিয়ার এই মহান দেশটি বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে।

কক্ষপথে রোবট

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কৃত্রিম উপগ্রহ। সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ ঘুরে মোজাম্বিকের উপকূলবর্তী প্রণালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এমনসময়ে জাহাজের রেডিও-অপারেটর একটি শঙ্কাজনক রেডিও-কেব্‌ল পেল। দূরবর্তী মস্কোস্থ আবহাওয়া-কেন্দ্র থেকে সাবধানবাণী পাওয়া গেল: একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় জাহাজ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মস্কোর উপদেশ: মাদাগস্কারের পূর্বদিক হয়ে ঘুরে গেলে ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যদিকে, স্থানীয় (উপকূলবর্তী) আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছিল যে, দ্বীপের ঠিক পূর্বদিক থেকে তুফান আসতে পারে।

জাহাজটি পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করল এবং কয়েকদিন পর মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকটে মৃদু ঝড়ের মধ্য দিয়ে (কোন রকম জটিল বাধার সম্মুখীন না হয়ে) নিরাপদে নিজের পথে চলতে থাকল। ঠিক এই সময়ে আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল ক্রান্তীয় ঝড় চারিদিকে তোলপাড় করে তুলছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে: স্থানীয় আবহাওয়া-কেন্দ্রের তুলনায়, মস্কোস্থ আবহাওয়া-কেন্দ্র কেমন করে এত নিখুঁতভাবে আবহ-পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হল? এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিল পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ 'কস্‌মস্‌-১৮৪'। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ভারত মহাসাগরের যে ছবি তুলেছিল তা থেকে মস্কোস্থ আবহাওয়া-কেন্দ্রের কর্মীগণ জানতে পেরেছিলেন যে, মাদাগাস্কারের পূর্বদিক থেকে আসা তুফান, ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় অনেক কম বিপদজনক।

এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিই প্রথম মানুষকে দূর থেকে তার নিজস্ব গ্রহকে দেখতে সাহায্য করল। ১৯৬৬ সালের ২৫শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম আবহ-পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ 'কস্‌মস্‌-১২২' উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এর পর একবছর পার না হতেই মহাশূন্যে 'মিতিওর' নামের আবহ-পর্যবেক্ষণকারী সিস্টেম কাজ করতে শুরু করল যাতে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ অংশগ্রহণ করেছিল। সেই মুহূর্তে থেকে এই সিস্টেম অবিরত কাজ করে চলেছে এবং 'মিতিওর' শ্রেণীর নতুন নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে চলেছে। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৬০০ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে এবং আবহ-স্টেশনের কর্মীদিগকে অধিকতর নির্ভুলভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সাহায্য করে।

আবহ-পর্যবেক্ষণকারী এই উপগ্রহগুলির সমস্ত পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে দেড় ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আবহ-পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সমতল বিষুবরেখার সমতলের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। তাই প্রত্যেকটি আবর্তনেই এগুলি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের উপর দিয়ে ভ্রমণ করে। যেহেতু পৃথিবী তার অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করে সেই হেতু উপগ্রহগুলির আবর্তনের কক্ষপথ ক্রমশই পশ্চিম দিকে বেঁকে যায়।

মহাশূন্যের আবহ-স্টেশনগুলি কিভাবে কাজ করে? ছবিতে 'মিতিওর' শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহ দেখান হয়েছে। এর যন্ত্রপাতিগুলি যেন দীর্ঘসময় কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য পরিকল্পকগণ এতে বিদ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন সৌর-ব্যাটারীর মাধ্যমে। এই সৌর-ব্যাটারীর নিজস্ব দিকস্থাপক সিস্টেম আছে যা এমনভাবে কাজ করে যেন সৌর-ব্যাটারীর তল সবসময়ই সূর্যরশ্মির সঙ্গে উল্লম্ব অবস্থায় থাকে। আগেই বলা হয়েছে, এই অবস্থায় বিদ্যুৎ শক্তি সর্বোচ্চ হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ দুইটি সিলিন্ডারাকৃতির মডিউল দ্বারা গঠিত। ক্ষুদ্রতর মডিউলে আবহ-পর্যবেক্ষণের সমস্ত যন্ত্রপাতি থাকে, আর বৃহত্তর মডিউলে — কাজের এবং সাহায্যকারী সিস্টেম। উড্ডয়নকালে কৃত্রিম উপগ্রহের দিকস্থাপন করা থাকে। তার প্রধান অক্ষ সর্বদাই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নির্দেশিত। নভযানের দিকস্থাপন ও সুস্থিরতা সাধন করা হয় প্রধানত রি-এ্যাক্টিভ ইঞ্জিনের সাহায্যে আর মহাশূন্যে আবহ-পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহের নির্দিষ্ট অবস্থান বজায় রাখা হয় কতকগুলি ঘূর্ণায়মান ফ্লাই-হুইল-এর সাহায্যে। এই ফ্লাই-হুইলগুলির ঘূর্ণন বেগের পরিবর্তনের সাথে সাথে যন্ত্রনিয়ন্ত্রণকারী বলের উন্নতি সাধিত হয়। ফ্লাই-হুইলগুলি সৌর-ব্যাটারীর শক্তি দ্বারা গতিপ্রাপ্ত হয়, আবার প্রত্যেকটি ফ্লাই-হুইলই ইলেকট্রিক মোটরের শক্তিশালী রোটার হিসেবে কাজ করে। এভাবেই কৃত্রিম উপগ্রহের দিকস্থাপনকারী ও সুস্থিরতা রক্ষাকারী সিস্টেমের দীর্ঘকালীন কাজের নিশ্চয়তা বজায় রাখা হয়। কেননা, মহাকাশ — সৌরশক্তির অফুরন্ত ভান্ডার।

দুইটি টেলিভিশন-ক্যামেরার সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর আলোকিত অংশকে 'পর্যবেক্ষণ' করে। ক্যামেরা দু'টির লেন্স নিচের দিকে মুখ-করা থাকে এবং তাদের দিক পরস্পরের সঙ্গে কিঞ্চিত

কৌণিকভাবে অবস্থিত। তাই, লক্ষ্যস্থলের দৃশ্যমান অংশের ক্ষেত্রফল প্রায় দুইগুণ বেড়ে যায়। অবিরাম কর্মরত ক্যামেরা দু'টি ভূ-পৃষ্ঠের অথবা তার মেঘাচ্ছন্ন আবরণের ১০০০ কিলোমিটার অথবা তারও বেশি চওড়া অংশ দেখতে পায়। এই ক্যামেরাদ্বয় কর্তৃক তোলা ছবিগুলি প্রথমে ম্যাগনেটিক ফিল্মে ধরে রাখা হয় এবং পরে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত তথ্য সংগ্রহকারী কেন্দ্রগুলির উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সেগুলি পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর ছায়া থেকে সরে আসতেই তার উপর সূর্যকিরণ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন-যন্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়।

এই মহাজাগতিক আবহাওয়া-কেন্দ্র পৃথিবীর অন্ধকার অংশকেও পর্যবেক্ষণ করে। এই অবস্থায় টেলিভিশন-যন্ত্রের পরিবর্তে ইনফ্রা-রেড রশ্মিযুক্ত যন্ত্র কাজ করে। এই যন্ত্রের 'চোখ' দোলকের মত উড্ডয়ন-তলের সঙ্গে উল্লম্বভাবে দুলতে থাকে এবং এইভাবে, টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যমান এলাকার সমান এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ইনফ্রা-রেড-যন্ত্রের সংগ্রহকারী অংশগুলি ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকিরণের মাত্রা পরিমাপ করে। মেঘ সবসময়ই ভূ-পৃষ্ঠের চাইতে শীতল থাকে। তাই, মেঘপুঞ্জ দ্বারা গঠিত টাইফুন, সাইক্লোন, ইত্যাদি এই ধরনের ছবিতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। মেরুরাত্রে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে আবহ-পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহের শুধুমাত্র এই 'রাত্রির চক্ষু' দ্বারাই মানুষ মেঘ অবলোকন করতে পারে।

যোগাযোগের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ। বর্তমান টেলিফোন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অতিদ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে কেবল্-যোগাযোগ স্থাপন — এ তো অনেক সময়সাপেক্ষ, শ্রমসাধ্য, ব্যয়বহুল।

বেতার যন্ত্র সবসময় এক্ষেত্রে খুব একটা সাহায্য করতে পারে না। কয়েক দশক আগে বেতার কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল। কেন্দ্রগুলি দীর্ঘ ও মধ্যম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কাজ করত। পরবর্তীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যবহারও শুরু হয়। এখন সারা পৃথিবীতে বেতারকেন্দ্র এতবেশি যে কেবল দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কাজ করলে তাদের একে অপরের কাজে ব্যাঘাত ঘটান অবশ্যম্ভাবী। তাই বেতারকর্মীরা অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ব্যবহার করছেন।

এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলিতে বস্তুত যে কোন সঙ্কেতের নির্বিঘ্ন প্রেরণ সম্ভব। কিন্তু তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি রয়েছে: এগুলি আলোর মত সরল রৈখিক পথে বিস্তৃতি লাভ করে এবং আয়নমন্ডলে প্রায় প্রতিফলিত হয় না বললেই চলে। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এগুলিকে অতিক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ প্রতিফলক, বেতার-দর্পণের মত ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা শুরু করা হয়। এটা অবশ্য তেমন নতুন চিন্তা নয়। পৃথিবীর উপগ্রহ একাজে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে, একথা সত্য যে, তা ছিল প্রাকৃতিক, আদৌ কৃত্রিম উপগ্রহ নয়। ১৯৪৮ সালে চাঁদের সাহায্যে বেতার যোগাযোগ স্থাপনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে নৈশ জ্যোতিষ্কের (চন্দ্র) মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের জর্ডেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির ও সোভিয়েত ইউনিয়নের গোর্কী শহরের উপকণ্ঠস্থ মানমন্দিরের মধ্যে সফল বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত বেতার যোগাযোগ দিনের সীমাবদ্ধ সময়েই কেবল সম্ভব। এজন্য যোগাযোগ স্থাপনকারী উভয় স্থানেই একই সঙ্গে চাঁদ দেখা দেয়া প্রয়োজন।

বিশেষভাবে নির্বাচিত কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহের বেতার-দৃষ্টিগোচরমান এলাকায় অবস্থান করতে পারে। ১৯৬০ সালে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইকো-১' নামের যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়। গোলকাকৃতির এই কৃত্রিম উপগ্রহে পৃথিবী থেকে তার দিকে পাঠান প্রায় সকল বেতারতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু চন্দ্র পৃষ্ঠে গৃহীত শক্তির শতকরা সাত ভাগ মাত্র প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত শক্তি কোথায় বিচ্ছুরিত হবে তা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ উভয়ের কাছেই সমান। তাই পার্থিব গ্রাহক-কেন্দ্রের গ্রাহক-যন্ত্র কতৃক প্রেরিত বেতার-রশ্মির অতি নগণ্য অংশ কৃত্রিম উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে। এধরনের এবং অন্যান্য ত্রুটির কারণে বিজ্ঞানীরা এমন নিষ্ক্রিয় যোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৬৫ সালের ২৩শে এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নে 'মোলনিয়া-১' নামের প্রথম সোভিয়েত যোগাযোগ-কৃত্রিম উপগ্রহ — সক্রিয় পুনঃপ্রেরক যন্ত্র — উৎক্ষেপণ করা হয়। মস্কো ও ভ্লাদিভস্তকের মধ্যে অনেকমাস ব্যাপী টেলিফোন যোগাযোগ এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানের আদান-প্রদান তার মাধ্যমে চলে। ১৯৬৫ সালের ১৪ই অক্টোবর দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় দূরবর্তী উভয়পক্ষীয় টেলিভিশন এবং টেলিফোন-টেলিগ্রাম যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। তৃতীয় 'মোলনিয়া' কৃত্রিম উপগ্রহ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে টেলিভিশন অনুষ্ঠান আদন-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম 'মোলনিয়া' কক্ষপথে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে এই শ্রেণীভুক্ত অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মহাশূন্যে 'মোলনিয়া-২' এবং 'মোলনিয়া-৩' কাজ করছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে 'মোলনিয়া' কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করে। প্রেরককেন্দ্র সূক্ষ্মভাবে তাক-করা এ্যান্টেনার সাহায্যে অপ্রশস্ত বেতার-রশ্মি আকারে সংকেত কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠায়। সেখানকার গ্রাহক-প্রেরক এ্যান্টেনা কতৃক গৃহীত

সঙ্কেত তার গ্রাহক-প্রেরক যন্ত্রে পৌঁছায়। সেখানে সঙ্কেতের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহস্থ প্রেরক যন্ত্র তা পৃথিবীতে পাঠায়। পার্থিব গ্রাহককেন্দ্রে এই সঙ্কেত গ্রহণ করা হয়।

'মোলনিয়া' যোগাযোগ-কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি দেখুন। বায়ুনিরোধক নলাকৃতির খোলে অতিসংবেদনশীল গ্রাহক ও শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রপ্রণালী সম্বলিত পুনঃপ্রেরক যন্ত্রপাতি বসান থাকে। কক্ষপথ সংশোধক ইঞ্জিন, স্থিতি নির্ণায়ক প্রণালীর ক্ষুদ্র ইঞ্জিন, সৌর ব্যাটারি প্যানেল ইত্যাদিও কৃত্রিম উপগ্রহে সংযোজিত রয়েছে। সৌর ব্যাটারি উপগ্রহের সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহকারী অ্যাকুমুলেটারগুলিকে চার্জ করে। কৃত্রিম উপগ্রহটির খোলার বাইরের দিকে রেফ্রিজারেটর এবং গরম করার রেডিয়েটর-প্যানেলও লাগান থাকে। ফলত, কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়।

যদি সৌর ব্যাটারির প্যানেলকে সর্বক্ষণই সূর্যের দিকে 'তাকিয়ে' থাকতে হয় তবে অধিবৃত্তাকৃতি এ্যাণ্টিনার স্ব-উন্মোচক ছাতাগুলিকে সর্বদাই পৃথিবীর দিকে মুখ-করে থাকতে হবে। এই কারণেই পৃথিবী থেকে স্থিতিনির্ধারক যন্ত্রের পাঠান সঙ্কেত অনুযায়ী কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবীর দিকে এ্যান্টিনা তাক-করে আপনা আপনিই ঘুরতে পারে। ছাতাগুলি এমনভাবে বসান যে তা ঘুরানোর মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে এ্যান্টিনাকে সঠিকভাবে তাক-করা শেষ হয়। এই অবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থান স্থির করা হয়।

'অরবিটা' নামের অধিকদূরবর্তী টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকি পালন করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ মহাশূন্য যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বিশাল জালিকা (network) কেবল আমাদের দেশেই গঠিত হয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়া অথবা

ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি 'মোলনিয়া'র সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

'মোলনিয়া'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'রাদুগা' নামক যোগাযোগ-কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ শুরু হয়েছে। পূর্বসূরীর তুলনায় এ ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি বিষুববৃত্ত বরাবর বৃত্তীয় কক্ষপথে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির সাথে সমতালে পরিভ্রমণ করে। তাই পার্থিব নিরীক্ষণকারীর কাছে এগুলি স্থির বলে মনে হয়। এধরনের কক্ষপথকে স্থায়ী কক্ষপথ বলা হয়। 'রাদুগা' নামের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সাইবেরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু 'মোলনিয়া' যোগাযোগ উপগ্রহগুলির মত 'রাদুগা'র প্রেরিত সংকেত গ্রহণে বৃহৎ এ্যান্টিনা ও জটিল গ্রাহককেন্দ্র প্রয়োজন। অবশ্য স্থায়ী কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত নতুন যোগাযোগ-কৃত্রিম উপগ্রহ 'একরান' শক্তিশালী ও বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে সজ্জিত। পৃথিবীতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সরল ও সস্তা এ্যান্টিনাগুলি তার প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করতে পারে। ফলে যেখানে 'অরবিটা' কেন্দ্রের নির্মাণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুপযোগী সেই সব অধিক দূরবর্তী ছোট ছোট জনবসতিগুলিতে মস্কো থেকে প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান কৃত্রিম উপগ্রহ 'একরান'-এর সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

যোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি কেবল টেলিভিশন অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচারেই নয়, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বেতার যোগাযোগেও ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ — বাতিঘর। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমণকারীদের সংকটজনক পরিস্থিতিতে দিক নির্ণয়ে সাহায্য

করে আসছে। বর্তমানে নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের সাহায্যে স্বীয় অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কৌণিক দূরত্বমাপক যন্ত্র বা অন্যান্য যন্ত্র যে কোন নেভিগেটরেরই রয়েছে। কিন্তু ঘন কুয়াসা ও মেঘের আচ্ছাদনে তারা ঢাকা পড়লে, করণীয় কী হতে পারে? কিছুদিন আগে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা এই অবস্থায় আমাদের সাহায্য করবে। বেতার-রশ্মির সাহায্যে নভ-বস্তুসমূহের অবস্থান নির্ণয়ে মেঘাচ্ছাদন কোন বাধাই নয়। এ্যান্টিনা ব্যবহার করে নেভিগেটাররা মেঘভেদ করে আকাশ দেখতে পারেন। কিন্তু বেতার-সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্রগুলি এখনও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তাই কেবল এগুলির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরতা খুব নিরাপদ নয়। বিমান ও জাহাজের নেভিগেটারদের জন্য বিশেষভাবে উৎক্ষিপ্ত নেভিগেশন কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নির্ভরযোগ্য বাতিঘরের কাজ করে।

যে কোন প্যার্থিব বা নভ-বস্তু কেবল তখনই অবস্থান নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে যখন ভূ-পৃষ্ঠ বা আমাদের পৃথিবীর তুলনায় তার অবস্থান সঠিকভাবে জানা যায়। যে কোন মুহূর্তে ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট কোন বিন্দুর তুলনায় কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থান অত্যন্ত নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব। সেজন্য কেবল কৃত্রিম উপগ্রহের প্রাথমিক কক্ষপথের পরিমিতি এবং কক্ষপথ পরিক্রমণে নভ-মেকানিক্সের যেসব নিয়মাবলী মেনে চলে তা জানাই যথেষ্ট।

ভূ-পৃষ্ঠের যেসব এলাকায় নভ-দিক নির্দেশক কাজ করে সেখানকার উপর দিয়ে যাতে ঘন ঘন নেভিগেশন কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পরিক্রমণ করতে পারে, তার উপর তাদের সংখ্যা ও কক্ষপথ নির্ভর করে। কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থিত বেতার যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর বেতার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। জাহাজ ও বিমানের বেতার কেন্দ্রগুলি ওই প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করে তাদের কৌণিক অবস্থান, উচ্চতা, কৌণিক দূরত্ব বা উপগ্রহের সঙ্গে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করে। এখন
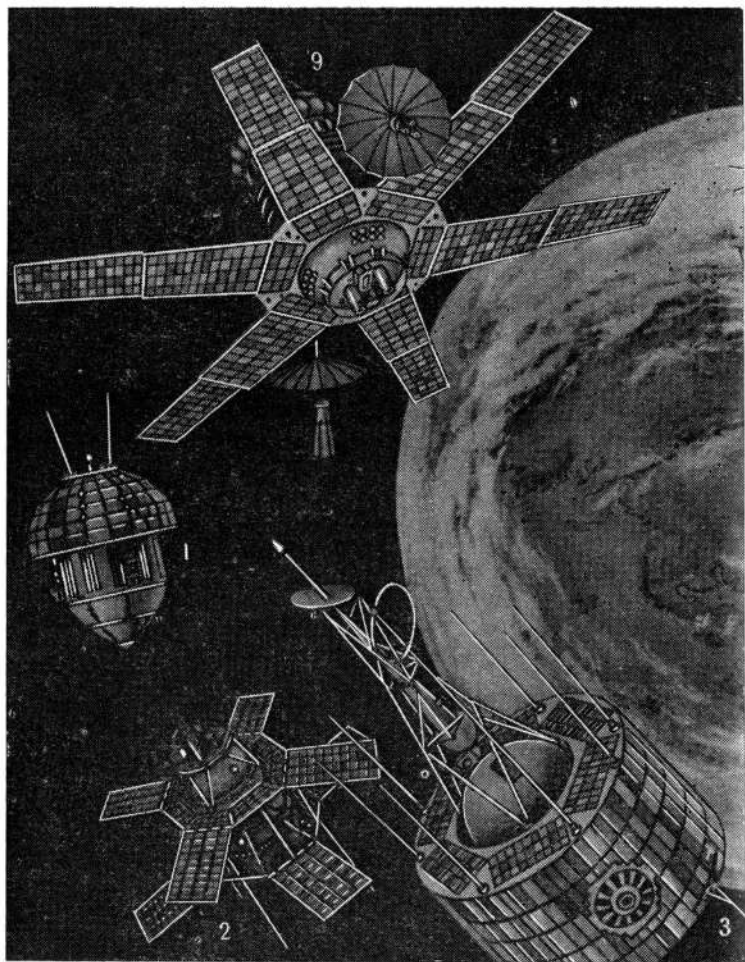
পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ

1,3 — 'কস্‌মস্‌' সিরিজের; 2 — ইণ্টারকস্‌মস্‌; 4 — তৃতীয় সোভিয়েত উপগ্রহ;
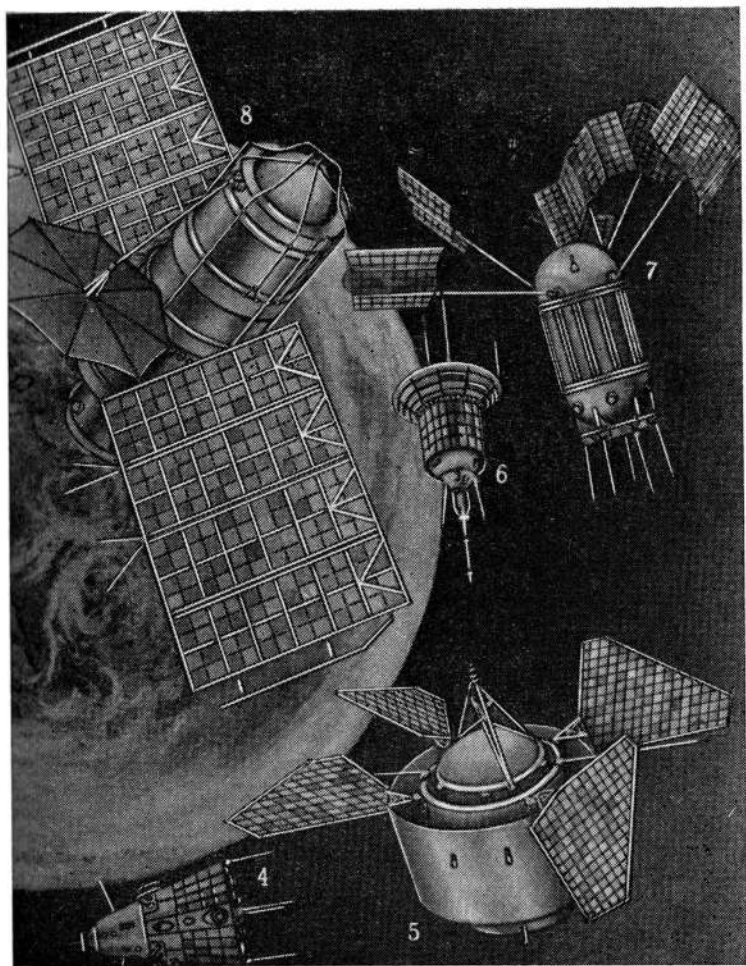
5 — প্রোটন-1; 6, 7 — ইলেকট্রন-2 এবং ইলেকট্রন-1; 8 — 'মিতিওর';
9 — 'মোলনিয়া'

পর্যবেক্ষকের তুলনায় কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থান ও বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার সময়ে পৃথিবীর তুলনায় তার (উপগ্রহের) অবস্থান জানা থাকলে পর্যবেক্ষকের অর্থাৎ জাহাজ বা বিমানের অবস্থান বের করা তেমন কঠিন নয়।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নিজেদের অবস্থান নিজেরাই জানিয়ে দেয়। এজন্য আগে থেকেই তা নির্ণয় করে বেতারের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহের স্মৃতিযন্ত্রে প্রবেশ করান হয়। 'নিজস্ব' এলাকার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কৃত্রিম উপগ্রহ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নির্দেশে স্মৃতিযন্ত্রে সঞ্চিত অবস্থান-সংক্রান্ত তথ্যাবলী পৃথিবীতে পাঠায়। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে গৃহীত তথ্যাবলী জাহাজ বা বিমানের কম্পিউটারে পৌঁছায়। কম্পিউটার নেভিগেটারকে তার ভৌগলিক অবস্থান জানায়।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও ব্যবহৃত হয়। ১৯৬২ সালের ১৬ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন 'কস্‌মস্‌' শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলির উৎক্ষেপণ শুরু করে। এই কর্মসূচীর নির্ধারক হল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি। এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক সমস্যার গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। 'কস্‌মস্‌' কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবী সংলগ্ন চৌম্বক-ক্ষেত্র ও ভূ-পৃষ্ঠের বিবিধ বিকিরণ পরিস্থিতি, সূর্যের রঞ্জন ও অতিবেগুনি রশ্মির বিচ্ছুরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পাদন করে।

এছাড়াও পরীক্ষক-কৃৎকৌশলীদের জন্য, 'কস্‌মস্‌' মহাশূন্যীয় পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। এর সাহায্যে মহাশূন্যবিজ্ঞানের বহু প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে: নভচারীদের বিপদজনক রশ্মির বিচ্ছুরণ থেকে রক্ষাকারী ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির উপর মহাশূন্যের প্রভাব, কক্ষপথে ডকিং, মহাশূন্যে নভচারীদের বেরিয়ে আসা, নভযানের পৃথিবীতে অবতরণ ইত্যাদি। আয়ন-ট্রান্সমিটার যুক্ত নতুন

অবস্থান নির্দেশক ব্যবস্থা এই জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে পরীক্ষিত হয়েছে।

বহুবার 'কস্‌মস্‌' শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহ সৌর প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। 'কস্‌মস্‌-১৬৬' ও 'কস্‌মস্‌-২৩০' প্রচন্ড অভিনিবেশ সহকারে আমাদের দিবাজ্যোতিষ্কটি পর্যবেক্ষণ করেছে। এদের স্বগোত্রীয় ৩৪৮ নং কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্য ও পৃথিবীর যোগাযোগ এবং বিশেষত, পার্থিব পরিবেশমন্ডলে সৌর সক্রিয়তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে।

আরো বেশকিছু সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় নভযান সূর্য পর্যবেক্ষণে অংশ নেয়। স্বয়ংক্রিয় কক্ষপথ-স্টেশন 'প্রগনোজ' এদের একটি। এসব কৃত্রিম উপগ্রহে বসান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমাদের নিকটবর্তী এই নক্ষত্রের গামা ও রঞ্জন রশ্মির বিচ্ছুরণ, সৌর প্লাজমাপ্রবাহ ও পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের উপর তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণায় অংশ নেয়। সৌর সক্রিয়তার সঠিক পূর্বাভাস দানে, কৃত্রিম উপগ্রহে এ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ করতে অনেক বিষয়ের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।

পৃথিবীর বিকিরণবলয় ও চৌম্বক-ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'ইলেক্ট্রন' কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি রকেট দুটি কৃত্রিম উপগ্রহকে বিভিন্ন কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করাতে একই সাথে বিকিরণবলয়ের অন্তস্থ ও বহিস্থ অঞ্চলগুলি অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে।

উচ্চ ও অত্যুচ্চ নভশক্তি সম্পন্ন কণিকা গবেষণায় প্রয়োজনীয় ভারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলি পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে, সোভিয়েত নভ-স্টেশন 'প্রোটন' পৌঁছে দেয়। কেবল এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ওজনই ১২ টনেরও বেশী।

এমন জটিল যন্ত্র কেবল শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু ছোটখাট কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পনা

প্রণয়ন ও নির্মাণ এখন ছাত্রদের পক্ষেও সম্ভব। একটু আগেই 'স্যালুট-7' কক্ষপথ-স্টেশন থেকে উৎক্ষেপিত ছাত্রদের নির্মিত 'ইসক্রা-2' কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরও আগে 'সত্যিকারের' কৃত্রিম উপগ্রহ 'কসমস-1045', বেতার যোগাযোগ ক্লাবের দু'টি 'রেডিও' কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে।

অপেশাদার বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় সহায়ক কৃত্রিম উপগ্রহ ইতিপূর্বে উৎক্ষেপিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মিত 'অসকার'গুলি হল এ ধরনেরই বেতার-পুনঃপ্রেরক যন্ত্র।

এই যন্ত্রগুলিকে এককভাবে নিক্ষেপ করা হয় এবং মূলত একটি মাত্র কেন্দ্রই এদের ব্যবহার করতে পারে। অপরদিকে কক্ষপথে প্রেরিত সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি একই সাথে তিনটি লক্ষ্যবস্তু সম্বলিত প্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রশ্ন হল দুটি বস্তু না হয়ে তিনটি কেন? এর কারণ হল এই যে, আসলে 'কসমস-1045' কক্ষপথে থাকা অবস্থায় তা থেকে 'রেডিও' পৃথক হয়।

এ ঘটনায় অপেশাদার বেতার যোগাযোগকারীদের উল্লাসিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে অবস্থান করার ফলে অপেশাদার বেতার প্রেরক ও গ্রাহক স্টেশনগুলির মধ্যকার সম্ভাব্য দূরত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলত, প্রত্যেক সৌখীন বেতার যন্ত্রীর সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নে ওই সময়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজার যৌথ ও ব্যক্তিগত অপেশাদার বেতারকেন্দ্র ছিল — একথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে যে ঘটনাটি কত বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য আনন্দ বয়ে এনেছে।

অপেশাদার বেতারকর্মী ও কারিগরি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা নিজেরাই 'রেডিও-1' এবং 'রেডিও-2' নির্মাণ করেন। ছাত্রদের গবেষণাগার ও কর্মশালার উৎপাদন সম্ভাবনাকে কখনই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনার সাথে তুলনা করা চলে না।

কিন্তু নভকারিগরি কৌশলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল শর্তাবলী পালন করে এমনভাবে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির নির্মাণ আগামীতে সৌখীন কারিগরি সৃজনশীলতার বিকাশে বৃহৎ সম্ভাবনার কথা বলে।

যাহোক, কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ — গোটা কাজের মাত্র অর্ধাংশ। তাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমনটি আগে বলা হয়েছে — বিশেষ পরিমাপক কেন্দ্রের প্রয়োজন। সৌখীন সংগঠনগুলি নিজেরাই এমন কেন্দ্রও নির্মাণ করে।

মস্কোর প্রশস্ত এক রাস্তার পাশে অতি সাধারণ আবাসিক দালান দেখা যায়। তার বহুতলা প্রতিবেশীদের সাথে তার একমাত্র পার্থক্য হল যে, বাড়ীটির ছাদে বিশেষ ধরনের এ্যাণ্টেনা স্থাপিত। অপেশাদারে বেতার কর্মীদের জন্য বরাদ্দ এ বাড়ীটির একটি ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় গ্রাহক-কমাণ্ড কেন্দ্র অবস্থিত। অনুরূপ অপর একটি কেন্দ্র আমাদের দেশের দূরতম পূর্বাঞ্চল প্রিমোর এলাকার আরসেনেভ শহরে স্থাপন করা হয়েছে।

'রেডিও' কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণকার্যের শরিক ছাত্ররা এই কাজটির নাম দিয়েছে পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রকল্প। এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা নয়। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে বিশেষ শিক্ষাকার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলত ছাত্ররা নভযোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও বেতার তরঙ্গের সাহায্যে মহাশূন্যের বৈশিষ্ট্যবলী অনুসন্ধান করতে পারে।

মহাশূন্য গবেষণায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ব্যাপক সাহায্য করে। 'ইণ্টার-কস্‌মস্‌' সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে নিয়মিতভাবে কক্ষপথে পেঁছায়। এই সব কৃত্রিম উপহে বসান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং উদ্ভয়ন কর্মসূচি বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা যৌথভাবে নির্ধারিত হয়। পূর্বলব্ধ

ফলাফলে, প্রত্যেক উড্ডয়নের সাথেই নবসংযোজন ঘটে। সন্ধানকৃত লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে নতুন তথ্য যোগ করে প্রত্যেক উড্ডয়নই পূর্বলব্ধ ফলাফলকে নবায়িত করে। আর বন্ধুত্বের নিদর্শন এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির এধরনের সংযোজন মোটেই কম নয়। যেমন, সূর্য ও তার মহাজাগতিক পরিবেশ পৃথিবীর বায়বীয় ও চৌম্বক আবরণী, মেরুদীপ্তি এবং আরো অনেক কিছুর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

'ইন্টার-কস্‌মস্‌-১৫' কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মহাশূন্যের যৌথগবেষণা ও ব্যবহারে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পূর্ববর্তী সকল কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে ওই নভযানের পার্থক্য এই যে, কক্ষবর্তী সর্বজনীন স্বয়ংক্রিয় স্টেশনটি ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নির্ধারিত। এই স্টেশনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি বসান যাবে। এটাই কেবল স্টেশনটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। আন্তর্জাতিক কর্মসূচির শরিক দেশগুলির গ্রাহক কেন্দ্রে সরাসরি বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রেরণের একক টেলিমিতি প্রণালী এই প্রথম বারের মত কোন কাক্ষিক স্টেশনে স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

যৌথ মহাশূন্য গবেষণা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক ফলাফল পাওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন দেশের গবেষকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। এসব কাজ পারস্পরিক সম্মানবোধ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিৎ, এতে তা চাক্ষুসরূপে পরিলক্ষিত হয়।

চন্দ্র মানুষের করায়ত্তে

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পরই চন্দ্রাভিযান শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে নৈশ জ্যোতিষ্কের (চন্দ্র) উদ্দেশ্যে সোভিয়েত

স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা-১' যাত্রা শুরু করে। এটাই প্রথম নভযান যা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলয় অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে মহাশূন্যে বেড়িয়ে আসে। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ছহাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই স্টেশনটি পৃথিবীর প্রভাব অতিক্রম করে বাইরে চলে যায় এবং সৌরজগতে প্রথম কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হয়।

তারপর এক বছর পার হবার আগেই নতুন সোভিয়েত নভযান চাঁদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এই স্টেশনটি চন্দ্রপৃষ্ঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতীক সম্বলিত পতাকা পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চাঁদে চৌম্বকক্ষেত্র নেই, এই তথ্য প্রমাণ করে দ্বিতীয় চন্দ্র-স্টেশনটি নভোবিজ্ঞানীয় পদ্ধতিতে চন্দ্র গবেষণার সূচনা করে।

দ্বিতীয় চন্দ্র-স্টেশনের উড্ডয়নের পর একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে তৃতীয়টি চাঁদের নিকটবর্তী হয়। এটি ছিল মহাশূন্যীয় আলোকচিত্র গ্রহণকারী। স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা-৩' চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে তার অদৃশ্য পৃষ্ঠের ছবি তুলে প্রথমবারের মত তা মানুষকে দেখায়।

প্রথম দিকের স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলিকে চন্দ্রের দিকে নির্দেশিত ট্রাজেকটরীতে সরাসরি পৃথিবী থেকে পাঠান হতো। উড্ডয়নকালে এই ট্রাজেকটরীর কোন প্রকার সংশোধন করা হত না। এজন্য উৎক্ষেপণ-সময় অতি সঠিকভাবে মেনে চলা, রকেটের প্রতিটি ধাপের কর্মসূচির খুঁটিনাটি যথাযথ সুনিশ্চিত করা এবং ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে স্টেশনের বেগের মান ও দিক হিসাব-নির্ধারিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, এসকল নির্ধারিত সূচকরাশির মান-এ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চাঁদের মত দূরের লক্ষ্যবস্তুতে উড্ডয়ন কার্যক্রমে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এছাড়াও পৃথিবী থেকে সরাসরি চাঁদে যাত্রায় জ্বালানীর খরচের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে লাভজনক হয় এমন ট্রাজেকটরীও নির্বাচন করতে হয়েছে।
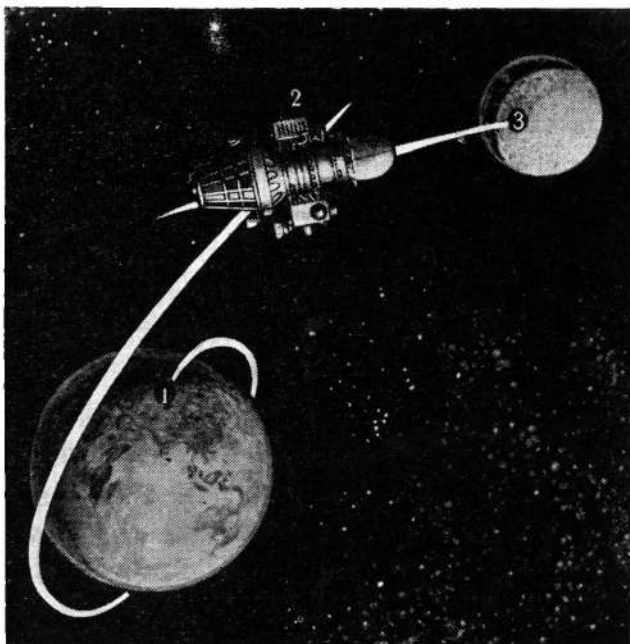
স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'লুনা-9'র উড্ডয়নের নকশা
1 — আরম্ভ; 2 — উড্ডয়ন পথের সংশোধন; 3 — চন্দ্রে অবতরণ

এজন্যই পরবর্তী সকল সোভিয়েত স্টেশন ভিন্ন নকশা অনুযায়ী চন্দ্রযাত্রা শুরু করেছে। প্রথমে একটি শক্তিশালী রকেট চান্দ্র স্টেশনকে রকেট-ব্লক, সহজে বলতে গেলে আরো একটি ছোট নভরকেট সহ পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছে দিত। এরপর প্রয়োজনীয় সময়ে, পরবর্তী যাত্রা শুরু হলে স্টেশনটি চন্দ্রাভিমুখী ট্রাজেকটরীতে উপনীত হত। এক্ষেত্রে ট্রাজেকটরীটি পূর্বে নির্ধারিত ট্রাজেকটরী

থেকে ভিন্নতর হলে সংশোধক ইঞ্জিন সাহায্যে এগিয়ে আসত। প্রথমদিকের উড্ডয়ন কার্যক্রমের সাফল্য চন্দ্রে নিরাপদ অবতরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রকল্পের বাস্তবতা ও সময়োচিততা প্রমাণ করে। পরবর্তী উড্ডয়ন কর্মসূচিতে নিরাপদ অবতরণের পদ্ধতি, কলাকৌশল ও নিয়ন্ত্রণ প্রণালী পরীক্ষা করে দেখা হয়।

১৯৬৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি — এই দিনে পার্থিব চন্দ্রযান কেবল চন্দ্রপৃষ্ঠেই পৌঁছায়নি, ধূলি-মহাসাগরে মোলায়েমভাবে 'চন্দ্রাবতরণ' করে। এটি ছিল সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় চন্দ্রযান 'লুনা-৯'।

এ স্টেশনটি চন্দ্র থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থাকা অবস্থায় তার স্থিতি এমনভাবে থাকে যে স্টেশনটির গতিমন্দনীকারক ইঞ্জিনের বহির্গমন নল চাঁদের কেন্দ্রাভিমুখী থাকে। প্রায় ৭৫ কিলোমিটার উচ্চতায় ইঞ্জিনটি চালু হয় এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে প্রচন্ড বেগে বের-হওয়া গ্যাসের ধারা স্টেশনটির পতনকে নিরাপদ করে। 'লুনা-৯' বিশেষভাবে নির্মিত অবতরণ-মডিউলকে — স্বয়ংক্রিয় চান্দ্র স্টেশন — চাঁদে নিয়ে গিয়েছিল। গতিরোধের সময় মডিউলটির চতুর্দিকের স্থিতিস্থাপক আবরণীটি গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়ে স্থিতিস্থাপক গোলকে পরিণত হয়। এ আবরণীটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে আঘাতের মাত্রা কমায় এবং অবতরণের পরে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলত চান্দ্র স্টেশনটি আবরণীমুক্ত হয়। এ অবস্থায় স্টেশনটি একই স্থানে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেয়ে অবশেষে স্থির হয়ে কাজ করার অবস্থায় আসে। তার কাঠামোর উপরিভাগ খুলে যায় এবং তা ফুলের পাঁপড়ির মত চারটি এ্যান্টিনায় পরিণত হয়। দন্ডাকৃতির এ্যান্টিনাগুলিও এখন সোজা হতে থাকে। এই অবস্থায় মনে হয় যেন প্রাণহীন চন্দ্রপৃষ্ঠে ভিনদেশী অদ্ভুত ফুল ফুটেছে।

অতঃপর মডিউলটিতে বসান টেলিভিশন ক্যামেরা মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি তোলা শুরু করে। পরদিন সারাবিশ্বের
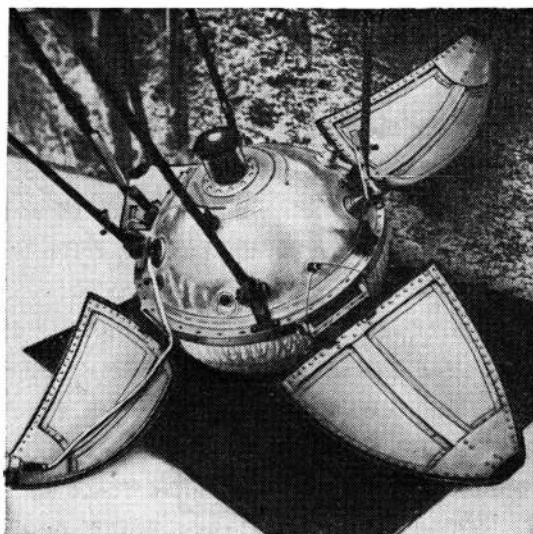
স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা-9'

সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম কলামে এই ছবি ছাপা হয়। ফলে নিজেরা চাঁদে যেতে পারলে যেমন ভাবে দেখতে পেতাম, মানুষের পক্ষে এই প্রথম ঠিক তেমনিভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠের দৃশ্যাবলী দেখা সম্ভব হয়।

'লুনা-৯' অবশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্ষুদ্র একটি অংশের বর্ণনা দিতে পেরেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে হলে কাছ থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর একাজ কেবল কৃত্রিম চান্দ্র উপগ্রহই করতে পারে। সোভিয়েত স্টেশন 'লুনা-১০' সর্বপ্রথম চন্দ্রের কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়। এই স্টেশনে স্থাপিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চাঁদের ব্যাপক গবেষণা চালায়। কিন্তু চান্দ্রশিলা সম্পর্কে
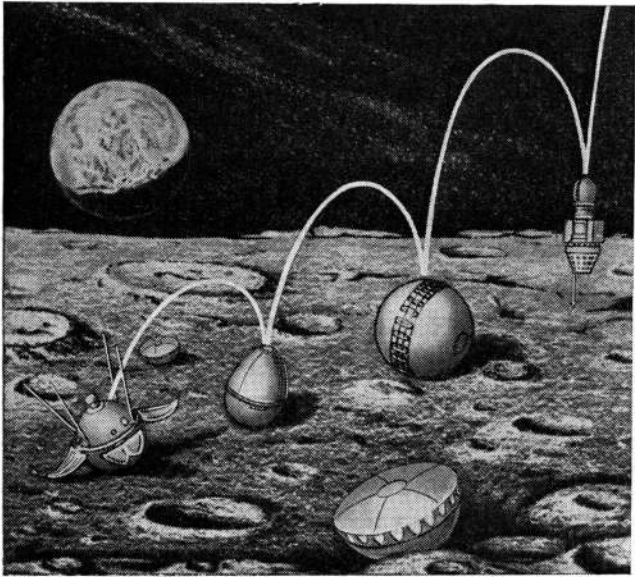
'লুনা-9' স্টেশনের অবতরণের নক্শা

বিশদ বিবরণ বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যেই সরাসরি পরিমাপের মাধ্যমেই কেবল পাওয়া সম্ভব।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে 'লুনা-১৩'র অবতরণ-মডিউলটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নিরাপদ ভাবে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। মডিউলটি থেকে পাঁপড়ি-এ্যান্টেনাগুলির পাশাপাশি দুটি দেড় মিটার লম্বা 'হাত' চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে আসে। এদের একটি ভূমিস্তর মাপক পেনিট্রমিটার ও অপরটি তেজষ্ক্রিয়তার ঘনত্ব মাপক যন্ত্র। পেনিট্রমিটার ভূমিস্তরের কাঠিন্য পরিমাপ করে। যন্ত্রটি ছোট একটি বারুদচালিত রকেট-ইঞ্জিনবিশিষ্ট ধাতব শঙ্কুর সাহায্যে ভূমিস্তরকে চাপ দিয়ে ভাঙ্গতে

থাকে। এই শঙ্কুটি প্রতিবারে কতখানি অনুপ্রবেশ করে তা বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত হয়ে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়।

অপর যন্ত্রটির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের মাটির ঘনত্ব তেজষ্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়েছে। ঘনত্বমাপক যন্ত্রে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বিচ্ছুরক এবং চার্জযুক্ত কণিকা পরিমাপক স্থাপিত ছিল। যন্ত্রটি থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির অংশবিশেষকে মাটি আত্মীকরণ করে। অপর অংশ মাটিতে একাধিক বার বিকীর্ণ হয়ে যন্ত্রটিতে ফিরে আসে এবং পরিমাপক যন্ত্রটি তার পরিমাণ নির্ণয় করে। ফিরে-আসা কণিকার সংখ্যা মাটির ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল।

'লুনা-১৩' যানের অভিযানের পর 'সার্ভেয়ার-৩' নামক মার্কিন চন্দ্রযানে বসান অতিক্ষুদ্র বা মিনিয়েচার এস্কাভ্যাটারের বাকেট পুনরায় চন্দ্রপৃষ্ঠের শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিক্ষুদ্র এই বাকেটটি চন্দ্রপৃষ্ঠে কেবল পরিখাই খনন করেনি, অল্প গভীরতা থেকে তার নিজের খনন করা মাটির দলাগুলিকে ভেঙ্গে চূর্ণও করেছে।

পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ও মার্কিন স্বয়ংক্রিয় যানগুলির চন্দ্রঅভিযান অব্যাহত থাকে। এই স্বয়ংক্রিয় যানগুলি চন্দ্রাবরণ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তথ্য আমাদের জানিয়েছে। নদীর তীরে পড়ে থাকা বালির অনুরূপ শিলা দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠিত — এ তথ্য আমরা এধরনের স্টেশন থেকেই পেয়েছি। এখন আর চাঁদের ধুলাকে ভয় করার কিছু নেই। আমরা জানি যে, চন্দ্রপৃষ্ঠ ভারী যানগুলির অবতরণের জন্য যথেষ্ট শক্ত। এটা আদৌ অতিশয়োক্তি নয় যে, এই স্বয়ংক্রিয় যানগুলিই মানুষের চন্দ্রযাত্রার পথপ্রদর্শক।

১৯৬৮ সালের শেষে মহাশূন্যচারী ফ. বোরম্যান, ড. লোভেল ও উ. এন্ডারস্ তাদের অভিযাত্রাকালে খুব কাছ থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ

পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। এর পরে পরেই আরো একটি চন্দ্রমুখী পরীক্ষামূলক অভিযাত্রায় মহাশূন্যচারী ট. স্টাফোর্ড, ড. ইয়ং ও ইউ. সেরনান অংশ নেন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে কেনাভেরাল অন্তরীপের মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে 'অ্যাপলো-১১' নভযান নিয়ে 'স্যাটার্ন-৫' রকেটটি যাত্রাশুরু করে। এই নভযানটিতে ছিলেন ন. আর্মস্ট্রং, ম. কলিন্স ও এ. অলড্রিন।

এই 'অ্যাপলো' নভযানটির তিনটি অংশ ছিল: ক্রু-কেবিন, কমান্ড-মডিউল ও চান্দ্রমডিউল। এই নভরেলগাড়ীর ইঞ্জিন হল কমান্ড মডিউলল। এই অংশে বেগ বৃদ্ধি ও হ্রাসকারী ইঞ্জিন স্থাপিত ছিল। চান্দ্রমডিউলটির কাজ হল মহাশূন্যচারীদের নিয়ে চাঁদে অবতরণ ও সেখান থেকে তাদের নিয়ে কক্ষপথে প্রত্যাবর্তন করা। মাকুর মত দেখতে, এমন চারটি পা মডিউলের কাঠামোটি ধরে রেখেছে। এই কাঠামোটি দেখতে অনেকটা মানুষের মাথার মত। তার সুড়ঙ্গপথটি মানুষের মুখ, তিনকোণা ইলুমিনেটার বা জানালা দুটি চোখের সাথে তুলনীয়। মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলি চান্দ্রমডিউলটিকে এভাবেই বর্ণনা করেছে।

চান্দ্রমডিউলটি চাঁদের নিকটবর্তী কক্ষপথে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ম্যানোভারের মাধ্যমে মহাশূন্যচারী ন. আর্মস্ট্রং ও আ. অলড্রিনকে নিয়ে মূল নভযান থেকে আলাদা হয়ে যায়। এ সময় তার উচ্চতাও ধীরেধীরে কমতে থাকে। এদিকে কলিন্সের পরিচালনায় 'অ্যাপলো-১১' চন্দ্রপ্রদক্ষিণ অব্যাহত রাখে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে নিরাপদে অবতরণের পর মহাশূন্যচারীরা চান্দ্রমডিউলটি থেকে বের হবার প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই ৫ টা ৫৬ মিনিটে নেইল আর্মস্ট্রং চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন। তারপর এডুইন অলড্রিন। তারা চাঁদে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চান্দ্রশিলার নমুনা সংগ্রহ করেন। কয়েক ঘণ্টা পরে চান্দ্রমডিউলটির

আরোহ-অংশটি অবতরণকারী অংশ থেকে আলাদা হয়ে চন্দ্রের চতুর্দিকের কক্ষপথে অবস্থান নেয় এবং মূল নভযানের সঙ্গে ডকিং করে। মহাশূন্যচারীরা চান্দ্রমডিউলের আরোহ-অংশ থেকে নভযানে প্রবেশ করার পর এই আরোহ-অংশটি যানটি থেকে পুনর্বার আলাদা হয় এবং মহাশূন্যে থেকে যায়। 'অ্যাপলো-১১' এপর্যায়ে চাঁদের নিকটবর্তী কক্ষপথ ত্যাগ করে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। নভযানের অবতরণ-মডিউলটি ২৪ জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরের জলে অবতরণ করে। এভাবে মানুষের প্রথম চন্দ্রঅভিযাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম চন্দ্রে অবতরণকারী মহাশূন্যচারীদের সুবিদিত পথ ধরে 'অ্যাপলো-১২' যাত্রা করে। মহাশূন্যচারী চ. কনরাড, র. গর্ডন ও আ. বীন আরো বেশ কিছু চন্দ্রশিলা পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

'অ্যাপলো-১৩' অভিযাত্রা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহাশূন্য অভিযাত্রা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পরিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। এই নভযানে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে উড্ডয়ন পরিচালকরা তার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। চন্দ্রে অবতরণের পরিবর্তে নভযানটির চালকরা চন্দ্র পরিক্রমণ করেন এবং অসীম সাহস ও ধৈর্যের সাথে পৃথিবীতে নিরাপদে নভযানটি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

পরবর্তীতে আরো চারটি 'অ্যাপলো' নভযানের চালকরা চন্দ্রে পদার্পণ করেন। শেষের দিকের অভিযাত্রাগুলিতে চন্দ্রচারীরা শুধু পায়ে হেঁটেই নয়, বিশেষভাবে নির্মিত বৈদ্যুতিক গাড়ী চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন। 'অ্যাপলো-১৭' অভিযাত্রার মাধ্যমে মনুষ্যবাহী নভযানের সাহায্যে চন্দ্র-গবেষণায় মার্কিন কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটেছে।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা-১৬' উৎক্ষিপ্ত হয়। তার পূর্বসূরীদের মত চন্দ্রযানটির আমাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহপৃষ্ঠে শুধু নিরাপদ অবতরণই নয়, অন্য কোন স্বয়ংক্রিয় যানের পক্ষে আগে যা সম্ভব হয়নি — পৃথিবীতে ফেরত
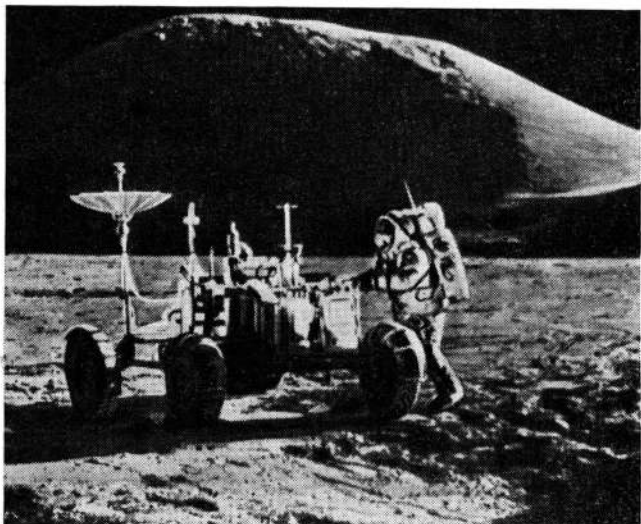
চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন নভচারী ইরভিন — লুনার ইলেকট্রোমোবাইলের পাশে দাঁড়িয়ে

আসার পরিকল্পনা — এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য চান্দ্রমডিউলটিতে অবতরণ ধাপের সঙ্গে বিশেষভাবে নির্মিত 'চন্দ্র-পৃথিবী' রকেট স্থাপন করা হয়েছিল।

বাইরে থেকে দেখলে এ রকেটটি মহাশূন্য অভিযানের শুরুতে নভচারীবাহী 'ভস্তক' নভযানের ক্ষুদ্র সংস্করণের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যাবর্তনকারী মডিউলটি উভয় ক্ষেত্রেই গোলকাকৃতি ছিল। একটিতে নভচারীর আসন আর অপরটিতে চান্দ্রশিলাবাহী আধার সন্নিবেশিত। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যাবর্তনকারী মডিউলে প্যারাসুট এবং অবতরণের পর নভযানটির অনুসন্ধান সহজসাধ্য করার জন্য বিশেষ ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থাও রয়েছে। 'ভস্তক'র মতই 'চন্দ্র-পৃথিবী' রকেটে

কমাণ্ড-মডিউলটি যন্ত্রপরিচালিত। চান্দ্রস্টেশনের অবতরণ ধাপটি 'চন্দ্র-পৃথিবী' রকেটের উৎক্ষেপণমঞ্চের কাজ করেছে।

এই চন্দ্রযানটির চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মূল্যবান মালামাল নিয়ে আসার কথা। এজন্যই তা মাটি খোঁড়া ও সংগ্রহ করার যন্ত্রপাতি সজ্জিত।

চান্দ্রস্টেশনটি উপগ্রহপৃষ্ঠে প্রাচুর্যসাগরে অবতরণ করে। পৃথিবী থেকে দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী গর্তকরার যন্ত্রপাতির — যা উড্ডয়নকালীন সময়ে প্রত্যাবর্তনকারী মডিউলের সঙ্গে আটকান ছিল — তালা খুলে যায় এবং বৈদ্যুতিক মোটর তা চন্দ্রপৃষ্ঠে নামিয়ে দেয়। খননযন্ত্রটি ঘূরন্ত অবস্থায় শিলার ভিতরে ঢুকে যায় এবং তাতে শিলা বোঝাই হয়। তারপর যন্ত্রটির দন্ডগুলি পুনরায় বিপরীত অনুক্রমে জটিল বিচলন সম্পন্ন করে। এরপর চান্দ্রশিলা সহ ঘূর্নক প্রত্যাবর্তনকারী মডিউলের আধারে প্রবিষ্ট হয়। পরবর্তী নির্দেশের ফলে খননযন্ত্রটি থেকে ঘূর্নক আলাদা হয়ে আধারে রয়ে যায়।

এখন নভযানটির ঘরে ফেরার পালা। রকেটের অবস্থার সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এবং পূর্বনির্ধারিত সময়েই যাত্রা শুরু হল। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া আলোর ঝলকে চিরদিনের মত চন্দ্রপৃষ্ঠে থেকে-যাওয়া অবতরণ ধাপটি আলোকিত হয়ে উঠল। 'চন্দ্র-পৃথিবী' রকেটের বেগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং তা তীরের মত পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে। এভাবে তিনদিন চলার পর প্রত্যাবর্তনকারী মডিউলটি রকেট থেকে আলাদা হয়ে পার্থিব বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল।

চান্দ্রশিলা এখন পৃথিবীতে পেঁছে গেছে। কয়েকদিন আগেও, যা কেবল যাদুর খেলা বলে মনে হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের আজ আর অবাক করতে পারে না। চাঁদের 'সমুদ্রপৃষ্ঠে' কি দিয়ে গঠিত তা জানার পর বিজ্ঞানীরা চাঁদের স্থলভাগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাই পরবর্তী নভ-ভূতত্ত্ববিদ — স্বয়ংক্রিয় স্টেশন — 'লুনা-২০' চান্দ্র

পবর্তমালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখানে অবতরণ পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হওয়া সত্ত্বেও অভিযানটি সফল হয়। ফলে অতিসত্বর বিজ্ঞানীরা চাঁদের স্থলভাগের মাটির টুকরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। তারপর পাঁচবছর কাটতে না কাটতেই পৃথিবীর গবেষণাগারগুলি চান্দ্রশিলার আরো এক প্রস্ত চালান পেল, — এবারে তা ছিল 'সঙ্কটসাগর' উপকূলের শিলা। এ নমুনাগুলি বিশেষ মূল্যবান। কেননা, চান্দ্রস্টেশন 'লুনা-২৪' উপরিভাগ থেকে এগুলি সংগ্রহ করে আনেনি — এ হল চন্দ্রপৃষ্ঠের ২ মিটার গভীরতায় অবস্থিত শিলার নমুনা।

উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে অবস্থিত চান্দ্র গ্লোবটিতে কতগুলি লাল রঙের তারকা চিহ্ন চোখে পড়ে। এই স্থানগুলিতে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় চান্দ্র স্টেশনগুলি অবতরণ করেছে। এদের মধ্যে পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত তিনটি বিন্দু সাথে সাথেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে 'লুনা-16', 'লুনা-20' ও 'লুনা-24' স্বয়ংক্রিয় ভূতত্ত্ব গবেষক স্টেশনগুলি চন্দ্রে অবতরণ করেছে। এই বিন্দু তিনটির সংযোগ রেখাটি যেন আমাদের চিরন্তন উপগ্রহের তিন যুগকে সংযুক্ত করেছে।

দুটি সমুদ্রের যোজকে অবতরণকারী 'লুনা-20' স্টেশনটি প্রাচীনতম চান্দ্রশিলা পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এই দুটি সমুদ্রের একটি — প্রাচুর্যসাগর — বয়সের হিসাবে তুলনামূলক নবীন লাভাপূর্ণ। 'লুনা-16' এদের নমুনা পৃথিবীতে বয়ে আনে। সঙ্কট সাগর — যেখানে 'লুনা-24' অবতরণ করেছে — ভূতাত্ত্বিক পরিমাপে সর্বকণিষ্ঠ। কোন এক অতিকায় উল্কার আঘাতে 'মাত্র' 2.5-3 বিলিয়ন বছর আগে এর বৃত্তাকার সমুদ্রগর্ভের সৃষ্টি হয়। এইভাবে বিজ্ঞানীরা চাঁদের ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলির প্রতিনিধিত্বকারী তিন ধরনের শিলার নমুনা পেয়েছেন।

এদের প্রতিটি নমুনাই পৃথক পৃথক ভাবে আবার যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। কেননা যে কোন রেজোলাইট বালুকণাই — চন্দ্রপৃষ্ঠকে ঢেকে-রাখা ভুরভুরে শিলা — কোটি কোটি বছর ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কাপিন্ডের আঘাতজনিত বিস্ফোরণের ফলে অগণিতবার স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলত কেবল একমুঠো মাটি হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠন-তথ্য বর্ণনা করতে পারে।

চাঁদের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি-হওয়া স্তরসমূহে অঙ্কিত। চান্দ্র শিলার খনন স্তম্ভকে চাঁদের জীবনবৃত্তান্তের শিলালিপি বলা যেতে পারে। এর প্রতিটি স্তর এক একটি পৃষ্ঠার সঙ্গে তুলনীয়। 'লুনা-24' স্টেশনটি চাঁদের মাটির একটি স্তম্ভ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য যে, স্তম্ভটির স্তরগুলি আদৌ একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়নি।

অনেকদিন ধরেই অদ্ভুত গঠনের 'শকটগুলি' চান্দ্রসমুদ্রের বুকচিরে চলাফেরা করছিল। এরা ফাটল পার হয়ে যেত, আগ্নেয়গিরির খাড়া জ্বালামুখের দেয়াল বেয়ে উঠত। তবে এই চাঁদটি ছিল পৃথিবীর বুকেই। আমাদের এই গ্রহে কঠোর চান্দ্র পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু প্রকল্পপ্রণয়ন বিশারদরা পরীক্ষাক্ষেত্রে চাঁদের পরিবেশ — জ্বালামুখ, ফাটল, স্তুপীকৃত শৈল, ঢাল ইত্যাদি গড়ে তুললেন।

ধাতব ক্যাটার-পিলার ও প্লাষ্টিক শোলেকযুক্ত এসব শকট দেখতে বিকট কীটের মত। অদ্ভুতভাবে পা ফেলে চলে এমন নালীওয়ালা পা, চান্দ্রশকটগুলিকে পরখ করে দেখতে হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষামূলক শকটগুলিতে আমাদের পুরনো পরিচিত সাধারণ চাকার স্থান ছিল সবার শেষে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

এমনি করেই চান্দ্রশকটের চাকা 'বৃষ্টিসাগরের' বুকে পথ তৈরি করে নিয়েছে। সোভিয়েত চান্দ্রস্টেশন 'লুনা-১৭', এই শকটটিকে

এখানে বয়ে নিয়ে আসে। আপাতদৃষ্টিতে 'লুনাখোদ-১' র ব্যাপক অসামঞ্জস্য দেখে অবাক হয়ে যেতে হয় — ছোট ছোট দেখতে, নড়বড়ে চাকার উপর বিশাল ও ভারী ড্রামটি ছিল যন্ত্রপাতির আধার। কেবল একটু পরে চিন্তা করলে মাথায় আসে যে, চাঁদে যে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর তুলনায় ছয়গুণ কম।

নিজস্ব ব্রেক সম্বলিত চান্দ্রশকটের প্রত্যেকটি চাকা পৃথক-পৃথক বৈদ্যুতিক মোটর-চালিত। কিন্তু প্রশ্ন হল বৈদ্যুতিক মোটর কেন? কেননা চাঁদে এটাই একমাত্র মোটর যার 'জ্বালানী' সেখানেই রয়েছে। আর তা অঢেল পরিমাণে সূর্য থেকে পাওয়া যায়। যন্ত্রপাতির আধারের উপরকার ঢাক্‌নার ভেতর দিকে সৌরব্যাটারী বসান। এই ঢাকনাটি যে কোন কোণে, এমনকি অনুভূমিক অবস্থায় উত্তোলিত হতে পারে। এইভাবে রাসায়নিক উৎস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রণয়ক উপাদনগুলির উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

চান্দ্রশকট কেবল সামনে বা পিছন দিকেই চলনক্ষম ছিল না, এটি এমনকি ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতেও পারত। এজন্য শকটের একদিকের চাকাগুলি ঘুরতে আর অন্যদিকের চাকাগুলিকে ব্রেক-কষে স্থির অবস্থায় থাকতে হত। ফলত শকটটি ব্যাপক ম্যানোভারক্ষম হয়েছিল। না ভেবে-চিন্তে হুট করে শকটটি যে কোন জ্বালামুখ বেয়ে উঠতে বা যে কোন দুর্গম খাড়া পাহাড় অতিক্রমের চেষ্টা করত না। পথের কোন খাড়াইয়ের কৌণিক অবস্থান তার অতিক্রম ক্ষমতার বেশী হলে শকটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যেত।

মহাশূন্যজনিত শূন্যতার কারণে যন্ত্রপাতির আধারটি বায়ুনিরোধক করা হয়েছে। দিনের বেলায় +130°C গরম ও রাতে —170°C ঠাণ্ডা — এহেন চরম আবহাওয়ার জন্য শকটে জটিল তাপনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা রয়েছে। চান্দ্রদিবসে এই ব্যবস্থা আধারে স্থাপিত যন্ত্রপাতি
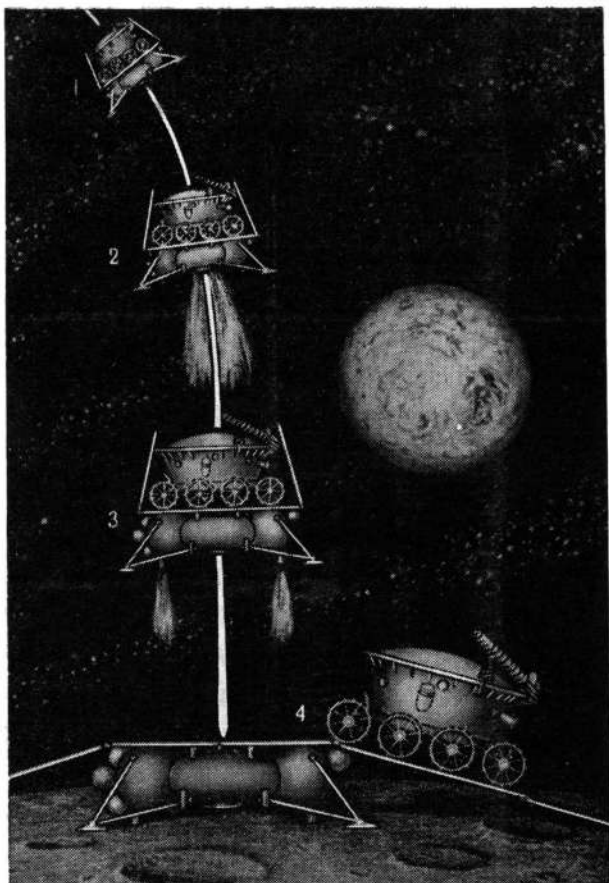
'লুনা-21' স্টেশনের অবতরণের নকশা

1 — চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগের সন্নিকটবর্তী হওয়া; 2 — ব্রেক-ইঞ্জিন চালু করা; 3 — সফ্ট-ল্যান্ডিং-এর ইঞ্জিনগুলি চালু করা; 4 — 'লুনাখোদ-2' স্টেশন ত্যাগ করছে

থেকে তাপ অপসারণ করে আর রাতের বেলায় আধারস্থ গ্যাসকে গরম রাখে।

চান্দ্রশকটের চোখ হল তার টেলিভিশন ক্যামেরাগুলি। এই চোখ দিয়ে রাস্তা দেখে, সে দৃষ্ট সবকিছু সম্বন্ধে তার চালকদের জানায়। চান্দ্রশকটের কমান্ডার, নেভিগেটার, অন্যান্য চালক ও ইঞ্জিনিয়ারের কর্মস্থল যানটি থেকে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত — নভযোগাযোগ কেন্দ্রের প্যানেলে। সেখান থেকে বেতার মাধ্যমে চালকরা শকটটি চালনা করেছেন। কিন্তু কাজটি আদৌ সহজ ছিল না। কারণ পৃথিবী থেকে বেতারসঙ্কেত চাঁদে যেতে ও চান্দ্রশকট থেকে তা ফিরে আসতে যে-সময় লাগে সে সময়ে শকটটি বেশ কয়েক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করত।

চান্দ্রশকটের চতুর্পার্শ্বের এলাকায় উল্লেযোগ্য কোন দিকনির্ণায়ক লক্ষ্যবস্তু প্রায় ছিলই না। তা সত্ত্বেও তার চালকরা নির্ধারিত পথে শকটটিকে চালনায় সক্ষম হয়েছেন। এভাবে 'বৃষ্টি-সাগরে' দীর্ঘ পরিভ্রমণ শেষে শকটটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে 'লুনা-১৭'র অবতরণস্থলে নিয়ে আসা হয়। চান্দ্রশকট চালনায় নেভীগেটারকে কোন্ যন্ত্রগুলি সাহায্য করেছে?

কম্পাসের চুম্বকশলাকা চাঁদে ব্যবহার করা একেবারেই অর্থহীন। চাঁদের নিজস্ব চৌম্বক-ক্ষেত্র নেই, কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে থেকে সহজেই তারকা, সূর্য ও পৃথিবীর সাহায্যে দিক নির্ণয় করা যায়। কারণ, পৃথিবী থেকে জ্যোতিষ্কগুলির পর্যবেক্ষণে বাধা সৃষ্টিকারী মেঘ চাঁদের আকাশে নেই। 'লুনাখোদ-১' র মহাজাগতিক নেভীগেশনের সুবিধার্থে জ্যোতির্বিদ্যাগত টেলিফটোমিটার নামক দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে শকটটি সূর্য ও পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে। দূরবর্তী নভযোগাযোগ কেন্দ্রে প্রেরিত চাঁদের

আকাশের বৃহত্তম এই জ্যোতিষ্কগুলির প্রতিচ্ছবি নেভীগেটারকে চান্দ্রশকটটির অবস্থান ও গতিপথ নির্ধারণে সাহায্য করেছে।

গতিপথ নিয়ন্ত্রক গাইরোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে শকটের মোড়বদলকারী কোণ নির্ধারিত হয়। চান্দ্রশকটটির মোড়বদলের সময় গাইরোস্কোপ যন্ত্রের অক্ষদণ্ড তার প্রাথমিক অবস্থানে থেকে যায় ও যে কাঠামোতে যন্ত্রটি বসান তা শকটটির সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে স্থান বদল করে।

সচল গবেষণাগারের অতিক্রান্ত পথ তার চাকার ঘূর্ণনের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। এজন্য প্রত্যেক চাকায় বিশেষ ধরনের ডিটেক্টর বসান হয়েছে। পথের কোথাও শকটটি আটকে পড়লে এই হিসাব সংশোধন করা হয়। কোন অবস্থায়ই আটকে পড়ে না ও সবসময় স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারে, এমনভাবে নির্মিত, নয় নম্বর চাকা একাজে ব্যবহৃত হয়। গাইরো-ভার্টিক্যাল নামক অপর একটি গাইরোস্কোপ যানটির চালকদেরকে পথের ঢাল সম্পর্কে অবহিত করে।

চাঁদের দেশে ভ্রমণকারী এই যন্ত্রটি নানা পেশার অধিকারী। শকটটি তার চারপাশের এলাকার বহু ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এতে বসান যন্ত্রপাতি চান্দ্রশিলার দৃঢ়তা, ঘনত্ব ও রাসায়নিক কাঠামো নির্ধারণ করেছে। তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপে আবৃত একটি প্লেট চান্দ্রশকটের নিকটবর্তী শিলায় তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ করে। শিলার উপাদান — প্রতিটি রাসায়নিক পদার্থই নিজস্ব ধর্মানুসারে এই বিকিরণের জবাব দেয়।

চান্দ্রশকটে লাজার-রশ্মি প্রতিফলক স্থাপন করা হয়েছিল। পৃথিবী থেকে পাঠানো ল্যাজার-রশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে যে-সময় লাগে তার সাহায্যে চাঁদ ও পৃথিবীর সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।

চান্দ্রশকট এস্ট্রোফিজিক্স বা নভপদার্থবিদ্যার কতগুলি বিষয়েও

পরীক্ষা চালিয়েছে। এতে বসান রঞ্জনরশ্মি-দূরবীনের ডিটেক্টরগুলি সোজাসুজি খমধ্য বিন্দুতে তাক্-করা হয়েছিল।

প্রথম স্বয়ংক্রিয় সচল গবেষণাগারের চন্দ্র অভিযাত্রা প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়েছে। এই সময় বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন, আর চান্দ্রশকটের কৃৎকৌশলীরা ভিন্ গ্রহের শকটের প্রথম সংস্করণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। ১৯৭২ সালের শুরুতে চান্দ্রস্টেশন 'লুনা-২১' বাহিত 'লুনাখোদ-২' র নির্মল সাগরের বুকে চলাচল থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকৌশলীরা কিভাবে ব্যবহার করেছেন।

নতুন চান্দ্রশকটই অধিকতর উন্নত দৃষ্টিশক্তির অধিকারী — একটি টেলিভিশন ক্যামেরাকে উঁচুতে স্থাপন করে কৃৎকৌশলীরা তার দৃষ্টিগোচর এলাকা বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন, এবং চালকদের সামনের টেলিভিশন পর্দায় দৃশ্যপট অপেক্ষাকৃত দ্রুত বদলানো সম্ভব হয়েছে। ফলত চান্দ্রশকটের চলাচল অধিকতর দৃশ্যমান ও সংবেদী হয়েছে, যেন চালকদের ৩৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে টেলিভিশন যন্ত্রের কাঁচের পর্দা আলাদা করে রেখেছে। নতুন চান্দ্রশকটের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শকটটি এখন সচল অবস্থায় ডানে-বামে মোড় বদল করতে পারে। যে কোন নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।

নিজের পূর্বসূরীর মত 'লুনাখোদ-২' কেবল সমুদ্রপৃষ্ঠেই অনুসন্ধান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেনি, চাঁদের পাহাড়গুলিতেও গবেষণা চালিয়েছে। চান্দ্রশকটে যন্ত্রপাতির আধুনিককরণ ও নতুন সংযোজনের ফলে তার কর্মক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্যই পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ সম্পর্কে এখনও অনেক তথ্যই আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু যেমন ভৌগলিক গুরুত্বপূর্ণ

আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন এলাকায় মানুষ বসবাসে অভ্যস্ত হয়েছে, তেমনি চন্দ্রগবেষণা অবিসম্ভাবীভাবে চাঁদের সম্পদকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে।

মঙ্গলগ্রহের অতিথিবরণ

কিছুদিন আগেও মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণার ভিত্তি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় গবেষণা। কিন্তু এখন জ্যোতির্বিদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে নভযানের যন্ত্রপাতি।

সোভিয়েত নভস্টেশন 'মারস্-১' সর্বপ্রথম মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৬২ সালে এই স্টেশনটি দূরবর্তী নভবেতার যোগাযোগে রেকর্ড সৃষ্টি করলেও লক্ষ্যে পেঁছাতে পারেনি। ষাটের দশকের শেষভাগে মার্কিন নভস্টেশন 'মেরিনার-4,' 'মেরিনার-৬ ও ৭' মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় কাছ থেকে গ্রহটির ছবি তোলে। কিন্তু খুব অল্প সময় স্টেশনগুলি মঙ্গলগ্রহের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। ফলত তাদের পাঠান বিবরণ খুব বিশদ হতে পারেনি।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর উদাহরণ একান্তভাবে দেখিয়েছে যে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে কোন গ্রহের 'বিশদ' গবেষণা অধিকতর সুবিধাজনক। মঙ্গলগ্রহেও কৃত্রিম উপগ্রহের আবির্ভাব ঘটেছে। ১৯৭১ সালে গ্রহটির চতুর্দিকে মার্কিন নভযান 'মেরিনার-৯' ও সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'মারস-২' ও 'মারস-৩' কক্ষপথে উপনীত হয়।

গ্রহটির নিকটবর্তী হবার পর নভস্টেশন 'মারস-২' থেকে মঙ্গলগ্রহপৃষ্ঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের অনুলিপি বহনকারী ক্যাপসুলটি আলাদা হয়। মূল স্টেশনটি গ্রহটিকে প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে কক্ষপথে অবস্থান নেয়। শেষবাক্যটিতে পৃথিবী থেকে কয়েকশ কোটি কিলোমিটার দূরে

অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কাজ করে যাওয়ার মত জটিলতম কৌশলগুলি লুকিয়ে আছে। সেটা জানার জন্য কিছুটা সময় পিছিয়ে গিয়ে 'মারস-৩'র উদাহরণে কাজগুলি কিভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা যাক।

স্টেশনটি মঙ্গলগ্রহ থেকে ৭০ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থাকা অবস্থায় শেষবারের মত ট্রাজেক্টরি সংশোধন করা হয়। এই পর্যায়ে নভযানটি তার পূর্ববর্তী 'মারস-২'র মতই পৃথিবী থেকে কোনরকম ইঙ্গিত ছাড়াই নিজে নিজেই কাজটি সম্পন্ন করে। যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য নভযানটিতে স্থাপিত প্রেরক-এ্যান্টেনার পেয়ালাটি পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা আবশ্যক ছিল। এ সময় সূর্য ও কানোপাস নক্ষত্র নভস্টেশনটির দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করেছে। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনগুলি স্টেশনটিকে এমনভাবে ঘুরিয়েছে যেন জ্যোতিষ্কগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত ডিটেক্টরের দিকে পড়ে। এই অবস্থায় এ্যাণ্টিনা সঠিকভাবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। স্থিতিব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনের সাহায্যে স্টেশনটির নির্ণেয় অবস্থা ধরে রাখা হয়েছিল।

এই পর্যায়ে নেভীগেশন ব্যবস্থা মঙ্গলগ্রহ থেকে তার দূরত্ব ও গ্রহবলয়ের কেন্দ্র নির্ণয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। দূরবর্তী কোন বস্তুর সঠিক আয়তন জানা থাকলে তার দূরত্ব বের করা কঠিন নয়। আর মঙ্গলগ্রহের ব্যাস আমাদের অনেক আগে থেকেই জানা। স্টেশনটি অনেকদূরে থাকা অবস্থায় গ্রহটি তার 'চোখে' ছোট গোলাকার একটি দাগের মত মনে হয়েছে। যতই নভযানটি গ্রহটির নিকটবর্তী হল ততই তা বাড়তে থাকল এবং অচিরেই রূপালী থালার আকারে অপ্টিকাল যন্ত্রের দর্শনক্ষম এলাকাটা পুরোপুরি জুড়ে বসল। এর অর্থ এই যে, মঙ্গলগ্রহ খুব কাছাকাছি। স্টেশনটির 'ইন্দ্রিয়গুলি' প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে তার মস্তিষ্কে — নভযানের কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন হিসাব করা শুরু হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী সংশোধিত

হওয়ার পর স্টেশনটি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ট্রাজেকটরীতে প্রবেশ করার কথা। এই অবস্থায় কম্পিউটার ইঞ্জিনগুলির নিষ্কাশনপথ কোন্‌দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে তা নির্ণয় করে এবং স্টেশনটিকে সেই অনুসারে ঘুরানোর জন্য ওরিয়েণ্টেশনের ক্ষুদ্র ইঞ্জিনগুলিকে নির্দেশ দেয়। একই সাথে কম্পিউটার প্রোগ্রামকৃত সময়-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতিকে কখন ও কতসময় মূল ইঞ্জিন চালু রাখতে হবে তা জানায়। নির্ধারিত সময়ে ইঞ্জিনের নিষ্কাশন পথে নির্গত গ্যাসের ধারা স্টেশনটিকে নতুন ট্রাজেকটরীতে নিয়ে আসে। সূর্য ও কানোপাস এ্যান্টিনাগুলিকে পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার জন্য তাকে কিভাবে ঘুরতে হবে তা বলে দেয়।

এই সংশোধন কার্যক্রম এক ঘণ্টারও বেশী সময় স্থায়ী হয়। ওই সময় পৃথিবীর সাথে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। অতঃপর প্রেরকযন্ত্র চালু হয়। কিন্তু সাথে সাথেই পৃথিবী তার বেতারসংকেত শুনতে পায়নি। কেননা মঙ্গলগ্রহ থেকে দূরবর্তী নভযোগাযোগ কেন্দ্রের গ্রাহক এ্যান্টিনায় বেতারসংকেত পৌঁছতে পুরো ৮ মিনিট সময় লাগে। এই জন্যই আন্তঃগ্রহ অভিযাত্রার সর্বশেষ পর্যায়ে নভস্টেশনটির নিয়ন্ত্রণভার তার 'নিজের হাতে' দিয়ে দেয়া হয়।

ট্রাজেকটরী সংশোধিত হবার সাথে সাথেই 'মারস-৩' থেকে অবতরণ-মডিউলটি বিচ্ছিন্ন হয়। এ পর্যায়ে মডিউলটি কিছুক্ষণ স্টেশনের কাছাকাছি উড়ে চলে। তারপর মডিউলটির ইঞ্জিন তাকে গ্রহটির দিকে যাওয়ার ট্রাজেকটরীতে নিয়ে যায়। সাড়ে চার ঘণ্টা পরে শংকু আকৃতি খোলায় ঢাকা অবতরণ-মডিউলটি মঙ্গলগ্রহের গ্যাসীয় আবরণীতে প্রবেশ করে।

মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব ছাড়াছাড়া আর উপরের স্তরে তার ঘনত্ব খুবই কম। তাই কিছুসময় মডিউলটি কোন বাধাই অনুভব করেনি। যাইহোক, মডিউলটি নীচে নেমে আসার সাথে সাথে

বায়ুমণ্ডল ঘনতর হয়েছে, আর রক্ষাকারী শঙ্কুর উপর তার চাপ ক্রমেই বেড়েছে। অচিরেই বায়ুমণ্ডলীয় বাধা অবরোহণের গতিবেগ কমিয়ে আনে এবং চাপাধিক্য কমতে থাকে। চাপাধিক্য নির্ণায়ক ডিটেক্টারের নির্দেশে বারুদচালিত জেট-ইঞ্জিন এখন নিষ্কাশন-প্যারাসুট মেলে দেয়। ছোট ছাতাটির সাথে সাথে বড় ছাতাটিও খুলে যায়। ফলত মডিউলের অবরোহণ গতিবেগ কমে যায় কিন্তু তা এখনও শব্দের গতি অপেক্ষা বেশী। এই কাজটি করার পর নিষ্কাশন প্যারাসুট মডিউল থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং ছোট একটি জেট ইঞ্জিন তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য সাথে সাথেই মূল প্যারাসুটটি খুলে যায় না। আর তাই তা মঙ্গলগ্রহের বাতাসের চাপের মুখে ছিড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

মডিউলের গতিবেগ আরো মন্দীভূত হলে প্রোগ্রামকৃত-সময়নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি মূল প্যারাসুটকে সম্পূর্ণ খুলে যেতে অনুমতি দেয়। এ সময় রক্ষাকারী শঙ্কুটি আলাদা হয়ে খুলে নিচে পড়ে যায়, আর মডিউলটিতে নিরাপদ অবতরণের লক্ষ্যে উচ্চতামাপক বেতারযন্ত্র ব্যবস্থার এ্যান্টিনাগুলি খুলে যায়।

মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠ আরো কাছে এসে যায়। দূরত্ব কমে ৩০ মিটার হলে আরো একটি জেট ইঞ্জিন মূল প্যারাসুটটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যাতে তার কাপড়ে মডিউলটি না ঢেকে যায়।

ইতিমধ্যে প্রোগ্রামকৃত-সময়নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি নিরাপদ অবতরণের ইঞ্জিনটি চালু করে। এখন শেষবারের মত গতিবেগ কমিয়ে আনতে হবে। পূর্বনির্দিষ্ট সময় কাজ করে তা মডিউল থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যায়। আরো কয়েক মুহূর্ত পরে মডিউলটি মঙ্গলপৃষ্ঠ স্পর্শ করে।

প্রোগ্রামকৃত-সময়নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি এখনও কাজ করে চলেছে।

তারই নির্দেশে নভযানটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'রক্তিম গ্রহ' থেকে পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠাল।

এই আন্তঃগ্রহ স্টেশনটির নির্মাতারা জানতেন যে মঙ্গলগ্রহে ধূলো-ঝড় ওঠে। তাই তারা মডিউলটিকে এর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরে মঙ্গলগ্রহে ভয়ানক শক্তিশালী ঝড় উঠবে ও তা বহুমাস ধূলার আবরণে গ্রহটিকে ঘিরে রাখবে তা তাদের পক্ষে আগে থেকেই কল্পনা করা স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব ছিল না। বলা যায় যে, মঙ্গলগ্রহ যেন সেই ভয়ঙ্কর যোদ্ধা দেবতার — যার নামে গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে — কথা স্মরণ করছে। মঙ্গলপৃষ্ঠে বাতাসের বেগ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। সম্ভবত এই জন্যই মঙ্গলগ্রহের সাথে বেতার যোগাযোগ এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

আন্তঃগ্রহ স্টেশন 'মারস্-৩' এসময় কোথায় অবস্থান করছিল? তার যাত্রী — অবতরণ-মডিউলের বোঝামুক্ত হয়ে সে মঙ্গলগ্রহের নিকটবর্তী হয়। তার ট্রাজেকটরী গ্রহটির পাশদিয়ে ঘুরে যাবে, এমনটিই নির্ধারিত ছিল।

আন্তঃগ্রহ স্টেশনটির গতিবেগ মন্দীভূত করার প্রস্তুতি শুরু হয়। কম্পিউটার পুনরায় স্টেশনটিকে দিক পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে ফেলে এবং যথাসময়ে ইঞ্জিন চালু করে। এবারে স্বচ্ছন্দে গ্রহটিকে অতিক্রম করে 'মারস-৩' তার নতুন উপগ্রহে পরিণত হয়।

যেখানে অবতরণ-মডিউলটি নেমেছিল তার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় স্টেশনটি মডিউলের 'গলার আওয়াজ' শুনতে পায়। দুই গ্রহের মধ্যকার বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। স্টেশনের শক্তিশালী বেতার প্রেরক যন্ত্রগুলি তা পৃথিবীতে 'রীলে করে পাঠায়'।

বিজ্ঞানীরা 'মারস-২ ও ৩' কে বিভিন্ন রকম গবেষকের পেশা দিয়েছিলেন। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে নানা রকমের বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। এদের একটি মঙ্গলগ্রহের তাপসংক্রান্ত ছবি — গ্রহপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বণ্টনের মানচিত্র আঁকে, কোন কোনটি বায়ুমণ্ডলের গঠন ও ঘনত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করে, আবার কোনটি বা গ্রহের ভূগঠন প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ পাঠায়।

এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে নানা ধরনের ক্যামেরা স্থাপিত ছিল। এদের কেউবা মঙ্গলপৃষ্ঠের বড় এলাকাগুলির ছবি তোলে আর অপরগুলি বিস্তারিত খুঁটিনাটির শট্ নেয়। স্টেশনটি বিভিন্ন দূরত্ব থেকে ও বিবিধ আলোক-ফিল্টারের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের ছবি তোলে। ফিল্মগুলি স্টেশনেই ডেভেলাপ করা হয় এবং প্রাপ্ত ছবিগুলি টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়।

এই ছবিগুলি মঙ্গলগ্রহকে নতুন করে জানতে সাহায্য করেছে। অদৃশ্য বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরি আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে (এদের একটির — নিক্স অলিম্পিক — উচ্চতা ২০ কিলোমিটার ও ভিত্তিভূমির ব্যাস ৫০০ কিলোমিটার)। বিস্তীর্ণ মরু এলাকা জুড়ে ভয়ঙ্কর সব ফাটল, যার তুলনায় আমেরিকার কালোরাডো উপত্যকাকে একটা আঁচড় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

কিন্তু গ্রহবিদদের এটাও খুব বেশী বিস্মিত করেনি। মঙ্গলগ্রহের পাহাড় ও টিলার বুকচিরে আশ্চর্য রকমের হল-রেখা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। না, মঙ্গলগ্রহের বিখ্যাত খালগুলির ব্যাখ্যায় চোখের ভুলের মত কোন বিষয়ই এটা নয়। ভূগঠনের এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যগুলি... শুকিয়ে যাওয়া নদীগর্ভের কথা মনে করিয়ে দেয়। মঙ্গলগ্রহে নদী? গ্রহটির বায়ুমণ্ডল এত স্বল্প হওয়ার কারণে সেখানে তরল জল অবশ্যই ফুটে বাষ্পে পরিণত হওয়া উচিৎ নয় কি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্থিব নদী ও খালের সদৃশ নদীগর্ভ ও বিশাল খাতগুলি সেখানে রয়েছে।

১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মকালে মোট ৪টি সোভিয়েত আন্তঃগ্রহ স্টেশন
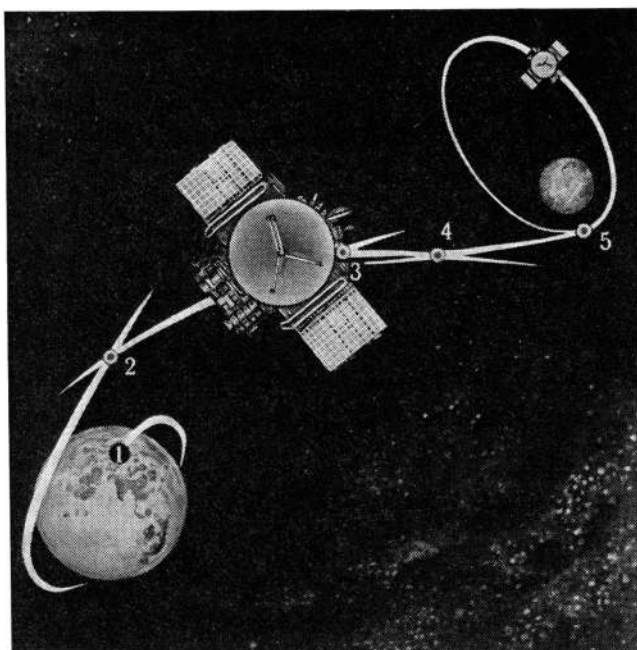
স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'মার্স-5' র উড্ডয়নের নক্‌শা
1 — যাত্রাশুরু; 2-4 — উড্ডয়ন পথের সংশোধন; 5 — মঙ্গলগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে স্টেশনটিকে স্থাপনের জন্য গতিরোধ করা

মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। 'মারস্‌-৪' ও 'মারস্‌-৫' ১৯৭৪ সালে গ্রহটির নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে। প্রথমে 'মারস-৪' মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে ২২ কিলোমিটার দূরত্বে উপনীত হয়ে গ্রহটির আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠায়। আর তার দুদিন পরে 'মারস্‌-৫' গ্রহটির চতুর্দিকে স্বীয় কক্ষপথে প্রবেশ করে।

'মারস-৫' আবার গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ণয় করে। এবারে আগের তুলনায় বেশী হলেও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই নগণ্য এবং তা জলাধার গঠনের জন আদৌ যথেষ্ট নয়। জলীয় বাষ্প পরিমাপের এই তথ্য মঙ্গলগ্রহের নদী উৎপত্তি জনিত সমস্যার সমাধানের কোন পথই দেখাতে পারেনি। ফলে কতকগুলি অনুমান বা হাইপোথিসিসের উদ্ভব ঘটে। তন্মধ্যে একটি — যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হয় — বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর অনুসারীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, মঙ্গলগ্রহে আবহাওয়া কয়েক কোটি অথবা লক্ষ বছর পরপর নিয়মিত বদলে যায়। এই অনুমানের প্রবক্তাদের মতে মঙ্গলগ্রহ বিবর্তনের দোলনায় দুলে চলেছে। ফলে তুলনামূলক অল্প কিছু সময় আগে পৃথিবীর মতই জল ও বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব মঙ্গল-পৃষ্ঠে ছিল। পরবর্তীতে বায়ুমণ্ডলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তা জমে মেরুবলয়ের তুষারটুপিতে পরিণত হয়ে আমাদের সামনে আসছে।

'মারস্-৫' তার কক্ষপথে একমাস কাজ করার পর পৃথিবী থেকে প্রেরিত পরবর্তী দূত গ্রহটির কাছাকাছি পেঁছে। অন্তঃগ্রহ স্টেশন 'মারস্-৬' র অবতরণ-মডিউল মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে। এর আগে, তা প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসার সময় গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের ভিতরে থেকে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে প্রথমবারের মত গবেষণা চালায়। এ সম্পর্কে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলেন: 'সোভিয়েত ইউনিয়ন মঙ্গলগ্রহে নভযান অবতরণ করার কাজে যে সক্ষমতা দেখিয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৬ সালের আগে অর্জন করতে পারবেনা'। আর এখন সে সময় এসেছে। ভাইকিং নামের দুটি মার্কিন অন্তঃগ্রহ স্টেশন মঙ্গলগ্রহে পেঁছে।

এর আগে 'মেরিনার-৯' মঙ্গলপৃষ্ঠের ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল।

এই ছবিগুলি থেকে অন্তঃগ্রহ স্টেশন দুটির প্রথমটির জন্য সুবিধাজনক অবতরণ ক্ষেত্র পাওয়া গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তার চোখ — টেলিভিশন ক্যামেরা — নির্ধারিত এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করার সময় সেখানে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, লাভা-পরিপূর্ণ ফাটল, অতিকায় পাহাড় দেখতে পায়। বিলুপ্ত জলপ্রবাহের চিহ্নযুক্ত 'খাল' ও 'দ্বীপগুলি' খুব বেশী আস্থা সঞ্চার করে না। ফলে অবতরণ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রহটিতে 'বিমানবন্দর' খুঁজে বের করা খুব জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। একাজে জ্যোতির্বিদরা বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেন। বেতার দূরবীনের বেতাররশ্মির সাহায্যে মঙ্গলপৃষ্ঠকে পর্যবেক্ষণ করে তারা হিরজ সমভূমির এক কোনায় অনুকূল সমতল ক্ষেত্রের সন্ধান পান। এখানেই প্রথম 'ভাইকিং'র অবতরণ-মডিউল নেমে আসে। তার পাঠানো এসংক্রান্ত খবরের জন্য প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় — মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যকার ৩৪ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে বেতারতরঙ্গের এই সময় লাগে।

শুক্রগ্রহের মেঘের ঢাকনি, শনির বলয়, বৃহস্পতির রক্তিম কলঙ্ক — এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই সৌরজগতের এই গ্রহগুলিকে চিনতে সাহায্য করে। অন্যান্য মহাজাগতিক প্রতিবেশীদের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের পার্থক্য হল তার রঙ। তথাপি আদৌ কেউই আশা করেননি যে গ্রহটি এমন রক্তবর্ণ হবে। কিন্তু এই গ্রহটির ছবি, যেখানে সবকিছু রক্তবর্ণে রঞ্জিত। যেন লাল রঙের স্বচ্ছ কাঁচখণ্ডের মধ্যদিয়ে ঘন পাথর বোঝাই টিলাপূর্ণ একটুকরা সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। রক্তিম মরুভূমির উপরে হাল্‌কা গোলাপী একফালি আকাশ। পাথরের টুকরোগুলির উপর গোলাপী ধুলোর নরম কার্পেট। অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে লাল্‌চে বাদামী দাগগুলিকে উদ্দাম করে ঝড়ো বাতাস যেন শান্ত হয়েছে।

এতদূরের এই না- দেখা জগতেও পৃথিবীর মতই সাঁঝের প্রশান্তি

নামে আর ভোরের বেলায় হাল্‌কা কুয়াসা-ঘেরা ধোঁয়া দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে থাকে।

অবতরণ-মডিউল থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় হাত বেরিয়ে এসে একমুঠো কমলা-লাল পাথর উঠিয়ে নেয়। মঙ্গলপৃষ্ঠে বাকেটের দাগ আরো একবার চন্দ্র অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়: সেখানকার মত এখানেও গর্তের কোনা ঢালু হয়েছে, আর গর্তের দেয়াল খাড়াভাবে রয়েছে যেন ভেজা বালুতে গর্তটি করা হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের শিলায় লোহার ভাগ অনেক বেশী — প্রায় ১৫%। 'ভাইকিং'র রঞ্জন-রশ্মি স্পেক্ট্রোমিটার এছাড়াও তাতে প্রচুর পরিমাণে ক্রোমিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও এলুমিনিয়াম আবিষ্কার করেছে। তা ছাড়া রুবিডিয়াম, স্ট্রান্সিয়াম, জির্কোনিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির অস্তিত্বও মঙ্গলগ্রহের শিলায় পরিলক্ষিত হয়েছে। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর মতই একই শ্রেণীভুক্ত গ্রহ। শুক্রগ্রহের মত মঙ্গলগ্রহের বেলায়ও এই যুক্তির পক্ষে আরো একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে: শিলাগুলির অধিকাংশই ব্যাসাল্ট ল্যাভার টুকরা সম্বলিত। অর্থাৎ পৃথিবী ও চাঁদের মতই এখানেও কোন এক সময়ে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় ছিল।

এসব সত্ত্বেও মঙ্গলপৃষ্ঠে জীবনের সন্ধান, এই অভিযাত্রায় গবেষণা কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র প্রাণীরা তাদের জীবননির্বাহের প্রক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ ও বিভিন্ন গ্যাস নির্গত করে। তাই মঙ্গলগ্রহের অদৃশ্য ব্যাক্টেরিয়াসমূহও অনুরূপ ভাবেই জীবনধারণ করে, এমনটি ধরে নেওয়াই ছিল যুক্তিসঙ্গত। অনুমিত ভিন্‌ গ্রহের প্রাণীদের বিশেষ 'মশ্‌লা' যুক্ত খাদ্য খেতে দেওয়া হল। পুষ্টিকর, দ্রবণে চিহ্নিত কার্বন অণু মেশান ছিল। যদি মঙ্গলগ্রহের ব্যাক্টেরিয়া পৃথিবীস্থ তাদের স্বগোত্রীয়দের মতই সত্য সত্যই কার্বন গ্রহণ করে তা হলে

তাদের নির্গত গ্যাসে কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

মঙ্গলগ্রহ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যাদি একই সাথে বিজ্ঞানীদের আনন্দিত ও হতবুদ্ধি করেছে। পৃথিবীতে অবস্থিত ল্যাবরেটারীর— যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী পরীক্ষায় বাস্তব অতিক্ষুদ্রপ্রাণীরা 'কাজ করছিল' — তুলনায় এখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের যান্ত্রিক কাউন্টার বা গণক ঘন ঘন তা গণনা করেছে। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এই কর্মসূচীর একজন পরিচালকের ভাষায় মঙ্গলগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য সেখানে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে কেবল তখনই যখন অগণিত অন্যান্য সকল সম্ভাবনার ব্যাখ্যা অবাস্তব প্রতীয়মান হবে।

সম্ভাব্য প্রাণীদের পরিবেশের সাথে গ্যাসীয় আদানপ্রদান নির্ণয়কারী যন্ত্রটির সরবরাহকৃত তথ্য বিজ্ঞানীদের আরও বেশী ভাবনায় ফেলেছে। এই গ্রহের মাটিকে খাদ্যরসে ভিজিয়ে পরে গরম করা হয়। নিয়মিতভাবে কিছু সময় পরপরই প্রকোষ্ঠের 'বাতাসের' নমুনা পরীক্ষা করার জন্য নেওয়া হয়। অচিরেই (হিসাব অনুযায়ী ১২ দিনের বদলে মাত্র দুদিন পরেই) প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে ১৫-২০ গুণ বেশী পরিমাণে নির্গত অক্সিজেন পরিলক্ষিত হয়। 'ভাইকিং' প্রকল্পের গবেষণা পরিচালক এ সম্পর্কে হতবুদ্ধিতা গোপন করেননি। 'এই তথ্যাদির অর্থ কী তা আমরা জানি এটা দাবী করা আমাদের তরফে একেবারেই চপলতার সামিল'।

প্রকৃতপক্ষে, শুকনা মাটির সাথে তরল পদার্থ যথেষ্ট দ্রুত বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। কিন্তু জৈবিক কারণে এমনটি হয়েছে — এ ধারণাটিও আকর্ষণীয়। নানারকম অনুমানের — যার অনেকগুলিই যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ — অভাব হলনা: "মঙ্গলগ্রহে কঠিন আবহাওয়ার (নভযানটির অবতরণস্থলের তাপমাত্রা —80°C থেকে —30°C পর্যন্ত ওঠা-নামা করে) কথা বিবেচনা করলে এমন ধারণা বাদ দেয়া

ধারনী যে, সেখানে সকল জীবন্ত প্রাণীরা 'ঘুমন্ত' অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের ঘুম ভেঙ্গে প্রাণ ফিরে আসার জন্য যথাযথ পরিবেশ প্রয়োজন। তাই জল ও খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্য এ সমস্ত অতিক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্য মহাভোজ সমতুল্য"।

উভয় যন্ত্র থেকেই গ্যাস-নির্গমন সাধারণত সংগঠিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু তাতে, জৈবিক প্রক্রিয়ার তুলনায় কম সময় পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞানী বলেন যে, 'আমরা এই উভয়ের মাঝামাঝি রয়েছি'।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ কোষস্থ ক্লোরফিল সূর্যরশ্মির প্রভাবে জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সমন্বয়ে জৈবপদার্থ উৎপন্ন করে। মঙ্গলগ্রহের জীব ও জ্যোতিষ্ক শক্তির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে কি? মাটি সহ একটি পাত্র মঙ্গলগ্রহের বাতাসপূর্ণ করে তাতে অল্প পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় কার্বন আইসোটোপ যোগ করা হল। জীবাণুরা — যদি তাদের অস্তিত্ব আদৌ থেকে থাকে — যাতে করে স্বীয় বাসস্থলের মত স্বচ্ছন্দ অনুভব করে সেজন্য মঙ্গলগ্রহের বৈশিষ্ট্যজনক সূর্যের আলো কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সেখানে বাতি জ্বালান হয়। এই অবস্থায় তাদের 'বংশবৃদ্ধি' কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। জীবকোষগুলিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত কার্বন গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর প্রকোষ্ঠ থেকে গ্যাস অপসৃত করে ওই মাটিকে 600°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত জৈবপদার্থ এই বাষ্পে পরিণত হওয়ার এবং তেজষ্ক্রিয় কণিকার গণকযন্ত্র এই গ্যাসে চিহ্নিত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করার কথা। এই পরীক্ষার ফলাফলও বিজ্ঞানীদের বিব্রত অবস্থায় ফেলেছে। কার্যত, মাটিতে অতিক্ষুদ্র জীব আদৌ না থাকলে যে পরিমাণ তেজষ্ক্রিয়তা পাওয়া যেত তার চেয়ে ৬ গুণ বেশী তেজষ্ক্রিয়তা সনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষার পরিচালক বলেছেন যে, 'আমরা মঙ্গলগ্রহে

জীবনের সন্ধান পাইনি, মাটির নমুনায় বিদ্যমান এই কিছু একটার — যা কার্বন ব্যবহার করেছে — নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে'।

নিয়ন্ত্রক পরীক্ষাগুলি এই 'কিছু একটা'কে জীবিত বা মৃত কোন্ গোষ্ঠিভুক্ত করা হবে যে বিষয়ে সহায়তা করার জন্য নির্ধারিত ছিল। গ্যাসীয় আদানপ্রদান ও সালোকসংশ্লেষণ নির্ধারণী যন্ত্রপাতিগুলিতে মাটির নতুন নমুনা নেয়া হয় এবং তা দীর্ঘসময় উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ফলত, যদি কোন রকম জীবাণু, নমুনায় থেকেও থাকে তবে তাদের মরে যাওয়ার কথা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনক্রিয়ার ফলাফল পাওয়ার প্রশ্নই আর এ অবস্থায় আসে না।

এই পরীক্ষায় সবকিছুই প্রায় জীববিজ্ঞানীদের আশা অনুযায়ী হয়েছে। "যদি আমরা কোন গবেষণাগারে এমন ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতাম", — জনৈক গবেষক এমন অভিমত প্রকাশ করেন, — 'তাহলে এ থেকে সহজেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম যে, জীবনের ক্ষীণতম কিন্তু অতিঅবশ্যই সংকেত পাওয়া গেছে'। তিনি আরো বলেন যে, 'যেহেতু এই সংকেত মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছে তাই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ'। অপর একজন গবেষক এ প্রসঙ্গে যোগ করেন যে, 'নিয়ন্ত্রক পরীক্ষাগুলির ফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কার্বন ডাই অক্সাইডের জৈব প্রকৃতির ধারণা রাসায়নিক প্রকৃতির ধারণার সমান। কিন্তু বিশ্বাস্য উত্তর এখনো অনেক দূরে'।

পৃথিবীতে প্রাণের রূপ — জীবকোষ ও অন্যান্য আদিকোষ কার্বন সহযোগে গঠিত। জীববিজ্ঞানের স্বয়ংক্রিয় এই গবেষণাগারের অন্যতম কাজ — এমন প্রাণ অনুসন্ধান। "যদি আমরা ধরে নেই যে শব্দ ও বাক্য সমন্বয়ে জীবন গঠিত, তবে 'ভাইকিং'র নাতিবৃহৎ গবেষণাগারটি 'বর্ণ' অনুসন্ধান করছে অর্থাৎ রক্তিম এই গ্রহটিতে অতীতে বা বর্তমানে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্যদানে সক্ষম জৈবিক অণুর

সন্ধান করেছেন" — এহল মার্কিন পত্র-পত্রিকার মতামত।

পৃথিবীর বাইরে অণুপর্যায়ে জীবনের অনুসন্ধান বহুদিন ধরেই চলেছে। উল্কাপিন্ডের রাসায়নিক গঠনে একাধিকবার জৈবপদার্থের অবশিষ্ট পাওয়া গেছে: এমনকি, অন্তঃনক্ষত্রীয় অণুতে জটিল কার্বন-সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়। মঙ্গলগ্রহে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জৈবপদার্থের উদ্ভব হতে পারে অথবা তা উল্কা বাহিত হতেও পারে। কারণ জৈবপদার্থ ছাড়া কিছুদিন আগে অবলুপ্ত হওয়া জীবন কিভাবে চলতে পারত?

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য যে, মঙ্গলগ্রহে জৈবপদার্থের সন্ধান মেলেনি। এই ফলাফল জীববিজ্ঞানীদের হতাশ করেছে। কিন্তু তারা পুরোপুরি আশা এখনও ছাড়েননি এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে দ্বিতীয় 'ভাইকিং' অবতরণের অপেক্ষা করছিলেন। যানটি প্রথমটির অবতরণ-স্থল থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে গ্রহটির বিপরীত পাশে অবতরণ করে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে প্রথম যানটির অবতরণস্থল ও কাল্পনিক অঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু অবতরণ-মডিউলটি সেখানে পৌঁছালে তার পরিচিত ছবি সবাইকে অবাক করে দেয়। প্রথম আলোকচিত্রগুলির মতই জীবনহীন রক্তিম সমভূমি, পাথরের ছড়াছড়ি, সেই অভিন্ন গোলাপী ধুলা এবং উপরের রক্তলাল আকাশ। 'পুরাতন' ও কেবলমাত্র পাওয়া মঙ্গলপৃষ্ঠের আলোকচিত্র দুটি পাশাপাশি রাখলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য খুব কম লোকেই ধরতে পারত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাক্ষ্যের সদৃশতা সবচেয়ে বিস্ময়কর।

তাহলে কী দাড়ায়? মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি নেই? 'ভাইকিং' কর্মসূচির পরিচালক এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি না আমরা জানিনা। কিন্তু আমাদের হাতে এমন কোন

প্রমাণও নেই যা দিয়ে আমরা সেখানে জীবনের সম্ভাবনা বাতিল করতে পারি'। বিখ্যাত মহাশূন্যবিদ অধ্যাপক ক. সাগান এর চেয়েও স্পষ্ট জবাব দেন। তিনি বলেন, "জীবনের বৃহত্তম রূপ — তাদের আকার ও রাসায়নিক গঠন ও হাবভাব এমন অসাধারণ ও খেয়ালী হতে পারে যে, জীবন হিসাবে তাদের সনাক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। 'ভাইকিং' পরীক্ষাগুলি ব্যর্থ হলেও এমনটিও হতে পারে যে ওই সময়ই মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা গ্রহটিতে অবতরণ-করা মহাশূন্যযানের জির্কনিয়ম রঙ পরম তৃপ্তি সহকারে উদরস্থ করেছে"।

কিন্তু 'ভাইকিং'রা হাইপোথিসিসের যথেষ্ট ভিত্তি যোগাড় করেছে। যেমন, উপরোক্ত ক্র. সাগান মঙ্গলগ্রহে মরূদ্যানের মত পারস্পরিক যোগাযোগবিহীন জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাতিল করেন না। গ্রহটিতে পাওয়া প্রচুর পরিমাণ জল (কোন একটি কৃত্রিম উপগ্রহের পরিমাপ অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহের উত্তরমেরু আবৃত-করা বরফের টুপিটি — পূর্বধারণা অনুযায়ী কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবর্তে প্রায় এক কিলোমিটার গভীর বরফের আবরণে গঠিত) আছে এই ধারণার অনুকূল যুক্তি দেখায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খ্যাতনামা অন্তঃগ্রহবিদ অধ্যাপক ভ. মারোজ — এ সম্পর্কে বলেন, "ভাইকিং গবেষণা কর্মসূচির মূল আকর্ষণ হল মঙ্গলগ্রহে জীবন রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল গবেষকদের সঙ্কটে ফেলেছে। পরীক্ষাগুলির ফলাফলকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর বলে বিবেচনা করা যায় না"। সোভিয়েত বিজ্ঞানী মার্কিন বিজ্ঞানীদের যথাযথ মূল্যায়ন করে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে নতুন তথ্যাদি, বৈশিষ্ট্য, বায়ুমণ্ডলের উল্লম্ব কাঠামো, বিভিন্ন এলাকার ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সৌরজগতের গ্রহগুলিতে নভযানের প্রতিটি অভিযাত্রা, বছরের পর বছর ধরে বন্ধ না হওয়া বিজ্ঞানীদের আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মঙ্গলগ্রহে অভিযাত্রা এর ব্যতিক্রম নয়। রক্তবর্ণ গ্রহটি সম্পর্কে সময়ের সাথে সাথে বহু নতুন ব্যাখ্যা ও আলোচনা উত্থাপিত হয়। যেমন, 1983 সালে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমীর সহযোগী সদস্য ক. ইয়া. কন্দ্রাতিয়েভ ও তাঁর সহকর্মীরা মঙ্গলগ্রহের নদী সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে খুব সম্ভবত চরমভাবাপন্ন মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া কোন একসময়ে সেখানকার জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলির — যার বিশাল আয়তন বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেছে — সক্রিয়তাকে কমিয়েছে।

তথাকথিত 'গ্রীন হাউস' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, সম্ভবত অনেকেই অবহিত রয়েছেন। বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা সূর্যের বিকিরণকৃত তাপ গ্রহপৃষ্ঠে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু উত্তপ্ত গ্রহপৃষ্ঠ থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে দেয় না। ফলত গ্রহপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বায়ুমন্ডল রয়েছে এমন যে কোন গ্রহেরই এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন পৃথিবী, শুক্র। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চরমভাবে অসংলগ্ন বায়ুমন্ডলে এমনটি একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না।

হাইপোথিসিসের প্রবক্তারা মনে করেন যে, এই 'গ্রীন হাউস' বৈশিষ্ট্য — অনেক সময় একে কাঁচঘরবত বৈশিষ্ট্যও বলা হয় — আগে মঙ্গলগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাদের মতে তা ছিল নিম্নরূপ: অতিকায় অগ্নেয়গিরিসমূহ সক্রিয় হবার সময় মঙ্গলগ্রহপৃষ্ঠে প্রবল লাভাস্রোতে ভেসে যেত। এ সময় বায়ুমন্ডলে প্রচুর পরিমাণে ছাই ও জলীয় বাষ্প নিক্ষিপ্ত হত। লাভা ঠান্ডা হয়ে সালফার ডাই আকসাইড গ্যাস নির্গত করত এবং তা জলীয় বাষ্পের সাথে মিলে সালফিউরিক এসিডের, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগঠিত মেঘের আবরণী সৃষ্টি করে। এই আবরণী 'গ্রীন হাউস' বৈশিষ্ট্য

জোরদার করতে সাহায্য করে। ফলত, গ্রহপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ে ও বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে এর ফলে বৃষ্টি ও তুষারপাত শুরু হয়। ঐ সময় সৃষ্ট জলপ্রবাহ ও স্রোত গ্রহটিতে অতিবিখ্যাত এই নদীর চিহ্ন রেখে গেছে। আগ্নেয়গিরিগুলি শান্ত হবার পরও বায়ুমন্ডলে দ্রবীভূত সালফিউরিক এসিডের ধারা মঙ্গলগ্রহে বহিতে থাকে এবং তা সেখানকার সালফার যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলে। গ্রহটির মাটির বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, সেখানে পৃথিবীর তুলনায় সালফার পরিমাণে অনেক বেশি।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. ই. আকসেনভ মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের প্রশ্নটি পুনোরুত্থাপন করেন। মঙ্গলগ্রহের মাটির বিশ্লেষণের সময় মঙ্গলগ্রহে অনুমানকৃত অতিক্ষুদ্র জীবদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত পূর্বের হতাশাজনক সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে আংশিকভাবে হলেও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। তার মতে অতিক্ষুদ্র 'মঙ্গলবাসীদের' গঠন তাদের পার্থিব সহোদরদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে তাদের আন্তসম্পর্কও ভিন্নতর নিয়মে চলে।

অপর একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী প্রখ্যাত মাইক্রোবাইওলজি বিশারদ আকাদেমীশিয়ান আ. আ. ইমশেন্ডকি 'আকসেনভ'র এই ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁর গবেষণাগারের পরীক্ষায় আবারও দেখা যায় যে মঙ্গলগ্রহের মাটির কতগুলি জড় উপাদান 'ভাইকিং'-এর বিশ্লেষকযন্ত্রের অনুরূপ জৈবসদৃশ্য প্রক্রিয়া সংগঠিত করতে সক্ষম।

কিন্তু এতেকরেই বিজ্ঞানীরা শান্ত হননি। কয়েক বছর পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একটি দল এ সম্পর্কে নতুনভাবে পরীক্ষা শুরু করেন। মঙ্গলগ্রহের মাটির উপাদানগুলি সম্পর্কে জানা

তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা পার্থিব খনিজ পদার্থের সাহায্যে অনুরূপ মিশ্রণ তৈরী করেন। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। মাটির প্রাপ্ত নমুনা একটি এ্যাম্পুলে এমনভাবে ভরা হয় যেন সেখানে পার্থিব মাইক্রোবের চিহ্নমাত্র না থাকে। এরপর তাকে বায়ুশূন্য করে সেখানে মঙ্গলের বাতাস — কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস — পূর্ণ করা হয়। অতঃপর এ্যাম্পুলটিতে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেক্ট্রন ও গামারশ্মি প্রবাহিত করা হয়।

শেষ ধাপটিতেই পূর্ববর্তী সকল অনুরূপ পরীক্ষা থেকে পরীক্ষাটির মূল পার্থক্য নিহিত ছিল। বিজ্ঞানীদের চিন্তা অনুযায়ী বায়ুমন্ডল দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত মঙ্গলগ্রহকে অবিরত আঘাতকারী এবং ধীরে ধীরে গ্রহপৃষ্ঠের উপরের স্তরের রাসায়নিক গঠনউপাদান পরিবর্তনকারী মহাজাগতিক রশ্মিপ্রবাহকে এভাবে, কৃত্রিম উপায়ে গঠন করা যাবে। দেড় বিলিয়ন বছরে গ্রহপৃষ্ঠে যে পরিমাণ তেজষ্ক্রিয় শক্তি মহাজাগতিক কণিকাগুলি নিয়ে এসেছে তার সমান পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় কিরণপ্রবাহ নির্ধারিত হয়।

পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত মঙ্গলগ্রহের ধুলার নমুনার প্রত্যেক মুঠোতে 'ভাইকিং'র স্বয়ংক্রিয় ডোজাটার জল মিশ্রিত করে। গবেষকরা কৃত্রিম জড় মাটির ক্ষেত্রেও ওই একই কাজ করেন। এই অবস্থায় কয়েক বছর আগে মঙ্গলগ্রহে পরিলক্ষিত প্রক্রিয়া, যা প্রথমে জীবন সক্রিয়তার ফল বলে মনে হয়েছিল তার অনুরূপ প্রক্রিয়া তারা দেখতে পান।

এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, রক্তবর্ণ গ্রহটি একেবারেই জীবনের অস্তিত্ববিহীন? নাকি এখনো কিছু আশা রয়ে গেছে? দুঃখের বিষয় যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা আমাদের আশাবাদী হতে খুব একটা ভরসা দেয় না।

মহাশূন্য-স্টেশনের গন্তব্য — শুক্রগ্রহ

শুক্রগ্রহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইতিহাসের আরম্ভ গ্যালিলিও ও লমনসভ — এই দুই মহান বিজ্ঞানীদের নামের সঙ্গে যুক্ত। 1610 সালে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহের ধাপ আবিষ্কার করেন। 1761 সালে লমনসভ সেখানে বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। লমনসভের পর প্রায় দু'শ বছর শুক্রগ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ছিল খুবই মন্হর। এভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ এসে পেঁাছায়।

পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে পাঠান বেতারতরঙ্গ সেখানে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসে এবং এভাবে গ্রহটির মেরুবিন্দুগুলির দিক ও গ্রহটিতে দিনরাতের অনুবর্তনের তথ্যাদি জানায়। শুক্রগ্রহে মাত্র দুদিনে আমাদের এক বছর, তার প্রতিটি দিন পৃথিবীতে 118 দিনের সমান। শুকতারায় কোন ঋতু পরিবর্তন নেই। পার্থিব গবেষণা থেকে শুক্রগ্রহের তাপমাত্রা ও তাকে ঢেকে রাখা মেঘের আবরণীর উপরের স্তরের বায়ুন্ডলের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ধারণালাভ করা সম্ভব হয়েছে। গ্রহটির বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এর পরিমাণ তেমন বেশী নয় এবং গ্রহটির গ্যাসীয় আবরণীটি মূলত নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। বেতারদূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রগ্রহের বেতার-বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করা হয়। ফলত গ্রহপৃষ্ঠে বিদ্যমান প্রচন্ড উত্তাপ ধরা পড়ে। কিন্তু, তাপমাত্রার পরিমাণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতভেদ আছে। গ্রহটির তাপমাত্রার বিষয়টিও এখনো অজানাই রয়ে গেছে। মহাশূন্যযুগ শুরু হওয়ার মাত্র চার বছর যেতে না যেতেই সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। 1965 সালে ওই পথ অনুসরণ করে আরো দু'টি স্টেশন উৎক্ষিপ্ত হয়।

এদের একটি 'ভেনেরা-3' গ্রহটিতে পেঁাছায়। এইভাবেই মহাশূন্য অভিযানের ইতিহাসে প্রথম অন্তঃগ্রহ অভিযাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

এ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও কৃৎকৌশলীদের পরবর্তী বছরে শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডল পরীক্ষা করে দেখার মত অভূতপূর্ব কাজের সহায়ক হয়েছে। 'ভেনেরা-4' — এই কাজটি সম্পন্ন করেছে। তার অবতরণ মডিউল দ্বিতীয় মহাজাগতিক গতিতে শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে প্যারাসুটের সাহায্যে নীচে নেমে আসতে থাকে। অতঃপর আমরা জানতে পারি যে, গ্রহটির চতুর্দিকের পুরু গ্যাসীয় আবরণীটি মূলত কার্বন ডাই অক্সাইডে গঠিত। এই প্রথমবারের মত সরাসরি গ্রহটির বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ ও ঘনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

1969 সালে একই সাথে দুটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'ভেনেরা-5 ও 6' গ্রহটির বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুমন্ডলে বিশদ পরীক্ষা চালায়। ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়াও অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্টেশনগুলি শুক্রগ্রহপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ২০ কিলোমিটার উচ্চতায় পরীক্ষা শেষ করে। স্টেশনগুলির পাওয়া তথ্যাদি 'ভেনেরা-4' ও মার্কিন 'মেরিনার-5', যা গ্রহটির পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বেতার রশ্মি প্রক্ষেপ পদ্ধতিতে গ্রহটির বায়ুমন্ডল নিয়ে গবেষণা করেছে — তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে মিলে যায়। মেরিনার স্টেশনটি যখন গ্রহটির পেছনে চলে যায় তখন তার বেতার প্রেরক যন্ত্রের পৃথিবীতে পাঠান বেতার তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হয়। গ্রহটি ও 'মেরিনারের' পারস্পরিক অবস্থানের জন্যই পাঠান সঙ্কেতগুলি বায়ুমন্ডলের গ্যাস পার হয়ে আসার কারণেই এমনটি ঘটে।

কিন্তু শুক্রগ্রহপৃষ্ঠ তখনও পর্যন্ত নাগালের বাইরে ছিল। 1970 সালের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি।
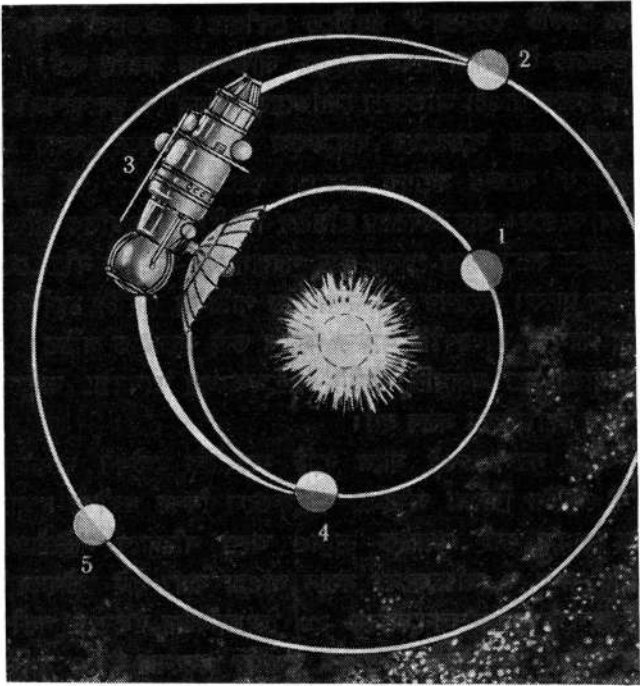
স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'ভেনেরা-5'র উড্ডয়নের নক্শা
স্টেশনের যাত্রাশুরুর সময় শুক্রগ্রহ (1) এবং পৃথিবীর (2) অবস্থান; স্টেশনটির শুক্রগ্রহের কাছাকাছি আসার সময় পৃথিবী (5) এবং শুক্রগ্রহের (4) অবস্থান; উড্ডয়ন পথের সংশোধন (3)

সেদিন শুক্রগ্রহের অজানা গ্রহপৃষ্ঠে নেমে আসে সোভিয়েত প্রেরিত 'ভেনেরা-7' নভস্টেশনের অবতরণ-মডিউলটি।

তার পরবর্তী স্টেশনগুলির মতই 'ভেনেরা-7' মূলত দুটি অংশের — কক্ষপথ মডিউল ও অবতরণ-মডিউল — সমন্বয়ে গঠিত।

কক্ষপথ মডিউলটি হল এক বড়সড় ধাতব সিলিন্ডার, যার ভিতরে স্টেশনটির উড্ডয়ন-নিয়ন্ত্রক, বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বসান ছিল। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য স্টেশনটির কাঠামোতে বড় 'ছাতা' — সূক্ষ্মভাবে তাক-করা এ্যান্টেনা খুলে যেত। কক্ষপথ-মডিউলটি কক্ষপথ সংশোধক ইঞ্জিনযুক্ত থাকায় স্টেশনটিকে সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে চালনা করা সম্ভব হয়। অবতরণ মডিউলটি কক্ষপথ-মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। স্টেশনটির যন্ত্রগুলিতে কক্ষপথ-মডিউলে অবস্থিত এ্যাকুমুলেটার থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ শক্তির মওজুদ সৌরব্যাটারীর সাহায্যে অটুট রাখা হত।

স্টেশনটি উড্ডয়নকালীন সময়ের প্রায় পুরোটুকুই সূর্যের স্থিতি অনুযায়ী নিজ অবস্থান নির্ণয় করে চলেছিল। 'ভেনেরা'র অপ্টিক্যাল ডিটেক্টার সূর্য ও পৃথিবীকে অথবা সূর্য ও বিশেষভাবে নির্বাচিত নক্ষত্রকে স্বীয় দৃশ্যমান এলাকায় রেখেছে। ডিটেক্টারের নির্দেশ অনুযায়ী দিকনির্দেশক ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ক্ষুদ্র গ্যাসীয় জেটইঞ্জিন চালু করত।

অবতরণ মডিউলটিকে শুক্রগ্রহে পৌঁছানই কক্ষপথ-মডিউলটির মূল কাজ ছিল। পূর্ববর্তী অভিযাত্রাগুলির মতই এবারও কাজটি যথাযথভাবেই সম্পন্ন হয়। তাই নতুন স্টেশনটি প্রকল্পনায়নের সময় অবতরণ মডিউলটির প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এটিকে একটি বড়সড়ো ডিমের মত দেখাত। মডিউলটিকে আড়াআড়ি ভাবে কাটা সম্ভব হলে তার মধ্যে 'কুসুম' — গোলাকার বায়ুরোধক ব্যবস্থা সম্বলিত যন্ত্রপাতির ব্লকটি — দেখতে পাওয়া যেত। ব্লকটির উপরে ছিল প্যারাসুট আর এ্যান্টেনা।

অবতরণ মডিউলটি শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডল ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপাধিক্য হঠাৎ বেড়ে যায়। ফলত যন্ত্রগুলির প্রতিটি নাট-

বস্তুর ওজন পৃথিবীর তুলনায় 600-700 গুণ বৃদ্ধি পায়। মডিউলটি তথাকথিত আঘাতকারী তরঙ্গের সম্মুখীন হয়। এই তরঙ্গ ও ও মডিউলটির মধ্যকার তাপমাত্রা মুহূর্তের মধ্যে 11 হাজার ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাপনিরোধক মোটা আবরণী ও তাপনিয়ন্ত্রক প্রণালী স্টেশনটিকে রক্ষা করে। যন্ত্রপাতির ব্লকে স্বাভাবিক কর্মকালীন তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়।

বায়ুমন্ডল অত্যল্প সময়ে যানটির গতিবেগ কমিয়ে আনে। অচিরেই অবতরণ-মডিউলটির প্যারাসুট খুলে যায়। অতঃপর শুরু হয় ধীরে ধীরে অবতরণ। পরিচিত বিশ কিলোমিটারের মাত্রাটি অতিক্রান্ত হল। পরবর্তী সবকিছুই প্রায় অজানা। এদিকে তাপমাত্রাও ক্রমে বেড়ে চলেছে: 400°C, 450°C, ... এবং অবশেষে 475°C। আবার 475°C, পরবর্তী মিনিটেও ওই একই সংখ্যা। এখন তাপমাত্রার বৃদ্ধি বন্ধ হল এবং সেই সঙ্গে গ্রহটির তুলনায় মডিউলটির আপেক্ষিক গতিবেগ — যা মডিউলস্থ ট্রান্সমিটারের ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তন অনুযায়ী নির্ধারিত শূন্যে পৌঁছায়। এর অর্থ কেবল একটিই: অবতরণ-মডিউলটি শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে। তাপমাত্রা এখন 500°C, চাপমাত্রা প্রায় 100 এ্যাটমোস্ফেয়ার। এই চরম তাপে সাধারণ ইস্পাত গলে নরম হতে শুরু করে। কিন্তু তাপসহনশীল ধাতুসংকর নির্মিত মডিউলের কাঠামো শুক্রগ্রহের তপ্ত আলিঙ্গনটি দিব্যি সহ্য করতে পেরেছে।

এ পর্যন্ত শুক্রগ্রহে সকল অনুসন্ধান কাজ গ্রহটির নৈশ অংশেই শেষ হয়েছে। নতুন সোভিয়েত 'ভেনেরা-৮' আন্তগ্রহ স্টেশনের অবতরণ মডিউলটির সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহের আলোকিত অংশে অবতরণ স্থল নির্ধারিত হয়। মডিউলটির এই দিবা 'উল্লম্ফন' শুক্রগ্রহের নৈসর্গিক অন্ধকারে পূর্ববর্তী সকল অবতরণ কার্যক্রমের তুলনায় জটিলতর ছিল।

পৃথিবী ও নভযানের মধ্যে বেতার যোগাযোগের সঠিকতা মূলত উভয়ের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। তাই গ্রহটি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগেই স্টেশনটির শুক্রগ্রহে পৌঁছা নির্ধারিত হয়। যেহেতু পৃথিবীর কক্ষপথের চেয়ে শুক্রগ্রহের কক্ষপথ সূর্যের নিকটবর্তী, তাই উভয় গ্রহই যখন সূর্যের একই দিকে থাকে তখন সবচেয়ে বেশী পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। এ অবস্থায় আমাদের দিকে মুখ করে থাকা শুক্রগ্রহের অন্ধকার অংশ পৃথিবীস্থ পর্যবেক্ষণকারী দেখতে পান। গ্রহদুটি সর্বাধিক নিকটবর্তী হবার পর যখন সরে যেতে আরম্ভ করে তখন আলোকিত সরু কাস্তে আকৃতির শুক্রবলয়ের একাংশ পৃথিবী থেকে দেখা যায়। নতুন সোভিয়েত আন্তর্গ্রহ স্টেশনের অবতরণ মডিউল এই সরু কাস্তেতে গিয়ে পড়ার কথা ঠিক হয়।

শুধু এটুকুই গ্রহটির আলোকিত অংশে অবতরণের পথে একমাত্র বাধা নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে মডিউলটি এই অবস্থাসৃষ্ট চাপাধিক্য সহ্য নাও করতে পারত। ক্রমাবনত বিক্ষেপমার্গ অনুযায়ী অবরহোণকালে তা গ্রহটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেও পারত। অর্থাৎ মডিউলটিকে এমনভাবে গ্রহটির নিকবর্তী হতে হবে যেন তার বায়ুমন্ডলে প্রবেশকালীন কোণের মান কোন অবস্থায়ই নির্ধারিত মানের চেয়ে কম বা বেশী না হয়। এজন্যই পৃথিবী থেকে আংশিকভাবে দেখতে পাওয়া শুক্রপৃষ্ঠের আলোকিত অংশের এই নাতিবৃহৎ 'স্বল্প পরিসর স্থানটি' সবদিক দিয়েই অবতরণের স্থান হিসাব সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়।

এমন লক্ষ্যভেদ খুবই কঠিন ছিল। একাজে মহাকাশীয় 'গুলিচালকদের' — ব্যালাস্ট-বিশেষজ্ঞদের — সহায়ক হয় এমন কিছু যা আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে হয় — 'গুলিচালক' ও 'নিশানার' মধ্যকার বহু কোটি কিলোমিটার দূরত্ব। এই বিশাল দূরত্ব লক্ষ্যবস্তুর দিকে চলার পথে স্টেশনটির গতিপথের সংশোধন সম্ভবপর

করে। তবে সত্যি কথা বলতে কী, বিক্ষেপমমার্গ সংশোধন করার জন্য পৃথিবীর দূত যখন তার নিকটবর্তী হবে তখন লক্ষ্যবস্তু-গ্রহটি কোথায় অবস্থান করবে তা সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। জ্যোতির্বিদরা আন্তগ্রহ স্টেশনটির সঙ্গে সম্ভাব্য সাক্ষাতের সময় শুক্রগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জহুরির কাজের মত নিখুঁত এই অবতরণ কার্যক্রমের জন্য নির্ণেয় এই অবস্থান সংশোধন করা প্রয়োজন। এই অভিযাত্রা চলাকালীন পুরো সময়ে পৃথিবী থেকে নিয়মিত শুক্রগ্রহের রেডিওলোকেশনের মাধ্যমে এই সংশোধনী পাওয়া যায়।

ব্যাল্যাস্ট-বিশেষজ্ঞরা এই কঠিনতম কাজে চমৎকার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

'ভেনেরা-8' আন্তগ্রহ স্টেশনের অবতরণ মডিউলটি ঠিক নির্ধারিত স্থানেই অবতরণ করে।

প্যারাসুটের সাহায্যে নীচে নেমে আসার সময়েই স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগারটির কাজ শুরু হয়। শুক্রগ্রহের আলোকিত অংশের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ও চাপমাত্রা প্রথমবারের মত মাপা হয়। ফলত জানা গেল যে, উচ্চতার সাথে এখানেও, গ্রহটির অন্ধকার অংশের মতই ওই বৈশিষ্ট্যগুলি বদলায়।

শুক্রগ্রহকে আমাদের দৃষ্টি থেকে চিরকালের জন্য ঢেকে রাখা মেঘের আবরণী বহুদিন ধরেই গ্রহটিকে সৌরজগতের সবচেয়ে রহস্যময় গ্রহগুলির একটিতে পরিণত করছে। ফলত ঢাকা-পড়া গ্রহটি থেকে শুক্রগ্রহের মেঘ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কিছুমাত্র কম নয়। অবশ্য এর বিশেষ কতগুলি কারণও রয়েছে।

সূর্যের নিকটবর্তী শুক্রগ্রহ এত বেশী গরম যে সেখানে দস্তা ও সীসা — যদি ধরে নেই যে এগুলি গ্রহটিতে রয়েছে — কেবলমাত্র গলন্ত অবস্থায় থাকতে পারে। এমন তাপমাত্রা ও প্রচন্ড চাপমাত্রার ফলে শুক্রপৃষ্ঠে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাস্তবিক পক্ষেই

অসম্ভব। কিন্তু অধিক উচ্চতায় অবস্থিত মেঘের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার বায়ুচাপ খুব বেশী নয়, তাপমাত্রা নাতিশীতোষ্ণ। এদের পরিমাণ অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মতই। তাহলে কী এই মেঘমন্ডলই গ্রহটিতে জীবনের প্রসূতিগার ও মাতৃসদনে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নটির জবাবে জীববিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা — আগে বলুন ওই মেঘগুলি কী দিয়ে তৈরি?

কিন্তু তা তো কারো জানা নেই। এ সম্পর্কে বিবিধ রকমের ধারণা উত্থাপন করা হয়েছে। নানা রকম আশ্চর্য রাসায়নিক যৌগগুলি প্রভাতী তারার মেঘমন্ডলের গঠনউপাদান তালিকায় প্রথম স্থান পেতে চেয়েছে। মার্কিন জ্যোতির্বিদ স. রসুল মনে করেন যে বিষাক্ত পারদযৌগ এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত পদার্থ। সোভিয়েত পদার্থবিদদের সাধারণ জলের চেয়ে অধিকতর ঘন, তথাকথিত ব্যতিক্রমধর্মী 'জল' আবিষ্কারের পর এ যৌগটিও জ্যোর্তিবিদদের আলোড়িত করে।

অনেক গ্রহতত্ত্ববিদদের মতে এমন 'জল' দিয়েই শুক্রগ্রহের মেঘমন্ডল গঠিত। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা এই মেঘমন্ডলে অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব অনুমান করেন।

এ সময়ে মেঘমন্ডলের গঠন-উপাদানের প্রশ্নটি এতটা রহস্যময় হয়ে ওঠে যে ব্যাপারটি সম্পর্কে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা স্থির হয়। 'ভেনেরা-৪' স্টেশনটিতে অ্যামোনিয়া অনুসন্ধানকারী যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। স্টেশনটির অবতরণ মডিউল প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসার সময় যন্ত্রটি নির্দেশ করে যে মেঘমন্ডলে যথার্থই অ্যামোনিয়া রয়েছে। কিন্তু এই তথ্য বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারেনি।

গ্রহটির রহস্যভেদের জন্য শুক্রগ্রহের মেঘাবরণ খুলে দেখা দরকার — গ্রহপৃষ্ঠটি কী রকমের? কিন্তু আলোকিত বস্তুই কেবল দেখা সম্ভব। এমনও হতে পারে যে গ্রহটিতে চিরকালই কেবল

রাত্রি। 'ভেনেরা-8' যানের অবতরণ মডিউলটি নেমে আসার সময় আলোমাপক যন্ত্র — ফটোমিটার কাজ করতে থাকে। মডিউলটি যতই নীচে নামছিল ততই চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে যথেষ্ট আলো ছিল। এখন আমরা জানি যে শুক্রগ্রহে দুপুরটি আসলে পৃথিবীর মেঘলা দিনের মতই।

শুক্রপৃষ্ঠে মডিউলটি প্রায় একঘণ্টা কাজ করে। কৃৎকৌশলীরা এতে নতুন ধরনের তাপনিরোধক পদার্থ ব্যবহার করেন। এগুলির অতিউচ্চ তাপধারণ ক্ষমতা ছিল। যখন এই পার্থিব দূতকে প্রচন্ড উত্তপ্ত গ্যাস গ্রাস করতে আসে তখন তাপনিরোধক আবরণীটি তার প্রাথমিক তাপীয় আঘাত নিজের উপর নেয়। ফলত এই তাপের সবচেয়ে বড় অংশটি চালু করা যন্ত্রপাতিতে সাথে সাথেই পৌঁছুতে পারেনি। এ সময় যন্ত্রপাতিগুলির একটি — গামাস্পেক্ট্রমিটার — শুক্রগ্রহের মাটির রাসায়নিক গঠন সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখে। যন্ত্রটি বায়ুরোধক ব্লকে অবস্থান করছিল। সে এখান থেকেই মাটি পরীক্ষা করে দেখে। খনিজ পদার্থগুলির অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয় উপাদানসমূহের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। তেজস্ক্রিয়তার কারণে গামারশ্মির বিযুক্তি তাদের পরিমাণ নির্দেশ করে। গামাস্পেক্ট্রমিটার অবতরণস্থলে গ্রহপৃষ্ঠতে গামারশ্মির প্রখরতা ও শক্তি নিরূপণ করে। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণের ফলে শুক্রগ্রহের শিলা ও পার্থিব শিলার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

1975 সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত মহাশূন্য উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে দুটি নতুন ধরনের 'ভেনেরা' আন্তর্গ্রহযান যাত্রা শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যান দু'টির শুক্রগ্রহের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হওয়ার কথা নির্ধারিত হয়। পুরনো স্টেশনগুলি এক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। তাই কৃৎকৌশলীরা 'মারস' শ্রেণীর নভযানগুলির কথা স্মরণ করেন। এই স্টেশনগুলি 1971 ও 1973সালে একই কাজ করেছে। শুক্রগ্রহের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে 'মারসদের' কক্ষপথ-মডিউলে অবশ্য রদবদল করা হয়েছে: শুক্রগ্রহ মঙ্গলগ্রহের তুলনায় সূর্যের অনেক কাছে তাই সৌরব্যাটারীর আয়তন কমান হয়েছে। একই কারণে তাপনিয়ন্ত্রণ প্রণালীও নতুন করে গঠন করতে হয়েছে। 'মঙ্গলগ্রহে ব্যবহৃত' বিশাল এ্যাণ্টেনাগুলির প্রয়োজন এই অভিযাত্রায় ছিলনা। কারণ, পৃথিবী ও শুক্রগ্রহের দূরত্বও ততটা বেশী নয়।

এই আন্তর্গ্রহ অভিযাত্রাটি প্রায় চারমাস স্থায়ী হয়। শুক্রগ্রহ থেকে দু'দিনের দূরত্বে থাকা অবস্থায় অবতরণ মডিউলটি আন্তর্গ্রহ স্টেশন থেকে আলাদা হয়। তারা উভয়েই এ সময়ে আগের মতই গ্রহটির লক্ষ্যে উড্ডয়ন অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে মূল স্টেশনটি গ্রহপৃষ্ঠের 1500 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নতুন বিক্ষেপমার্গে পৌঁছায়। নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা প্রণালী স্টেশনটির গতিবেগ রোধ করে তাকে শুক্রগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত করে।

এতে বসান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বেশ কয়েকমাস গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করে। গ্রহটির বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরের গঠন ও ভৌতধর্ম, মেঘমন্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পরিমাপ, আন্তর্গ্রহ চৌম্বক প্রভাব ইত্যাদি কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে গবেষণা করা হয়।

কিন্তু, এখন অবতরণ-মডিউলে ফিরে আসা যাক। এগুলি নতুন করে উদ্ভাবন করতে হয়েছে। ছবিটি দেখলেই আপনারা তৎক্ষণাৎ পার্থক্যগুলি দেখতে পাবেন। যন্ত্রপাতিবাহী কন্টেনারের চতুর্দিকে প্রশস্ত স্কার্ট — এক ধরনের ধাতব প্যারাসুট — বেষ্টিত। এ্যারোডিনামিক্যাল গতিরোধ ব্যবস্থাটি মূল প্যারাসুট খুলে যাওয়ার পর শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলের ঘনস্তরে মডিউলটির গতিরোধ করে। এই মডিউলগুলিতে অতিকায় এ্যাণ্টেনাও আপনারা দেখতে পাবেন না। মডিউলটি পূর্ববর্তী মডিউলের মত তথ্যাবলীকে সরাসরি

পৃথিবীতে না পাঠিয়ে অদূরবর্তী শুক্রগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহে — আন্তর্গ্রহ স্টেশনগুলিতে — পাঠাবে এবং সেখান থেকে সঙ্কেত দূরবর্তী মহাশূন্যে যোগাযোগ কেন্দ্রের এ্যান্টেনায় পৌঁছবে। মডিউলটির গায়ে তার 'চোখ' — টেলিফটোমিটার দেখা যাচ্ছে। এগুলি শুক্রপৃষ্ঠকে প্রথমবারের মত আমাদের দেখিয়েছে। এভাবে ব্যাপারটি ঘটেছিল।

'অপার্থিব পরিমাপক কেন্দ্র শুক্রপৃষ্ঠের ছবি নেওয়া শুরু করেছে এবং ছবিগুলির মান যথেষ্ট ভাল।' তথ্য ঘোষকের এই কথা কেন্দ্রে উপস্থিত সকলকে মনোযোগী করে তোলে। ইলেক্ট্রন রশ্মি এখন কী ছবি তুলে ধরবে? এর উত্তর কারওই জানা ছিলনা।

এবং উত্তরটি এরূপ: ছবির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে আকাদেমিশিয়ান ম. কেলদীশ বলেন, 'ছবিগুলির স্পষ্টতা চাঁদ থেকে পাওয়া প্রথমদিকের দৃশ্যাবলীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়'। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় এ্যারোনটিক্স এবং মহাশূন্য গবেষণা বোর্ডের পরিচালক ডক্টর রসুল তাঁর সাথে অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, 'পাওয়া ছবিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সেখানকার বায়ুমন্ডলের স্বচ্ছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ও পুরু মেঘের আবরণী ভেদ করে গ্রহপৃষ্ঠে আলো পৌঁছায়

যথেষ্ট আলোকিত পাথরের স্তুপগুলি ও তাদের ছায়া ছবিগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খাড়া পাথরের বড় বড় চাঁই আর ছোট ছোট টুকরা। নবীন পাথরস্তুপের কোনাগুলি অসমান এবং তীক্ষ্ম। পুরাতনগুলির কোনাগুলি সুষম ও প্রায় গোল। এসব পাথরের গড়ন যথেষ্ট রহস্যময়। শুক্রগ্রহের শিলা কী প্রক্রিয়ায় সুষম হল? পৃথিবীতে বাতাস, আর্দ্রতা, তাপমাত্রার পরিবর্তনের তীব্রতা কাজটি করে। কিন্তু শুক্রগ্রহে?

তিনদিন পর 'ভেনেরা-10' আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছবি দেখায়।

মডিউলটি স্বচ্ছ মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গভীর ফাটলগুলি প্রস্তরখন্ডের প্রান্তগুলিকে টুকরা টুকরা করে বিভক্ত করেছে। যতটুকু 'চোখ যায়' তার সবটাই এমন স্বচ্ছ দ্বীপে পূর্ণ। এগুলি সম্ভবত খনিজ শিলার নিষ্ক্রমন-পথ। এদের মাঝে দেখতে প্রায় অন্ধকার বলে মনে হয় এমন কালো মাটি চোখে পড়ে। সবকিছুই সমতল, সমৃণ। কোন পাথরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

শুক্রগ্রহের ছবিগুলি মহাজাগতিক প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু তা পূরণ হতে আরো তিন বছর সময় লেগে যায়। ব্যাল্যাস্টিক 'জানালা' — শুক্রগ্রহে যাত্রার অনুকূল সময় — ঘন ঘন খুলে না। পরবর্তী জানালাকে মহাশূন্য অভিযানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ব্যবহার করে। সোভিয়েত মহাশূন্য উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে 'ভেনেরা-11 ও 12' রওয়ানা হয়। আর কেনাভেরাল অন্তরীপ থেকে 'পাইওনিয়ার-ভেনাস-1 ও 2' যাত্রা শুরু করে।

নির্মাণকৌশল অনুযায়ী নতুন সোভিয়েত স্টেশনগুলি ছিল তাদের পূর্ববর্তী দুটি স্টেশনেরই মত। এদের প্রতিটি নভযানে অবতরণ-মডিউল রয়েছে, আর স্টেশনগুলি মহাশূন্যে ভাসমান রীলে-কেন্দ্রের কাজ করে। পূর্ববর্তী স্টেশনগুলি শুক্রগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল। আর এবারের স্টেশনগুলি 'সচল অবস্থায়' অবতরণ-মডিউল প্রেরিত তথ্যাদি পৃথিবীতে পাঠিয়ে পরে সূর্যের চারদিকে উড়তে থাকবে।

'পাইওনিয়ার' নভযান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। প্রথম যানটি গ্রহটির কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে পরিকল্পিত হয়। আর দ্বিতীয়টির কাজ ছিল শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলে চারটি প্রোব (Probe) পৌঁছান।

উড্ডয়ন শেষ হবার অল্পকাল আগে অবতরণ-মডিউল তার পরিবাহক যানটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এর পর মডিউলগুলি গ্রহটির দিকে উড্ডয়ন অব্যাহত রাখে আর মূল স্টেশনগুলি বিক্ষেপমার্গ পরিবর্তন করে গ্রহটি থেকে ত্রিশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশী উচ্চতায় অবস্থান নেয়। স্বয়ংক্রিয় সন্ধানীদের প্রেরিত তথ্য গ্রহণ করে সেখান থেকে তা পৃথিবীতে পাঠানোর কাজে স্টেশনগুলি নিয়োজিত থাকে।

মডিউল দুটি যখন শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে তখন তাদের ভূনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নৈশ অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু পার্থিব দূতরা যেখানে রঙিন প্যারাসুটে দোল খাচ্ছিল সেখানে ছিল প্রখর সূর্যালোক। আকাশে আলোক নির্ণয়কারী যন্ত্রসমূহও একথা সমর্থন করে। মডিউলগুলি বায়ুমন্ডলের যত ভিতরে প্রবেশ করছিল তার আশেপাশের তাপ ও চাপ ততই বেড়ে চলছিল।

কোনরকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই এবার তারা মেঘমন্ডলে প্রবেশ করল। দূর থেকে দেখে ঘন ও শক্ত বলে অনুমিত মেঘগুলিকে হালকা কুয়াসার মত মনে হল। বহু কিলোমিটার বিস্তৃত পুরু স্তর বিশিষ্ট হওয়ার কারণে যে এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীতে প্রতীয়মান হয়েছে। তখনো শুক্রগ্রহের গঠন-উপাদান বিজ্ঞানীদের অজানা। এ সম্পর্কে বহুরকমের জল্পনা কল্পনা চলছিল। পার্থিব পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গ্রহটিকে ঢেকে রাখা কুয়াসার আবরণী সম্ভবত কোনরকম তরল পদার্থের ফোঁটা দ্বারা গঠিত। মেঘমন্ডলীর উপরের স্তরের প্রচন্ড ঠান্ডায়ও তা জমে যায় না। মার্কিন বিজ্ঞানী সিলল ও ইয়ং ঘন সালফিউরিক এসিডের ক্ষেত্রে মানানসই এমন ধর্ম আবিষ্কার করেন।

মেঘমন্ডলে ও তার নীচে অবস্থানকালে প্রতি দশ সেকেন্ড পরপর স্পেক্ট্রমিটার চালু হয়। এবং প্রতিবারই যন্ত্রপাতিকে ঘিরে রাখা

গ্যাসের চিহ্ন বর্ণালীগুলিতে পাওয়া যায়। নভযানটির যন্ত্রপাতি 'হাত দিয়ে ছুঁয়ে' মেঘ পর্যবেক্ষণ করে। মেঘের নমুনা নিয়ে তা ছাঁকা হয়। তারপর মেঘের মাঝে পাওয়া কণিকাগুলিকে রেডিও আইসোটপের সাহায্যে এক্সরে করে দেখা হয়। ফলত ওই পদার্থের কণাগুলি রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ণিত হয় যে, তার কোন্ কোন্ অণু ও পরমাণু বিকীর্ণ করেছে। এমনি করে সালফারের বদলে অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘে ক্লোরিন পাওয়া যায়।

দু'সপ্তাহ আগে মার্কিন স্টেশন 'পাইওনিয়ার-ভেনাস-2' বাহিত চারটি প্রোব শুক্রগ্রহে পৌঁছে। এদের মধ্যে ছোট তিনটি প্রোব পৃথক হওয়ার সময় মডিউলটি লাট্টুর মত ঘুরতে থাকে এবং কেন্দ্রাতিগ বল তাদের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে প্রোবগুলির 'উত্তর', 'দিবা' ও 'নিশি' নামগুলি যথার্থ সার্থক হয়। এদের প্রথমটি সূর্যালোকিত না হওয়া উত্তর গোলার্ধের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। অন্যদুটি দক্ষিণ গোলার্ধের দিবা ও নৈশ ভাগে পতিত হয়। আকৃতিতে বৃহৎ চতুর্থ প্রোবটি তার অন্য সাথীদের মত নিক্ষিপ্ত না হয়ে প্যারাসুটের সাহায্যে নিচে নেমে আসে ও শুক্রগ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অনুসন্ধান চালায়। আর 'পাইওনিয়ার-ভেনাস-2' যানটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বায়ুমন্ডলে জ্বলে শেষ হয়ে যায়।

অভিযাত্রা দু'টির বৈজ্ঞানিক কাজের সাদৃশ্য সোভিয়েত ও মার্কিন নভযানের পরিমাপক যন্ত্রগুলির পাওয়া তথ্যাবলী তুলনা করার দুর্লভ সম্ভাবনা নিয়ে আসে। শুক্রগ্রহের ছয়টি অঞ্চলের সর্বত্রই (আমাদের দ্বিতীয় মডিউলটি প্রথমটির 800 কিলোমিটার দূরে অবতরণ করে) মেঘমন্ডল প্রায় একই উচ্চতায় অবস্থিত এবং তাদের পুরুত্ব বাস্তবিক পক্ষে একই রকমের। তাপমাত্রা নির্ণায়ক

ডিটেক্টরগুলি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সালফিউরিক এসিড হাইপোথিসিসের স্বপক্ষে প্রমাণ যোগায়। মার্কিন চারটি প্রোবই প্রায় 14 কিলোমিটার উচ্চতায় থাকতেই অকেজো হয়ে পড়ে। জনৈক বিজ্ঞানীর মতে এ সময় এসিড, বাইরে স্থাপিত যন্ত্রাংশগুলি ক্ষয় করে ফেলে। একথা বললে চলবে না যে, হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অন্যতম উপাদান ক্লোরিন মেঘে লক্ষ্য করা গেছে, আর ধাতব পদার্থকে সালফিউরিক এসিডের তুলনায় তা কম ক্ষয়গ্রস্ত করেনা।

সোভিয়েত অবতরণ-মডিউলগুলিতে সর্বপ্রথম ঝঞ্ঝাবজ্র-নির্দেশক যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এদের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রভাব বিস্তারকারী প্রক্রিয়াসমূহ জানতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে ঝঞ্ঝাবজ্রের ফলে বাতাসে ওজোন ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন হয়। শুক্রগ্রহেও এই ঝঞ্ঝাবজ্র হতে পারে। এমনকি ঘন ঘন শক্তিশালী ঝঞ্ঝাবজ্র শুক্রগ্রহের নৈশাকাশ আলোকিত থাকার কারণও হতে পারে। ঝঞ্ঝাবজ্র-নির্দেশক যন্ত্রগুলি শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ-ক্ষরণ নির্ণয়ে সফল হয়। বাস্তবিক পক্ষে এগুলির উৎপত্তির কারণ কি বজ্রপাত? এটা অবশ্য পরিব্যাখ্যান সাপেক্ষ।

নতুন ধরনের 'ভেনেরা'গুলি শুক্রগ্রহপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখিয়েছে যে, তা ওই 470 ডিগ্রিই। ফলত বিজ্ঞানীরা গ্রহটির উত্তপ্ত হওয়ার কারণ নিয়ে ভাবনায় পড়েন। মনে করা হয় যে, গ্রহটির বায়ুমন্ডলে 'গ্রীন হাউজ জনিত প্রভাব' মূলত দায়ী। কেননা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস — শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলের 95% — শুক্রপৃষ্ঠে আপতিত সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিসারিত করে তাপরশ্মিকে বিকিরিত হতে দেয় না। ইদানীং অপর একটি ধারণা এই ব্যাখ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

গ্রহটির শ্লথ ঘূর্ণন (পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে শুক্রগ্রহে একদিন পৃথিবীতে 118 দিনের সমান) — কোন এক সময় শুক্রগ্রহ

থেকে সরে যাওয়া বৃহদাকার একটি প্রাকৃতিক উপগ্রহের প্রভাব বলে অনেক বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছেন। পরম বিস্ময়ের সাথে তাঁরা বুধকে এই উপগ্রহ হিসাবে সনাক্ত করেছেন। বুধকে শুক্রগ্রহের উপগ্রহ হিসাবে কক্ষপথে স্থাপন করে তার গতিপথের ক্রমবিবর্তন কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করা হয়েছে। ফলত জানা যায় যে, স্বীয় 'গৃহকর্ত্রীর' কাছ থেকে তার পলায়ন অবশ্যম্ভাবী।

গ্রহ দু'টি কোন এক সময়ে এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে তাদের পারষ্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবে প্রচুর শক্তি নির্গত হত। এই নির্গত শক্তির একটি বড় অংশ মহাজাগতিক বস্তু দু'টির উভয়েরই অভ্যন্তরভাগকে উত্তপ্ত করে তুলতে এবং তাদের প্রাথমিক উপাদানসমূহ ভেঙ্গে গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি করতে পারে। গ্রহদু'টির নৈকট্যের ধারণাটি সপ্রমাণ বা বাতিল কেবল পরীক্ষার সাহায্যেই সম্ভব।

এজন্য সর্বাগ্রে শুক্রগ্রহের বায়ুন্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের পরিমাণ নির্ণয় প্রয়োজন। কেননা গ্রহটির সৃষ্টির সময় থেকে বায়ুমন্ডলে অবস্থানকারী এই গ্যাসগুলি অন্য কোন পদার্থের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়নি।

আর্গনের বিভিন্ন আইসোটপের অনুপাত জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে মূলত 40 পারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট আর্গনের ভারী আইসোটপ দেখতে পাওয়া যায়। সমপারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট পটাশিয়ামের তেজষ্ক্রিয় বিযুক্তির ফলে এদের উদ্ভব ঘটে এবং বায়ুমন্ডলে এদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বাতাসে হালকা আইসোটপ পরিমাণে অল্প এবং সময়ের সাথে তার পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয়না।

পৃথিবী ও শুক্রগ্রহের বয়স, ওজন ও আয়তন প্রায় অভিন্ন বিধায় ধরে নেয়া হয়েছিল যে, উভয় গ্রহতেই বায়ুমন্ডলে আর্গনের পরিমাণে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু কোন এক

সময়ে যদি শুক্রগ্রহ সত্যি সত্যিই কোন উপগ্রহের প্রভাবে ব্যাপক পরিবর্তনের যুগ পার হয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে গ্রহগর্ভ থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হয়, তাহলে সেখানে আর্গনের ভারী ও হাল্‌কা আইসোটপের অনুপাত পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী হবে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কী পাওয়া গেছে?

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুক্রগ্রহে আর্গনের হালকা আইসোটপের পরিমাণ ভারী আইসোটপের প্রায় সমান। আর বায়ুমন্ডলে আর্গনের পরিমাণ পৃথিবীর বাতাসের তুলনায় প্রায় এক শতাংশ। ফলত আরেকটি নতুন রহস্যের আবির্ভাব ঘটে। পরীক্ষাটির ফলাফল কী এই প্রমাণ করেনা যে প্রটোপ্লানেটিক্যাল কুহেলিকা থেকে উদ্ভূত পৃথিবী ও শুক্রগ্রহে — সেই প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক গঠনপ্রক্রিয়া চলেছে?

শুক্রগ্রহের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনাটি জলের সাথে জড়িত। শুক্রগ্রহের জলের পুরোটাই বায়ুমন্ডলে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। চরম উত্তপ্ত গ্রহপৃষ্ঠে 100 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে জল তরল অবস্থায় থাকতে পারেনা। শুক্রগ্রহের বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প পৃথিবীর তুলনায় প্রায় নাই বললেই চলে। এর প্রকৃত কারণ বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুক্রগ্রহে প্রচুর পরিমাণে জল থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আধিক্য সেখানে থাকত না। পৃথিবীরই মতই তা জলের সাথে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়ে কঠিন কার্বনেট শিলায় পরিণত হত। আর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড যত কম হবে 'গ্রীন হাউজ জনিত প্রভাব' ততই কমে যাবে। ফলত গ্রহপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এত বেশী হবে না, ইত্যাদি — ইত্যাদি....।

মেঘে সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতি বায়ুমন্ডলের শুষ্কতার কারণ বলেও ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা ঘন সালফিউরিক এসিডের দ্রবণ খুব ভালো ভাবে জল শোষণ করে। আবার এমনও তো হতে পারে যে শুক্রগ্রহে কোন সময়ই খুব বেশি পরিমাণে জল ছিল না?

একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে আরো অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটি প্রায়শই ঘটে।

কেবল নতুন করে গবেষণা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। তাই 1982 সালের শরৎকালে নতুন দুটি সোভিয়েত আন্তর্গ্রহস্টেশন শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, 'ভেনেরা-13 ও 14' পূর্ববর্তী অভিযাত্রার সময়ে অবোধগম্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবে। এছাড়া নভযান দু'টির কর্মসূচিতে কিছু নতুন ধরনের পরীক্ষাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

শুক্রগ্রহ থেকে প্রেরিত ছবিগুলিতে — পর্যায়ক্রমে লাল, নীল ও সবুজ আলোর ফিল্টার করে তোলা ছবিতে — আমরা প্রভাতী নক্ষত্রের নতুন দৃশ্যাবলী দেখতে পাই। শুক্রগ্রহে পৌঁছে মানুষ যা দেখতে পেত — ছবিগুলিতে তাই প্রথমবারের মত দেখা যায়। এই পরীক্ষাকার্যের একজন অংশগ্রহণকারীর বর্ণনায় তা হল: 'এখানকার আকাশে আমাদের অতিপরিচিত পৃথিবীর আকাশের মত আমদানী রংয়ের সমারোহ দেখা যায়। গ্রহপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে কমলা রংয়ের মেঘের বিশাল গম্বুজগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। এই মেঘের সবচাইতে নীচু স্তরগুলির উচ্চতা 48-49 কিলোমিটার। এরা এত বেশী উঁচুতে অবস্থিত যে, গ্রহটি থেকে তাদের গঠনের তেমন কোন বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় না। 48 কিলোমিটার থেকে কিছু নীচে পাতলা ডোরা (পৃথিবীর আকাশে তুলার মেঘের মত), এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

স্থানীয় সময় ছ'টার কাছাকাছি শুক্রগ্রহে ভোর হয়। তখন প্রভাতী সূর্যের আলোকরশ্মিতে মেঘ-গম্বুজের অর্ধাংশ ঝলমল করে ওঠে, অপর অংশকে সামান্য আলোকিত করে তোলে। এ দৃশ্যটি গ্রহপৃষ্ঠ থেকে দেখতে সম্ভবত খুবই মনোহর। অতঃপর মেঘগুলি ক্রমেই আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর ধীরে ধীরে পুরো আকাশের উজ্জ্বলতায় সমতা আসে।

"...সেখানকার দিগন্তে আকাশে হলদে সবুজ ছোপ...। 'ভেনেরা-14' ও বিশেষ করে 'ভেনেরা-13' স্টেশনগুলির অবতরণস্থলের দৃশ্যাবলীর রঙীন ছবিতে এরকম হলদে, সবুজ আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 'ভেনেরা-13' যানের অবতরণস্থল বন্ধুর হওয়ায় দিগন্ত পেরিয়ে হলদে, সবুজ ধূম্রজাল ভেদ করে পার্শ্ববর্তী উপত্যকার পাহাড়ী চূড়া চোখে পড়ে"।

এই রঙীন ছবিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ আদৌ এই নয় যে, যা কোন কালে কেউ দেখেনি তা দেখতে পাওয়া সবসময়ই আকর্ষণীয় ঘটনা। 'ভেনেরা-13' ও 'ভেনেরা-14' প্রেরিত ছবিগুলি ব্যাপক অর্থবাহী। কেননা, এগুলি থেকে গ্রহটির ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং আমাদের অদেখা ওই জগতে বর্তমানে কী অবস্থা বিরাজ করছে সে সম্পর্কে অনেক ফলপ্রসূ তথ্য পাওয়া যাবে। বহু কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের কাছে-পৌঁছা শুক্রশিলার ছবিগুলি অনেক হাইপোথিসিস বাতিল করেছে। শুধু তাই নয়, সেই সাথে অনেক নতুন হাইপোথিসিসের জন্মও দিয়েছে।

সৌরজগতে আরো একটি গ্রহে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানীরা গ্রহটি থেকে পাওয়া সর্বশেষ ছবিগুলিতে খুঁজে পেয়েছেন। বায়ুমন্ডলের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা নির্ণায়ক যন্ত্র সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতিও ওই কথাই প্রমাণ করে। শুক্রগ্রহে পরিলক্ষিত বিজলী, মেঘমন্ডলে সৃষ্টি হয় না। তা দীর্ঘ সময়ব্যাপী অগ্ন্যুৎপাৎ-এর ফল। শুক্র-স্টেশনে স্থাপিত 'গ্রোজা' নামক যন্ত্রের পাঠান তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এসিদ্ধান্তে এসেছেন।

বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেছেন যে, মার্কিন শুক্রগ্রহ-স্টেশনগুলির তাপমাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্র, বায়ুমন্ডলস্থ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নষ্ট হয়নি। আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত সক্রিয় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রই এজন্য দায়ী।

উভয় স্টেশনের অবতরণ-মডিউলগুলিতে প্রথমবারের মত নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ যন্ত্র এবং সংগৃহীত নমুনা যন্ত্রে পাঠাবার জন্য বিশেষ কলাকৌশল সংযোজিত হয়েছে। মাটির নমুনা সংগ্রাহক যন্ত্রকে চুল্লির তপ্ততায় কাজ করতে হয়েছে। এই তাপে যে কোন ধাতু সাধারণত গলতে শুরু করে। কিন্তু পরীক্ষাটির ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির বিভিন্ন গঠন-উপাদানকে কেবল নিজ নিজ ধর্মই বজায় রাখতে হয়নি, জটিল আবর্তন, ঘূর্ণন ও কাজের পদ্ধতিও বদলাতে হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি সাফল্যের সাথে কাজগুলি সমাধা করেছে। মাটির নমুনা যন্ত্রে পরিবাহিত এবং যথেষ্ট বিশদভাবে তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গ্রহটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের টেলিভিশন ছবি এবং রাডারের সাহায্যে গ্রহপৃষ্ঠের বিশদ মানচিত্র পাওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের পক্ষে শুক্রগ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলের গঠন-পার্থক্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া তখনও সম্ভব ছিলনা। পরবর্তী আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'ভেনেরা-15' ও 'ভেনরা-16'-এর সাহায্যে এই ফাঁকটুকু পূরণের চেষ্টা করা হয়। স্টেশনগুলি কোন অবতরণ-মডিউল বহন করেনি। এদের শক্তিশালী রাডার যন্ত্র ছিল। কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে স্টেশন দু'টি শুক্রপৃষ্ঠের বিস্তারিত ছবি তুলেছে। সর্বদর্শী বেতারতরঙ্গ মেঘভেদ করে গ্রহপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে স্টেশনগুলিতে গ্রহটির গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু তথ্য নিয়ে এসেছে।

সোভিয়েত মহাশূন্যবিজ্ঞানের বিকাশের বিশেষত্বগুলি শুক্রগ্রহ গবেষণা কার্যক্রমের উদাহরণে প্রকটিত হয়েছে। সুসঙ্গত পরিকল্পনা, ধারাবাহিকতা, ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে জটিল কর্মকান্ড সম্পাদন ও আনুষঙ্গিক আধুনিকতম কারিগরি যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন — তার সাফল্যের চাবিকাঠি।

ধূমকেতুর পথে

ধূমকেতু ফিরে আসছে। হ্যালি'র ধূমকেতু দেখেছে বলে দম্ভ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বেশি না: শেষবারের মতো সত্তর বছর আগে তা আকাশকে শোভিত করে তুলেছিল। ধূমকেতুর উদ্ভব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করত। কূপ মণ্ডুক অবশ্য তাকে ভয় করত। খবরের কাগজগুলির শিরোনামা ভয়টাকে আরও বেশি করে তুলত: 'চলতি ১৯১০ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কি না?' বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত উদ্বেগপূর্ণ ছিল।

কিন্তু এবারেও ধূমকেতু নিরাপদে পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে গেল। পরে অবশ্য মানুষেরা এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের সাক্ষী হয়। সপ্তদশ — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের — সালে ধূমকেতু ছিল ইউরেনিয়ামের মণ্ডলকক্ষে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে তা সূর্য থেকে সর্বাধিক দূরত্বে পৌঁছে। তারপর আবার উল্টো দিকে ফিরে যায়। বর্তমানে এই 'আকাশযাত্রী' আবার আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। ১৯৮৬ সালের শীতকালে তা নিজ পথে, সূর্যের পাশে সন্নিকটতম বিন্দু বা পেরিগেলি পেরিয়ে যাবে। এখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের জ্যোতির্বিদেরা ধূমকেতুকে সন্ধ্যাবেলায় পর্যবেক্ষণ করতে পারবে আর তাদের দক্ষিণ গোলার্ধের সহকর্মীদের তা লক্ষ্য করার জন্য আলো ফুটতেই জাগতে হবে। বিজ্ঞানীদের জন্য এই মহাজাগতিক অতিথি অতিকষ্টে দৃশ্যমান হবে — তারাগুলির মাঝে একটি ঝাপসা বিন্দু, উজ্জ্বলতম তারার চেয়ে বহুগুণ অস্পষ্ট।

হ্যালি-ধূমকেতুর আবিষ্কারের তারিখ নির্দেশ-পুস্তকসমূহে ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত — অর্থাৎ লোকে তা পর্যবেক্ষণ করত

খৃষ্টপূর্ব কালেই। কিন্তু এ ধূমকেতু জ্যোতির্বিদদের কাছে শুধু যে পাকা বন্ধু হিসেবে আদরণীয় তাই নয়। ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক পরিবারের সাধারণ সদস্য এই ধূমকেতু এই প্রথম তার সব কুটুম্ব সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানিয়েছে। তার চলনের হিসাব নিউটনের গতিবিদ্যার সঠিকতার উজ্জ্বলতা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, ধূমকেতুসমূহ সত্যি সত্যি সূর্যের আশে পাশে আবর্তন করে, আর ১৯১০ সালের পর্যবেক্ষণের ফলে তাদের পদার্থিক প্রকৃতির প্রথম তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

যে গ্রহবিদেরা আজ মঙ্গল ও শুক্র সফর করে এসেছেন, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের দিকে তল্লাসী মহাকাশযান পাঠিয়েছেন, তাদের সুখ্যাতি ধূমকেতু-গবেষকদের অশান্ত করে তোলে। "শুধুমাত্র ধূমকেতুসমূহের দিকে উড্ডয়নই আমাদেরকে ধূমকেতুর প্রধান প্রধান মৌলিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় জ্ঞানে 'কয়েন্টাম জাম্প' দিতে পারে", — ১৯৭০ সালে লিখেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ফ. উইপ্‌ল। সেই সময় বিখ্যাত সোভিয়েত ধূমকেতু বিশেষজ্ঞ — একাডেমিশিয়ান ও. দব্রোভোল্‌স্কির সঙ্গে মিলিত হয়ে, রচয়িতাদের একজন তাঁর কথার অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করেন: 'হ্যালি-ধূমকেতুর দিকে পরীক্ষামূলক রকেট প্রেরণ' — ১৯৮৬ সালে ধূমকেতু পেরিগেলি পেরিয়ে যাবে, তাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এটি হবে এধরনের অভিযানের জন্য অন্যতম ভালো সুযোগ।'

সৌরজগতের শৈশবের সাক্ষী। প্রথম অন্তঃগ্রহ উড্ডয়নসমূহের স্মৃতিমন্থন করা যাক। কিসের জন্য? সেসময় এমন প্রশ্ন যে উঠেছিল — তাতে সন্দেহ আছে। ক. ৎসিওল্‌কোভ্‌স্কি যেমন লিখেছিলেন, 'চাঁদ থেকে পাথর তোলা, কয়েক ডজন মাইলের দূরত্ব থেকে মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা, এমনকি তার পৃষ্ঠে নেমে আসা' — অবশেষে এই সবকিছু সম্ভব হল। বিজ্ঞানীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

এই প্রথম সুদূর ও অপরিচিত জগৎকে স্পর্শ করার সম্ভাবনার উদ্ভব হয়। না, সেসময় যারা জিজ্ঞেস করত 'কিসের জন্য' — এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অধীর 'কখন, কখন?' — সে সবকিছুকে তাড়িয়ে দেয়।

আর ধূমকেতু? তাদের দিকে অভিযানগুলিতে যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হবে তার বিনিময়ে কোন লাভ হবে কি? লেজ-ওয়ালা জ্যোতিষ্ককে লোকে দুঃখকষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যেকালে উপলব্ধি করত সেকাল অতীতে চলে গেছে। আজ এমনকি স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে ধূমকেতু হচ্ছে ধোঁয়াটে নোংরা বরফের পিণ্ড। শুধু তাই? তাহলে কিছু বছর আগে আয়োজিত সেরা মহাজাগতিক পরীক্ষা সম্পর্কিত শিশু প্রতিযোগিতায় কেন সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক প্রজেক্ট 'ধূমকেতুর সাথে ডকিং' মনে করা হয়েছিল? অর্থাৎ এ ধারণাটা সত্যি সত্যি সুপরিণত হয়েছে। কারণ, এমনকি ভাবী বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে ভাবনা করে।

ধূমকেতু — সৌরজগতের সবচেয়ে কম গবেষিত জ্যোতিষ্ক। গ্রহগুলি যে কোন সময় পর্যবেক্ষণ করা যায় কিন্তু উজ্জ্বল ধূমকেতু শতবর্ষে মাত্র দু-তিন বার উদ্ভূত হয়ে শুধুমাত্র কয়েক সপ্তাহ অথবা মাসখানেক দৃশ্যমান থাকে। তবে ক্ষুদ্র ধূমকেতুগুলিকে তাদের ক্ষুদ্র আয়তন এবং বায়ুমণ্ডলীয় বাধাবিপত্তির ফলে পর্যবেক্ষণ করা আরও মুশকিল।

বিভিন্ন বিশ্বাসজনক পরোক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও 'বরফের' হাইপোথেসিস এখন পর্যন্ত সবে অনুমান বলে টিকে আছে। ধূমকেতুসমূহের কোষকেন্দ্রটা কি জিনিস — তা আজ অবধি জানা নেই। আর ইত্যবসরে সেগুলির গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের মাঝে সম্ভবত, এমন রহস্য নিহিত যার আবিষ্কার সৌরজগতের প্রজন্ম ও বিবর্তনের বহু সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারত।

ব্যাপারটা হল এই যে, ধূমকেতু — মোটেই সামান্য বরফ নয়। তাদের কোষকেন্দ্রে এমন আদিকালের ছাপ রয়েছে, যখন সবেমাত্র প্রাথমিক গ্যাস-ধূলা, অর্থাৎ মেঘের ঠাণ্ডা প্রান্তগুলিতে উদ্ভূত হচ্ছিল দৈত্য-গ্রহ। তাদের আকর্ষণ-শক্তির বলে তারা নিজেদের মধ্যে ধূমকেতু-পদার্থের একাংশকে গ্রহণ করেছিল, অপর একটি অংশকে দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যেখানে গঠিত হয়েছে বরফপিণ্ড এবং এই বরফপিণ্ডই হচ্ছে সূর্য ও পৃথিবীর উপকণ্ঠে ধূমকেতু সরবরাহের উৎস।

বহু গ্রহের সঙ্গে প্রভেদে সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বিবর্তিত হয় উত্তপ্তকরণের পর্যায় বাদ দিয়ে — তার জন্য তাদের ভর খুবই তুচ্ছ। আর তাছাড়া, যখন ধূমকেতুর মাঝে, যেমন ফ্রিজের মধ্যে, কোটি কোটি বছর ধরে মূল পদার্থ অপরিবর্তিত থাকতে পারে, তখন কোনরকম বিবর্তনের কথা বলা যায় কি? অবশ্য এ ব্যাপারে অন্যান্য মতামতও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ ইয়া. ওপরত ধূমকেতুসমূহের বয়স প্রায় হাজারগুণ কম মনে করেন। তাঁর মতে ধূমকেতুগুলি ফায়েটন গ্রহের বরফের টুকরো, যে গ্রহটি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মণ্ডলকক্ষের মাঝে সূর্যের আশেপাশে আবর্তন করে ৬০ লক্ষ বছর আগে বিস্ফোরিত হয়েছিল। অনভিপ্রেতভাবে বৃহস্পতির কাছাকাছি আসার জন্য এ গ্রহটিকে এত উচ্চ মূল্য দিতে হল — বৃহস্পতির জোয়ার-শক্তিই ফায়েটনের গর্ভ অতিতপ্ত হয়ে-ওঠার কারণ ছিল।

কিয়েভ শহরের জ্যোতির্বিদ স. ভ্‌সিয়েখ্‌ভিত্‌স্কি অনেক ধূমকেতুকেই আমাদের সমসাময়িক বলে মনে করেন। ১৮১২ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী লাগ্রাঁজের হাইপোথিসিসকে বিকাশ করে, তিনি মনে করেন যে ধূমকেতুর কোষকেন্দ্র হল অন্তঃগ্রহ বিক্ষেপমার্গে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দ্বারা উদগীর্ণ দৈত্য-গ্রহের উপগ্রহগুলিরই

অংশবিশেষ। সম্প্রতি মহাকাশযান থেকে পাওয়া বৃহস্পতির উপগ্রহ 'ইও' তে শক্তিশালী উদ্গিরণের ছবি এই তত্ত্বের পক্ষপাতীদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করে তুলেছে। কিন্তু এ তর্কবিতর্কের চূড়ান্ত বিচার করতে পারে শুধুমাত্র মহাজাগতিক যাত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ ব্যাপারে যার অভিমতই সঠিক হোক না কেন, যে কোন ক্ষেত্রে মহাকাশবিদ্যার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ধূমকেতু ও জীবন। মহাজাগতিক বরফপিণ্ড শুধু যে জ্যোতির্বিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা নয়। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ফ. হোইল ও স. বিক্রেমাসিং মনে করেন যে, ধূমকেতু জাতীয় নক্ষত্রবৃষ্টি আমাদের পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহেও অণুজীব ছড়ায়। গবেষকদের অভিমতে এটাই হচ্ছে উল্কাস্রোতের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে কোন কোন বিশ্বব্যাপী রোগের প্রাদুর্ভাবের মিল খাওয়ার কারণ।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তিতে ধূমকেতুসমূহের সম্ভাব্য ভূমিকা বৈজ্ঞানিক চক্রে গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে। এইভাবেই, হ্যালি ধূমকেতুর প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন বিখ্যাত মার্কিন জীববিদ ও রসায়নবিদ স. পন্নামপেরুমেকে মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্যা নিয়ে একটা সেমিনার আয়োজিত করার উপলক্ষ দিয়েছে।

ধূমকেতুগুলি যে সত্যিসত্যি ভাইরাস ও জীবাণুর উৎস — তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে অনেকদিন আগেই এই অনুমান করা হয়েছিল যে, ধূমকেতুর কোষকেন্দ্রে জৈব পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। আসলেই, সেখানে তা পাওয়া যাবে না কেন? যে-সব মৌলদ্বারা তা গঠিত সেগুলি ধূমকেতুর মাঝে অবশ্যই আছে। মহাশূন্যে জীবাণু সংশ্লেষণের জন্য উপযোগী পরিবেশ যে আছে, তা প্রমাণিত করে উল্কায়, এমনকি আন্তর্নক্ষত্রীয় গ্যাসে তার উপস্থিতি।

আর, শুধু তাই নয়। জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী জল, মিথেন ও

হাইড্রোজেনের জমে-যাওয়া মিশ্রণকে প্রোটন দ্বারা কিরণপাত করে তার মধ্যে কারবামাইড আর এ্যাসেটিক এ্যাসিডের চিহ্ন খুঁজে পান। আর সোভিয়েত গবেষকরা অতিনিম্ন তাপে চলা রাসায়নিক বিক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারে অংশগ্রহণকারী একজন আকাডেমিশিয়ান, ভ. গলদানস্কি প্রত্যক্ষভাবে বলেন: "খুবই সম্ভব যে মহাশূন্যে, শীতের পরিবেশে ও মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাবে যদিও মন্থর, সবচেয়ে জটিল অণুসমূহের (এমনকি, প্রোটেনের) গঠনের প্রক্রিয়া চলতে পারে। তথাকথিত 'জীবনের ঠাণ্ডা প্রাক-ইতিহাসের' সম্ভাবনা দেখা দেয়।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমীর লেনিনগ্রাদ পদার্থ-প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউট এবং তাজিক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান আকাদেমীর জ্যোতিপদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ল্যাবোরেটরিগুলিতে ধূমকেতু মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। পরীক্ষামূলক যন্ত্রে শূন্য কামরা (Vacuum Chamber) ও রেফ্রিজারেটর মহাজাগতিক পরিবেশের ভূমিকা নিয়েছে আর সূর্যের বদলে — কৃত্রিম আলোর উৎস। একটি বরফের টুকরোতে আলোকপাতের উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রিত ক'রে 'সূর্যের' আশেপাশে কৃত্রিম ধূমকেতুর 'পথ' পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। মহাকাশযান — মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ — হঠাৎ করে এই পরীক্ষার পদ্ধতির সঠিকতা প্রমাণ করেছে। অন্যান্য জায়গার মতো তাজিকিস্তানেও উৎসাহের সঙ্গে সেগুলির উড্ডয়নের পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই আগ্রহ খাঁটি পেশাগত ছিল না — প্রত্যক্ষভাবে গ্রহ নিয়ে ইনস্টিটিউটে গবেষণা চলে না। কিন্তু মঙ্গল থেকে একটি সংবাদ এখানে বিশেষ সন্তুষ্টির সাথে গৃহীত হল: মঙ্গলের বরফে ঢাকা উত্তর মেরুর পরিভাগের তাপ দুই-তিন ডিগ্রির সঠিকতায় সেই কৃত্রিম ধূমকেতুর তাপের সাথে মিলে গেছে, যা লালগ্রহ বা মঙ্গলগ্রহেরই মতো 'সূর্য থেকে ঠিক একই দূরত্বে অবস্থিত'।

বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই তাদের মডেলসমূহের গঠনে যে অন্যতম প্রথম জৈব সংযোগ অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক করেছিলেন তা ছিল মিথাইল সায়ানাইড। পরে দেখা গেল যে নির্বাচনটা আশ্চর্যভাবে সঠিক। মাত্র কয়েক মাস কাটল এবং রেডিও জ্যোতির্বিদরা সে সময় হৈ চৈ করা কহোটেক ধূমকেতুর বর্ণচ্ছটার মাঝে এ পদার্থের অণুগুলির বিকিরণ খুঁজে বের করেন। এ পরীক্ষা সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত লেখাটিতে অবিলম্বে সংশোধন করতে হয় — মিথাইল সায়ানাইডকে সম্ভাব্য থেকে বিদ্যমান শ্রেণীতে স্থানান্তরিত করতে। সেই ধূমকেতুতে অন্যান্য জৈব সংযোগও আবিষ্কৃত হয়েছে।

পরীক্ষার সময় একটি আগ্রহোদ্দীপক জিনিস বের হয়েছে। ধূমকেতুর যে 'কোষ কেন্দ্রের' ভেতরে জৈব পদার্থ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল তা থেকে বরফ উবে যাওয়ার পরে ভ্যাকুয়াম কামরায় থেকে-যাওয়া শুকনো অবশেষটায় সূক্ষ্মতম সমান্তরাল সূতোর শক্ত স্তর সৃষ্টি হয়েছে। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেল যে, এই 'ব্রাশের' প্রতিটি লোম হচ্ছে বরফের কীলক যা তার ওপর আঁটসাঁটভাবে ঘোরানো একে অন্যের সাথে বাঁধা বায়োপলিমেয়ারের অণুগুলির স্পাইরালের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুতোকে বায়োসাবলিকন — এই নাম দেয়া হল। বরফের বুনিয়াদ ভালোভাবে অণু-শিকল সমর্থন করে, তাই গঠনটা খুবই শক্ত। 'ধূমকেতুর' অবশেষটা উত্তপ্ত করলে বরফের কীলক উবে যায় ও সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প স্পাইরালের পাকগুলিকে টেনে সরায়, ফলে সেগুলো শুধু দৃশ্যমানই না সচলও হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কৃত্রিম ধূমকেতুতে জৈবাণুগুলি রাসায়নিক সংযোগ দিয়ে সংযোজিত শিকল সৃষ্টি করে।

স্পাইরালের ঘোরানো পাকে লম্বা লম্বা জৈবাণু! এর থেকে না ভেবে পারা যায়না বংশগতির উপাদান — সেই বিখ্যাত DNK-এর দ্বিগুণিত স্পাইরাল — সম্বন্ধে। একারণেই কৃত্রিম ধূমকেতুর গঠন-

উপাদানে যোগ করা হল এ্যামাইনো এসিড, জীবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান — প্রোটিন এবং নিউক্লেয়িক এসিডের গঠন-একক — নিউক্লোটাইড। ফল হল চমকপ্রদ। বায়োসার্বালিকনের গঠনের কাজে, এ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লোটাইড, উভয়েই উভয়কে সাহায্য করল। আর, এই ব্যাপার সুস্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিল জীবকোষের মধ্যে চলমান প্রক্রিয়ার কথা।

তবুও মডেল — মাত্র মডেলই রয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে যা সত্যিভাবে ঘটছে তা উঁকি মেরে দেখতে পেরেছেন কি, নাকি আমাদের সামনে শুধুমাত্র আগ্রহোদ্দীপক এক্সপেরিমেণ্ট? ল্যাবোরেটরির পরীক্ষাগুলিতে সর্বদাই সন্দেহের জন্য ফাঁক থাকে। এই সন্দেহ মীমাংসিত করতে পারে শুধু জ্ঞানের সেই 'জাম্প', যা ধূমকেতুর সাথে প্রত্যক্ষ মিলনের ফলেই উদয় হতে পারে।

কল্পনা, নাকি বাস্তবতা? ঝকঝকে একটি আলোর ঝলক পথ নির্ধারক যন্ত্রের দৃষ্টিক্ষেত্রে এসে দুলে দুলে কেন্দ্রে পৌঁছে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে শুরু করছে। আরও একটি তারকা, আগে যেগুলি হাজারে হাজারে পাওয়া যেত, এটাও ঠিক সেইরকম। অচিরেই ঝকঝকে দাগের চারপাশে বেড়ে-ওঠা কয়েকটি ঝাপসা বিন্দু দেখা দিল, নক্ষত্রকে ঠাণ্ডা উপগ্রহ বেষ্টিত করছে। এবারে তল্লাশী রকেট মোড় ফেরাতে পারে না: প্রোগ্রাম যন্ত্র গ্রহজগৎকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

কয়েক শত বছর আগে এ যন্ত্রে নিহিত লজিক্যাল প্রোগ্রাম এই জ্যোতিষ্ক পরিবারের চারিদিকে উড্ডয়নের পদ্ধতি নির্ধারিত করে। সে অনুযায়ী প্রোব-এর সবচেয়ে কাছাকাছি আসা উচিত সুউন্নত বায়ুমণ্ডল সম্পন্ন শক্ত গ্রহসমূহের দিকে। প্রান্তের ঠাণ্ডা গ্যাসগোলক দূর থেকেই গবেষণা করা সম্ভব এবং তা উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্ক থেকে দূরেই হওয়া উচিত।

তল্লাশী রকেটের বৈজ্ঞানিক কমপ্লেক্‌সকে তিনটি ছোট গ্রহের কাছে বিশেষভাবে শক্ত কাজ করতে হয়েছে। নৈকট্য এবং প্রায় সমান আয়তন সত্ত্বেও নক্ষত্রের এই উপগ্রহগুলি যমজ নয়। একটা — ঠান্ডা এবং প্রায় গ্যাস-আবরণ থেকে বঞ্চিত, দ্বিতীয়টি — উত্তপ্ত, ঘন অস্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত, এবং তৃতীয়টি গরমও না, ঠান্ডাও না, জলের ঘন বাষ্পের বড় বড় সাদা দাগগুলির মাঝে নীলচে রঙের জ্যোতিষ্ক।

এই সাদা-নীল গোলকই রকেটটিকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে বাধ্য করল: গ্রহটি অবিরাম এবং নিয়মিতভাবে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণ চালিয়ে যাচ্ছিল। রোবটটি অবশেষে নিজের স্মৃতিরোমন্থন করে অনুরূপ ঘটনার সন্ধান পায় — সেটা ঘটেছিল তখন, যখন উড্ডয়নের প্রথম ঘণ্টাগুলিতে পরীক্ষার হিসেবে রোবটকে যে-জগৎ প্রেরণ করেছে, তার মূল্যায়ন করতে প্রস্তাব করা হয়েছিল। এখনও সেদিনের মতোই যন্ত্রটি নিরাবেগ ভাবে নির্ধারণ করেছে — গবেষণাধীন গ্রহটি অধ্যুষিত।

এবারে, এ মনগড়া ঘটনাকে বাস্তব ঘটনাসমূহের সাথে তুলনা করা যাক। 1881 সালে ব্রিস্টলের জ্যোতির্বিদ ডেন্নিগ একটি আগ্রহোদ্দীপক ধূমকেতুকে আবিষ্কৃত করেছিলেন। বহু দিক থেকে এ ধূমকেতুটি অসাধারণ ছিল। সূর্যের খুব নিকটে তা আসেনি ও প্রায় সমস্ত ধূমকেতুর অলংকার — লেজ — তার ছিল না। তবে তা পৃথিবীর খুব নিকটে এগিয়ে এল (ধূমকেতু থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সব চেয়ে কম দূরত্ব *60* লক্ষ কিলোমিটার)। এই ধূমকেতু প্রতীয়মান ছিল একটি কুৎসিত, ঝাপসা ডিস্কের মতো দাগের রূপে, তার কেন্দ্রে — জ্বলন্ত বিন্দুগুলি। আরও বলা যায় যে, ধূমকেতুটি শুক্রগ্রহের কক্ষপথের ৩০ লক্ষ কিলোমিটার এবং বৃহস্পতির কক্ষপথের ২৪০ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী পথ দিয়ে চলে যায়।

কথাটা কৌতূহলজনক, তাই না? সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা, ভ. বুর্দাকোভ ও ইউ. দানিলভ, ডেনিংগের ধূমকেতুর ব্যবহার নিয়ে এমন অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাঁরা অবশ্যই এই কথা জোর দিয়ে বলেন না যে, গত শতাব্দীর শেষে সৌরজগতে অজানা সভ্যতার দূত এসে গেছে। এর জন্য যথেষ্ঠ প্রমাণ ও তথ্য ছিল না। কিন্তু 'বুদ্ধিসম্পন্ন জীবন' অপার মহাজগতে এমন ছোট ছোট দ্বীপে স্থানান্তরিত হতে পারে না কি, যেগুলিকে আমরা, পৃথিবীর পর্যবেক্ষকরা ভুলে ধূমকেতুগুলির সাথে তুলনা করি — তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিচ্ছে শুধু এই ধূমকেতুই না।

এমনকি আজকের সমস্ত জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আকর্ষণ করে 'আরেন্দা-রলেন্ড' ধূমকেতুর রূপ (বিশেষ করে তার 'গলুই' এবং 'ভল্লম') প্রাকৃতিক হেতুতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ধূমকেতুর রেডিও-বিকিরণ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। অবশ্য, সম্ভাবনাপূর্ণ কারণ হল এই যে, এখন পর্যন্ত লেজওয়ালা জ্যোতিষ্কসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ নির্ধারিত করে — এমন প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্পর্কে আমরা বেশি জানি না। কিন্তু এই অদ্ভুত ধূমকেতু যে ডাইরেক্ট-ফ্লো মহাজাগতিক ইঞ্জিন দ্বারা সুসজ্জিত এমন আন্তর্নাক্ষত্রিক যানকে মনে করিয়ে দেয় যাকে নিয়ে অনেক বছর ধরে বহু দেশের বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে আসছেন — তা আশ্চর্য না কি? আমাদের বিজ্ঞানীরা যদি মনে করেন যে, ১৫০-২০০ বছরের মধ্যে একই সঙ্গে শত শত মানুষকে অসীমিত মেয়াদী মহাজাগতিক অভিযাত্রায় প্রেরণ করা সম্ভব হবে, তাহলে আমাদের অপরিচিত 'বুদ্ধিমান ভাইদের'কে যারা ইতিমধ্যেই এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করেছে, আমরা স্বীকার করবই বা না কেন?

মহাজাগতিক চৌমাথাসমূহে। কারো সাথে দেখা করার জন্য কমপক্ষে জানা উচিৎ — আপনাদের পথ কোথায় এবং কবে মিলিত হতে পারে। মহাজাগাতক যানের উড্ডয়নের পথ আগে থেকেই নির্ধারিত করা এবং তা অনুসরণ করা সম্ভব। আর ধূমকেতুসমূহের সঠিক কক্ষপথ সাধারণত অবিদিত। তার কারণ — এই ছোট জ্যোতিষ্কের গতির অস্থিরতা। তাদেরকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়া খুবই সহজ। ধূমকেতু কোনো দৈত্যগ্রহের পাশে চলে এলেই তার ট্র্যাজেক্টরি বহুমাত্রায় বিচ্যুৎ হবে। তার নিজস্ব 'রকেট-ইঞ্জিন' — তার কোষকেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে ছেড়ে-যাওয়া গ্যাস ও বাষ্পের ধারা ধূমকেতুকে তার 'সঠিক' পথ থেকে সরিয়ে দেয়।

মহাজাগতিক যানকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যতম সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে ধূমকেতুর কাছে এগিয়ে আসার সাথে সাথে তার পরস্পর ফটো তোলা এবং প্রাপ্ত ছবিটি নক্ষত্র-ক্যাটালগ ও নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণের তথ্যাদির সাথে তুলনা করা। কোষকেন্দ্র যত কাছে থাকবে ততই ঘনঘন মহাশূন্য থেকে ছবি পাঠিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

দূর থেকে দেখতে পাওয়ার জন্য ধূমকেতু খুবই ছোট। বহু দূর থেকে তারা দৃশ্যমান না। যখন সূর্য ও পর্যবেক্ষকের কাছে এসে ধূমকেতু বের হয় তখন আবার তাদের কোষকেন্দ্র নিজস্ব বাষ্পীকরণের ফলে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তাই কোষকেন্দ্রর গঠন আন্দাজ করতে হবে তাকে লুকিয়ে রাখা কুয়াসার আবরণ লক্ষ্য ক'রেই।

প্রথম দৃষ্টিতে খুব সহজ বলে মনে হয়। পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্যটিতে পরিণত হয়েছে, জলের ক্ষেত্রে যেমন, এই আর কি। আসলে এই সরলতা অনেক কঠিন ব্যাপারে পরিণত হয়।

ব্যাপারটা হল এই যে, সৌর তেজস্ক্রিয়তা ও মহাশূন্যে বিকিরণ কোষকেন্দ্র থেকে ছেড়ে-যাওয়া অণুগুলিকে বিধ্বস্ত করে। তাই একই 'ভগ্ন খন্ড' একেবারে ভিন্ন পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

কিন্তু তা-ও সব নয়। এ পদার্থের অণু যে খণ্ডে ভাঙ্গে (তাদেরকে মাতাপিতা বলা হয়) সেগুলি খুবই স্বক্রিয় এবং সাগ্রহ, কিন্তু প্রায়ই একেবারে অন্য ধরনে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে নতুন নতুন রাসায়নিক সংযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং ধূমকেতুসমূহের অগ্রভাগে প্রাপ্ত অক্ষত অণুগুলিও কোনো ব্যাখ্যা দেয় না: বোঝা যায় না, সেটা কি — বাষ্পীকরণের কিংবা দ্বিতীয় বারের সংশ্লেষের ফল।

কোষকেন্দ্র ভালোভাবে দেখা এবং পরীক্ষা করার জন্য তার কাছাকাছি আসা উচিত। কিন্তু তাকে বেষ্টিত করা গ্যাস-ধুলো আবরণের ব্যাস মাঝে মাঝে দশ কিলোমিটার হতে পারে। তাই মহাজাগতিক যান, লক্ষ্যে পৌঁছোনোর অনেক আগেই সূর্যের ঝকঝকে কুহেলিকার মাঝে লুক্কায়িত হবে। এজন্য ট্র্যাজেক্টরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শেষ সংশোধনের কাজ রকেটকে, তার ইলেক্ট্রোনিক চক্ষু ও মস্তিষ্কের ওপর অর্পণ করতে হবে।

কোষকেন্দ্রের কাছাকাছি বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে করছে? কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ, হ্যাল্লি ধূমকেতু সূর্যের চতুর্পার্শ্বে, পৃথিবীর কক্ষপথ বিচলনের বিপরীত দিকে ঘোরে। অতএব কোষকেন্দ্র অতি তীব্র গতিতে যানের দৃষ্টিক্ষেত্রে এসেই চলে যেতে পারে। গতিরোধ করা? কিন্তু তার জন্য বহু জ্বালানি ব্যয় করতে হবে, আর এ জ্বালানি গ্রহণের ফলে স্বয়ংক্রিয় তল্লাশকারীর স্টার্ট-ওজন বহু মাত্রায় বাড়বে। তাছাড়াও অন্যান্য বহু ধূমকেতুর মতো হ্যাল্লি ধূমকেতুর কক্ষপথের, পৃথিবীর কক্ষপথের সমতলের তুলনায় যথেষ্ঠ নতি আছে। আর, একটি সমতল থেকে অন্যটিতে যানকে স্থানান্তরিত করাও প্রচুর শক্তির ব্যয় ব্যতিরেকে অসম্ভব। অবশ্য ধূমকেতু কর্তৃক পৃথিবীর কক্ষপথের সমতলকে অতিক্রম করার মুহূর্তেও সাক্ষাৎ নিয়োজিত

করা যেতে পারে, তাতে অতিরিক্ত ইঞ্জিন চালু করতে হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীণ সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

মহাজাগতিক হিমশৈলের (ধূমকেতু) সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ঠিক এইভাবে ঘটা উচিত: পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, গ্রহকে ছাড়িয়ে গিয়ে যানটি হ্যাল্লি ধূমকেতুর পাশ দিয়ে যাবে, যা সেমময় পেরিগেলি অতিক্রম করেও উজ্জ্বল ও সক্রিয় থাকবে। আর, গবেষণার সময় বাড়াতে সাহায্য করবে স্থিতিনির্ণয় ব্যবস্থা, যা চলন্ত ট্রেনে বসা ক্যামেরাম্যানের মতো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও টেলি-ক্যামেরার লেন্স আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে তাতে চলমান কোষকেন্দ্রকে ধরে রাখবে।

শনিগ্রহের কয়েদীরা। আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু মহাজাগতিক যান অনেকদিন আগেই ধূমকেতুসমূহের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করেছিল ধূমকেতুকে বেষ্টিত-করা হাইড্রোজেন-বায়ুমণ্ডল যার আয়তন সূর্যের ব্যাসের চেয়েও বেশি। ১০ বছর পরে আন্তর্গ্রহ স্টেশন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পাদন করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'ব্রেডফিলড' নামক ধূমকেতুর দিকে নির্দেশিত 'ভেনেরা' স্টেশনটির যন্ত্রপাতি, তার গঠনে ইতিপূর্বে অপরিচিত মৌলিক পদার্থ লক্ষ্য করল। তাছাড়াও একটি অতি বিরল ঘটনা — সূর্যের সাথে ধূমকেতুর সংঘাত — মহাশূন্য থেকে নিবন্ধভুক্ত করা হল। উজ্জ্বল সৌর রশ্মিতে পর্যবেক্ষণকার্যের অসুবিধার ফলে এমন ঘটনাগুলি প্রায়ই অপ্রত্যক্ষ। এজন্য কক্ষপথ থেকে প্রাপ্ত ছবিগুলির মূল্য বেড়ে ওঠে। এগুলির তথ্য অনুসারে অনুসন্ধান করা যেতে পারে প্রায় ৬০ লক্ষ কিলোমিটার লেজওয়ালা ধূমকেতু কিভাবে দ্রুত

গতিতে সূর্যের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং কিভাবে তার কোষকেন্দ্র টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে উড়ে যাচ্ছে।

মহাশূন্যে থেকে ধূমকেতুর কোষকেন্দ্রের প্রায় মুখোমুখী ফটো তোলা হয়েছে — এমন সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া উচিত নয়। ১৯৮১ সালের শরৎকালে মার্কিন নভযান 'ভোইয়াজের-2' পৃথিবীতে শনিগ্রহের সবচেয়ে দূরবর্তী উপগ্রহ 'ফোয়েবে'র ছবি প্রেরণ করেছিল। শনির অন্যান্য সব উপগ্রহ অভিমুখে চলমান এই উপগ্রহটি বহুদিন থেকেই বিশেষ আগ্রহ জাগায়। শনির আকর্ষণ-শক্তিতে আকর্ষিত 'ফোয়েবে'কে বিজ্ঞানীরা তার রঙের কারণেও গ্রহ বলে মনে করেন: যে খনিজ ধূলোর কণিকাগুলো বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ-শক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তা জ্যোতিষ্ককে ঠিক এমন শক্ত স্তরে ঢাকবে, যেমনটা দেখা দেয় 'ভোইয়াজের'র প্রদত্ত ছবিসমূহে।

শনির অধিকারে সম্ভবত এর চেয়ে ছোট বরফের কয়েদীও আছে, যাদের ভর তাদের সক্রিয়তার সম্পূর্ণ অবরোধের জন্যও যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত গবেষক ভ. দাভিদভ্ বিবেচনা করেন যে, শনির চতুর্পার্শ্ব কক্ষসমূহে জড়ানো ঠিক এ ধরনের 'ধোঁয়া-ছোঁড়া' লেজওয়ালা পিন্ডগুলোই শনির বিখ্যাত বলয়গুলিকে গঠন করতে পারে। অর্থাৎ বলয় জুড়ে সমপরিমাণ ভরের বিতরণের বদলে — প্রতিটি বলয়ে একটিমাত্র সক্রিয় ধূমকেতু ধরনের কোষকেন্দ্র। আর, স্বয়ং চক্রগুলি — গ্রহের চারিদিকে সংযোজিত, কোষকেন্দ্র থেকে ছড়ানো 'ধোঁয়া'তে পরিপূর্ণ পথ। দাভিদভের প্রকল্প এই জন্য আকর্ষণীয় যে, তা 'বেণী-বাঁধা' একাধিক হালকা রঙের সুতো দিয়ে গঠিত শনির বাহ্যিক চক্রের রহস্যময় অসাধারণতার ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

ধূমকেতুর সাথে সাক্ষাৎ। হ্যালি ধূমকেতুকে মধ্যযুগীয় ইতালীতেও পর্যবেক্ষণ করা হয়। সে সময় পাদুয়া শহরের স্ক্রভোনিয়া চ্যাপেলে

মহান শিল্পী 'জোত্তো' তাঁর ছবিতে তা ফুটিয়ে তোলেন: ঐতিহ্যবাহী এ্যাঞ্জেলগুলির বদলে পুজো-করা মানুষদের মাথার ওপর নীল আকাশ কর্তন করছে একটি লেজওয়ালা গোলক। আর এখন, তাঁর মৃত্যুর সাত শতাব্দী কেটে যাবার পর শিল্পী আবার তার মডেলের সাথে মিলিত হবেন — 'জোত্তো'র নামানুসারে হ্যাল্লী ধূমকেতু অভিমুখে যাত্রাকারী নভযানের নাম রাখা হয়েছে।

এই মহাজাগতিক অভিযানের সিদ্ধান্ত ১৯৮০ সালে ইউরোপীয় মহাশূন্য গবেষণা সংস্থা — ESRO কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রায় ১৫ কোটি ডলার অর্থ বরাদ্দ হল। অভিযানের প্রধান প্রধান কর্তব্য নির্ধারিত হল। ইউরোপীয় দেশগুলির সমবায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সংযুক্ত হতে চেষ্টা করে। ১৯৭৭ সালেই এরোনাউটিক্স ও মহাশূন্য গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিচালনাদপ্তর — 'নাসা'য় ধূমকেতু গবেষণা সম্পর্কিত একটি বিশেষ দল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন সরকার গবেষকদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ থেকে বঞ্চিত করে। এ পরিস্থিতি থেকে উপায়, এমনকি ব্যক্তিগত প্রদানের মাধ্যমে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়। 'নাসা' তো এতে অনভ্যস্ত নয় — কিছুকাল আগে মঙ্গলগ্রহে অবস্থিত 'ভাইকিং' যানসমূহ যাতে গবেষণা অনুবর্তন করে যেতে পারে তার জন্য মার্কিন অধিবাসীদের ১ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আর ইতিমধ্যে 'নাসা' ইউরোপীয় দেশগুলিকে জোত্তো উৎক্ষেপণের জন্য মার্কিন রকেট ও তার পর্যবেক্ষক স্টেশন ব্যবহার করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু তার হাঁকা মূল্য — এ সংস্থাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও যশদায়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচালনা হস্তগত করতে চাইল — প্রকল্পের রচয়িতারা খুবই উঁচু বলে মনে করেন। ESRO'র অস্বীকার মার্কিনদেরকে তাদের সম্ভাবনার পুনর্বিচার করতে বাধ্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির অন্তর্গত চাঁদ ও গ্রহসমূহের গবেষণা

কর্মিটি হ্যালি ধূমকেতুর লেজ থেকে ধূলো পৃথিবীতে আনার জন্য একটি যানের প্রকল্প উত্থাপন করে। কিন্তু 'নাসা'র পরিচালকবৃন্দ এধারণা বাস্তবায়নে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শনিগ্রহের গবেষণার জন্য নিযুক্ত 'গ্যালিলিও' নভযানকে ধূমকেতুর সাথে মিলনের জন্য ব্যবহারের সম্ভাবনা তাঁরা আরও কম বাস্তব বলে বিবেচনা করেন।

অবশেষে 'নাসা', 'স্পেস-সাট্ল' নামক নভযানে স্থাপিত অতিবেগুণী টেলিস্কোপের সাহায্যে ধূমকেতুর পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তিনবার — প্রত্যেকবারেই এক সপ্তাহের জন্য — টেলিস্কোপ পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষসমূহে পৌঁছানো হবে। প্রথম বার — ১৯৮৫ সালের শরতে, এখন গ্যালি ধূমকেতু পৃথিবী থেকে ৮ কোটি কিলোমিটার ব্যবধানে থাকবে। দ্বিতীয় বার — ১৯৮৬ সালের মার্চে, ধূমকেতুর পাশদিয়ে একাধিক স্বয়ংক্রিয় যান চলে যাবাব সময় এবং তৃতীয় — ১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে, যখন ধূমকেতু আমাদের গ্রহের সবচেয়ে নিকটে আসবে। যত সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সস্তা প্রকল্প নির্বাচন করা হচ্ছিল, ইউরোপীয়রা তাদের নিজস্ব প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে চলছিল। ১৯৮৫ সালের জুলাইয়ে ফরাসী রকেট 'আরিয়ান-2', 'জোত্তো'কে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যবর্তী কক্ষপথে পরিবহন করবে। তারপর অপভূ-তে (পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে) ইঞ্জিন চালু করার মাধ্যমে যানটিকে হ্যালি ধূমকেতুর দিকে উড্ডয়নের ট্র্যাজেক্টরিতে স্থানান্তরিত করা হবে, এবং ৮ মাস পর যানটি ধূমকেতুর কোষকেন্দ্র থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্বে তার লেজের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে যাবে। ধূমকেতুর পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে 'জোত্তো' 4 ঘণ্টা ধরে তাকে বিশ্লেষণ করবে। এ সময়ের মধ্যে যানটি কোষকেন্দ্রের ছবি তুলবে। এখানে উল্লেখ করছি যে, বিজ্ঞানীরা সে

ছবিগুলিতে অপেক্ষাকৃত ছোট খুঁটিনাটি দেখে নিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। আর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি লেজের অঙ্গীভূত ধুলোর কণা, চার্জ করা কণিকা, গ্যাসের অণুগুলি অনুসন্ধান করবে।

আচ্ছা, এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কী বলা যায়? অবশ্যই মহাজগতে প্রথম পথ-পাতা রাষ্ট্র দূরে থাকে না। একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশ ('ইন্টারকস্‌মস্‌' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী), ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোভিয়েত কসমোড্রম বৈকানুর থেকে আন্তর্গ্রহ কক্ষপথে দুটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশন উৎক্ষিপ্ত হবে। এগুলো — সুবিদিত 'ভেনেরা' সিরিজের নভযানের উন্নত মডেল। শুক্রগ্রহ পর্যন্ত এগুলি প্রায় ছ'মাসের মধ্যে পেঁছবে। এই ঘন মেঘে-ঢাকা গ্রহে অবতরণ-মডিউল প্রেরণ ক'রে, স্টেশনগুলো প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করবে এবং সেই হ্যাল্লি ধূম-কেতু অভিমুখে উড্ডয়ন অনুবর্তন করবে যা ইতিমধ্যে শনির কক্ষেপথের কাছাকাছি আসবে।

1986 সালে কোষকেন্দ্রের নিকট প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার ব্যবধানে যান চলে-আসা পর্যন্ত আরও নয় মাস কাটবে। তার আরও নিকটে এগিয়ে এলে ভালো হয়, কিন্তু তা সম্ভব বলে সন্দেহ আছে। এমন দ্রুত গতি (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম — এই দু'টি জ্যোতিষ্কের আপেক্ষিক গতি, প্রায় ৭০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) এবং পরিচালনা কেন্দ্র থেকে বড় ব্যাবধান, যখন সংকেত দিতে ও গ্রহণ করতে কয়েক মিনিট লাগে — এসবের ফলে কঠিন কোষকেন্দ্রে ধাক্কা মারার আশংকা আছে। ঘূর্ণনের মাধ্যমে সুস্থির থাকা 'জোত্তো' ও জাপানী যানসমূহের তুলনায়, মহাশূন্যে তার তিনটে অক্ষতেই

স্থিতিবোধে সক্ষম সোভিয়েত স্টেশনগুলো অনেক বেশিক্ষণ কোষকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এগুলোকে পৃথিবীতে অল্পসময়ের মধ্যে শুধু কোষকেন্দ্রের ছবি পাঠানোই নয়, ইনফ্রা-রেড থেকে অতিবেগুনী পর্যন্ত — তরঙ্গের এই ব্যাপক রেঞ্জে বহুসংখ্যক পরিমাপও সম্পাদন করতে হবে।

বিরল জ্যোতিষিক ঘটনা সাধারণত বিশ্বব্যাপী আগ্রহের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন দেশ থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি এসেছিলেন। হ্যাল্লি ধূমকেতুর বিশ্লেষণও ব্যাপক আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করবে। আগে যেমন বলা হয়েছিল, তাতে জাপানীরাও অংশগ্রহণ করতে চাইছেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের এই সক্রিয় প্রতিযোগী কোনো কিছুতেই পিছু হটতে চায় না। টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত মহাশূন্য ও এ্যারোনটিক্স ক্ষেত্রে গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উড্ডয়নের জন্য যে-দুটি জাপানী যানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে তা 'জোত্তো' ও সোভিয়েত স্টেশনগুলির প্রদত্ত তথ্যাদিকে পরিপূর্ণ করতে পারে।

এভাবে 1986 সালের বসন্তে সুদূরে মহাশূন্যে একটা বড় মহাজাগতিক সমাবেশ আশা করা হচ্ছে। হ্যাল্লি ধূমকেতু, এমন সর্বসাধারণ আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারবে কি?

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত। কিন্তু প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য অতীতকালে ফিরে যাব। ভলটেরের একটি দূরদর্শী কল্পনীয় স্মৃতি রোমন্থন করা যাক। তাঁর 'মাইক্রোমেগাস' কাহিনীতে তিনি লেখেন: 'ধূমকেতু চন্দ্রসমূহের সবার শেষেরটির কাছে এসে গেল। তারা তার ওপর নিজেদের চাকর ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সঙ্গে নিয়ে লাফ দিয়ে নামল।' সেকালে ফরাসী দার্শনিকের এই ধারণা খাঁটি

কল্পনা বলে বিবেচিত হত। আজ তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে মানুষ সত্যি সত্যি বলে।

সূর্যের আশেপাশে লম্বা এলিপ্‌সে আবর্তনকারী ধূমকেতুগুলি কখনও কখনও তার কাছে এগিয়ে আসে আবার কখনও কখনও তার থেকে শত শত কোটি কিলোমিটার দূরে চলে যায়। তাছাড়া যে সমতলে সকল গ্রহ চলে এবং পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত সব আন্তগ্রহ স্বয়ংক্রিয় স্টেশন উড়ে বেড়ায় তার তুলনায় অনেক ধূমকেতুরই কক্ষপথের সমতল আনত। তাই মহাজগৎকে বাজিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ধূমকেতুকে তল্লাশী জ্যোতিষ্ক হিসেবে ব্যবহার করার ধারণা অতি প্রলোভনজনক বলে মনে হয়। কেননা পৃথিবীর দূতদের জন্য যেখানে আরও অনেকদিন ধরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হবে সেখানে ধূমকেতুরাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি পৌঁছোতে পারে। কিন্তু তার জন্য তাদের ওপর অবতরণ করতে শিখতে হবে। সেটা কিভাবে ঘটতে পারত, সে ব্যাপারে একটু কল্পনা করা যাক...

...এই টেলি-স্ক্রিনগুলো দর্শকদের জন্য অনেক মাস ধরে অপেক্ষা করে আসছে: লক্ষ্য এখনও দূরে রয়েছে, আর এমনি এমনি নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে কেউই চায় না। যানটি যখন ধূমকেতুর অগ্রভাগের সামনে দুলছিল, তখনও অবস্থাটা বদলায়নি। দূর থেকে ধূমকেতুকে জ্বলজ্বলে কুহেলিকার মতো দেখালেও, ভেতর থেকে সত্যিকার গ্যালাক্সির মতোই, তা অদৃশ্য হয়ে পড়ে। অবশেষে, কোষকেন্দ্র দেখা দিল। উজ্জ্বল বিন্দু আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে একটি বিরাট ধূসর পিণ্ডে পরিণত হল। ফুটে উঠে, বারবার বাষ্পের স্রোত ছেড়ে, চারিদিকে বরফের টুকরো ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলে তা মহাশূন্যে কেমন যেন ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে — সেটা দেখে অবাক লাগছিল।

কয়েক সপ্তাহ ধরে টি. ভি. ক্যামেরাগুলি ধূমকেতুকে মনোযোগ

দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। ইতিমধ্যে যানটি কখনও কখনও কোষকেন্দ্র থেকে ডজন ডজন কিলোমিটার দূরে গিয়ে, আবার কখনও কখনও তার একেবারে কাছে এসে আশেপাশে আবর্তন করে। পরে চূড়ান্ত দিন এসেছে — আজ অবতরণ। দীর্ঘ কয়েক মিনিট ধূমকেতুর দিকে রেডিও সংকেত চলছে। অবশেষে যানটি কোষকেন্দ্রের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। তার ছবি ধীরে ধীরে বাড়ছে, অচিরেই গোটা স্ক্রিনে চকচকে বরফের দেয়াল। কোনো একটি মুহূর্তে ক্যাডার তীক্ষ্মভাবে ছিটকে সরে গেল, স্ক্রিনে দেখা দিচ্ছে তার পেছনে সূক্ষ্ম নমনীয় তার-টানা একটি ছোট রকেট। জেটি-হারপুন বরফের মধ্যে বিঁধে গিয়ে গভীরে, আরো গভীরে ঢুকছে, তারটি টানটান হল, আর কিছুক্ষণ পরে নোংরা, খোঁড়া খোঁড়া, ফাটা-ফাটা পটভূমি দর্শকের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে...।

ধূমকেতুর সাথে সাক্ষাৎ এইভাবে না অন্যভাবে ঘটবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। সেটা কবে ঘটবে — তাও এখনও জানা নেই। শুধুমাত্র স্মরণ করা যাক, অতিসম্প্রতি চন্দ্র-পাথরের স্বপ্ন আমাদের চোখে কতই না অসাধ্য ও সাহসী ছিল।

আজ যা অসম্ভব আগামীকাল তা সম্ভব হবে

মাত্র ষাট বৎসর আগে ক. আ. ৎসিওলকভ্স্কি বলেছিলেন, '... গ্রহ নক্ষত্রের মাটিতে পা রাখা, হাত দিয়ে চাঁদের পাথর তুলে নেওয়া, মহাশূন্যে চলন্ত ষ্টেশন তৈরী করা, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যের চারিদিকে জীবন্ত চক্র সৃষ্টি করা, কয়েক দশক মাইল দূর থেকে বুধগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা, ঐ গ্রহে অথবা ওর উপগ্রহগুলিতে নামা — এসব পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে'। মহাকাশবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে ৎসিওলকভ্স্কির অনেক কল্পনাই আজ বাস্তবে

পরিণত হয়েছে। আরও কোন অসম্ভব আগামীকাল সম্ভব হবে কি? কয়েক শতাব্দী অথবা সহস্র বৎসর সামনের ভবিষ্যৎ দর্শন করা কঠিন, কিন্তু কয়েক দশক বৎসর সামনের অদূরভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

শক্তিবিজ্ঞানের অবস্থাই সর্বাগ্রে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির মান নির্ণয়করে, মানুষ অথবা যন্ত্র-মানবকে সুদূর মহাকাশযাত্রায় পাঠানোর জন্য যে-শক্তি দরকার সেই শক্তি পাওয়ার অর্থনৈতিক উপায় খুঁজে পাওয়াই হবে ভবিষ্যৎ মহাকাশবিজ্ঞানের প্রথম সমস্যার সমাধান। নির্দিষ্টভাবে বললে, প্রথম সমস্যার সমাধান হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ইঞ্জিন তৈরী করা।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, যে অণুর প্রচন্ড শক্তি আজ পর্যন্ত আমাদের অবাক করেছে, সেই অণুকে ইতিমধ্যেই অতি ক্ষুদ্র আয়তনের পারমাণবিক জ্বালানী হিসাবে মহাকাশযানের জন্য ব্যবহার করার প্রস্তুতি চলছে, রিএ্যাকটিভ আণবিক ইঞ্জিনের মধ্যে ইউরেনিয়াম অথবা প্লাটোনিয়ামের কোষকেন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ফলে যে-শক্তির উৎপত্তি হয়, তা তাপে পরিণত হয় এবং সেই তাপ রিএ্যাক্টরের মধ্য দিয়ে পাঠানো তরল পদার্থ অথবা গ্যাসকে উত্তপ্ত করে, কয়েক হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত বাষ্প অথবা গ্যাস যখন সরু চোঙ দিয়ে নিষ্কাশিত করা হয় তখন প্রচন্ড রিএ্যাক্টিভ আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক রকেট-ইঞ্জিন সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি, এই ইঞ্জিনের বিরাট ভবিষ্যৎ আছে।

আজ যখন পৃথিবী সবেমাত্র মহাকাশের নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথে পরিচিত হচ্ছে, তখন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই নক্ষত্রযাত্রার কথা চিন্তা করছে। মানুষ যদি আন্তর্নক্ষত্রীয় যাত্রার ঝুঁকি নেয়, তাহলে মনে হয়, কেবলমাত্র সেই রকেটই ব্যবহার করা যেতে পারে যার বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি। অন্যথায় এই যাত্রায় মানুষের জীবনের

মেয়াদ যথেষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এরকম ইঞ্জিন তৈরীর চেষ্টা চলছে যার বেগ অত বেশী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, এরকম ইঞ্জিনে বায়ুর পরিবর্তে আন্তর্নক্ষত্রীয় গ্যাসজাতীয় কাল্পনিক পদার্থ ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতের কক্ষপথ-স্টেশনগুলি পরে শুধু মহাশূন্যীয় 'বাসস্থান গঠনের' কথা মনে করিয়ে দেবে। বিরাট জায়গা জুড়ে বড় বড় কর্মীদলের অনবরত কাজ করার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণবল ওজনহীনতার কথা ভুলিয়ে দেবে। উদ্ভিদের বিশাল কাঁচঘর মহাকাশযাত্রীদের খাদ্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা মেটাবে।

মনে হয়, আমরা তোমাদের সাথে চাঁদে প্রথম লোকালয়ের এবং সৌরমণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহ পর্যটনের সাক্ষী হতে পারবো। তাছাড়া তোমাদের কেউ হয়ত বা আন্তগ্রহযানের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে।

অবশ্য তার এখনো অনেক বাকী। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক কাছাকাছি লক্ষ্যবস্তু রয়েছে যা কম চমকপ্রদ নয়, যেমন লীবরাশন বিন্দুগুলির ব্যবহার। কথাটা ব্যাখ্যা করেই বলি।

নভ-বলবিদ্যা বা মেকানিকসে তিনটি পরস্পর আকর্ষণকারী বস্তুর গতিপথের চিরায়িত একটি সমস্যা রয়েছে। এর সাধারণ সমাধান এখনও পর্যন্ত বের করা যায়নি। কিন্তু একটি আংশিক সমাধানে বলা হয় যে ওই বস্তুগুলি একই সরল রেখায় অথবা সমবাহু ত্রিভুজের কৌনিক বিন্দুতে অবস্থানকালে কিছু সময় এমনভাবে চলতে থাকে যেন কোন শক্ত কাঠামো তাদেরকে আটকে রেখেছে।

নভযান-নির্মাণ কারখানার স্বয়ংক্রিয় চান্দ্রস্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু এবং গণিতজ্ঞদের এই স্টেশনের পথ ঠিক করার সময় থেকেই এই সম্ভাবনাটির ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। পরস্পর

আকর্ষণ-বল দ্বারা সংযুক্ত তিনটি বস্তু — পৃথিবী, চন্দ্র ও নভযান হিসাবগুলিতে স্থান পেতে থাকে।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে একটি সরল রেখা বরাবর চলতে থাকলে লক্ষ্যবস্তু থেকে 58 হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থাকা অবস্থায় নভযানটি প্রথম লাীবরাশন বিন্দুতে পেঁাছাবে। দ্বিতীয় বিন্দুটিও এই একই সরল রেখায় অবস্থিত, কিন্তু তা চাঁদ ছাড়িয়ে আরো 65 হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই দুটি বিন্দুর একটিতে অবস্থান কালে নভযান চাঁদ ও পৃথিবীর সাথে একই সঙ্গে চলতে পারবে যেন তা গ্রহ ও উপগ্রহের উভয়ের তুলনায়ই একই স্থানে ঝুলে রয়েছে।

লাীবরাশন বিন্দুলির এই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বহুদিন ধরেই তাদের ব্যবাহারিক সম্ভাবনা সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনার সৃষ্টি করেছে। যেমন, এই বিন্দুলিতে পুনঃপ্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে সমগ্র পৃথিবীতেই বেতার যোগাযোগ স্থাপন কেবল সম্ভব নয়, পৃথিবী ও চাঁদের বিপরীত দিকের না-দেখা অংশের সঙ্গেও বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এই বিন্দুগুলি সূর্য, বিভিন্ন নক্ষত্র, আন্তর্গ্রহ বস্তু ও মহাকাশীয় রশ্মির বিকিরণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাজনক।

কিন্তু এসব কেবল তখনই সম্ভব যখন নভযানগুলি এই লাীবরাশন বিন্দুগুলিতে দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের ওই বিন্দুগুলিতে ধরে রাখার উপায় হল জেট-ইঞ্জিনের সাহায্য নেয়া। আর এজন্য প্রয়োজন প্রচুর জ্বালানীর এবং এটাই নভস্টেশনগুলির বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার পথে বড় বাধা। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা সমস্যাটি নিরসনের অন্য একটি উপায় প্রস্তাব করেছেন। তা হল — কৃত্রিম উপগ্রহকে দড়ি দিয়ে চাঁদের সঙ্গে বেঁধে রাখা। তাদের করা হিসাব প্রমাণ করে যে, এই ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে

অবাস্তব মনে হলেও যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার দাবী রাখে। তাদের বিবেচিত উদাহরণটি এর পক্ষে যুক্তি দেখায় — 2.5 হাজার টন ওজনের নভস্টেশনকে এক লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং 0.3 বর্গ কিলোমিটার প্রস্থচ্ছেদের একটি দড়ি স্বচ্ছন্দে চাঁদের সঙ্গে আটকে রাখতে পারে। স্বভাবতই মজবুততম পদার্থ দিয়ে দড়িটি বুনতে হবে। হিসাব অনুযায়ী পাওয়া যায় যে, দড়িটির ওজন নভস্টেশনটির ওজনের এক অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

আন্তর্জাতিক মহাশূন্য গবেষণা ফেডারেশনের কংগ্রেসে সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও কৃৎকৌশলীরা 'অসীম আয়তনের নভদূরবীন' নামক রিপোর্টে নতুন একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেশ করেন।

বহুদিন থেকেই বেতার-জ্যোতির্বিদরা, তাদের যন্ত্রপাতির সংবেদনশীলতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। কেননা কেবল এভাবেই তাদের গবেষণার বস্তু — মহাজাগতিক বেতাররশ্মির উৎস — অর্থাৎ তাদের 'জগৎ'-এর অবস্থানের দূরত্ব বাড়ানো যেতে পারে। বেতার-দূরবীন যন্ত্রের এ্যান্টেনা আয়তনে যত বড় হবে তার গ্রাহকযন্ত্রও তত সুবেদী হবে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে পর্যবেক্ষণকৃত বস্তুগুলিও ক্রমাগতভাবে আকাশে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যায়। ফলত এ্যান্টেনাগুলিকেও তাদের অনুসরণে ঘুরতে হয়। আয়তনে সুবিশাল হয়েও ঘূর্ণনে চরমতম স্বাধীনতা মহাশূন্যেই কেবল সম্ভব।

অসীম আয়তনের কাঠামো বলতে প্রকল্পটির প্রবক্তারা কিন্তু একেবারেই সীমানাবিহীনতাকে বোঝাননি। নভদূরবীন যন্ত্রের আয়তনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা কারিগরি সম্ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্যের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কে জানে সময়ে হয়তো বা যন্ত্রপাতির বিশালতর আয়তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে? এই অর্থেই 'অসীম আয়তন

বিশিষ্ট' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নভপদার্থবিদদের জন্য এক থেকে দশ কিলোমিটার ব্যাসের এ্যাণ্টেনাই যথেষ্ট।

এত বড় আয়তনের বেতারদূরবীন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? সেই 1974 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমীর 'বেতার জ্যোতির্বিদ্যা' সংক্রান্ত বহুমুখী গবেষণা পরিষদে গ্রহান্তরের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের গবেষণা প্রকল্প আলোচিত ও গৃহীত হয়।

এই লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রায় এক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ঘূর্ণীয়মান এ্যাণ্টেনা সম্বলিত যথেষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দু'টি বেতারদূরবীন প্রণালী স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।

এ ধরনের আরো একটি চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা হল আন্তর্গ্রহ কক্ষপথে বেতারদূরবীন স্থাপন করা। ফলত বেতার দূরবীন গ্রহনক্ষত্র সহ বহুদূরে অবস্থিত বিভিন্ন মহাজাগতিক লক্ষ্যবস্তুর অদৃশ্য পিঠের ছবি প্রথমবারের মত দেখাতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্প আমাদের তৃতীয় ডাইমেনশনের দ্বার খুলতে সহায়ক হবে। এখন পর্যন্ত আমরা মহাশূন্যের দৃশ্যমান অংশই কেবল দেখতে পাই। আর এই দৃশ্যাবলী হল 'এক দেশে'। যেভাবেই দেখতে চেষ্টা করি না কেন মিউজিয়ামে টাঙানো ছবির মতই নক্ষত্রখচিত আকাশের একফালি ছবি ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখতে পাই না। তাই অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে এই প্রকল্পের সফলতা নভপদার্থবিজ্ঞানের বিবিধ মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধানে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়েও তা সহায়ক হবে। খ্যাতনামা সোভিয়েত বিজ্ঞানী ই. স. শকলোভস্কি মনে করেন যে, বর্তমানে কৌতুহলোদ্দীপক বিভিন্ন বেতাররশ্মি প্রাকৃতিক না কৃত্রিম উৎস থেকে উদ্ভূত তা সঠিক ভাবে জানতে এ ধরনের 'বেতারহলগ্রাফী' প্রণালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের প্রণেতাদের মতে বেতারদূরবীন যন্ত্রটি কেমন হবে?

তাদের মতে যন্ত্রটির মূল এ্যাণ্টেনার গোলাকৃতির বর্তণীটি অনেকগুলি একই ধরনের মডিউল সমন্বয়ে গঠিত হবে। মডিউলগুলির প্রতিটি আয়তনে প্রায় ২০০ মিটার। মডিউলের কাঠামোকে ভাঁজ-করা অবস্থায় মহাশূন্যে নীত হবে। সেখানে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে এবং একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

এই সংযোজিত কাঠামোর উপরিভাগ প্রতিফলক ধাতব খন্ডের আবরণী দ্বারা আবৃত করা হবে। এর প্রতিটি অংশই স্থান পরিবর্তনক্ষম ধাতব খন্ডের অবস্থান পরিবর্তন ক'রে প্রতিফলক আয়নাটির আকার পরিবর্তন করা যাবে। এ্যাণ্টেনার বিবর্ধনে মাধ্যাকর্ষণ বল, আলোক, চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে দর্পণটির ডিফরমেশন দূর করার লক্ষ্যে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দশ কিলোমিটার দীর্ঘ এ্যাণ্টেনাটিতে এসব কারণে প্রায় এক মিটারের মত বিকৃতি হতে পারে।

সাধারণত বেতারদূরবীন যন্ত্রে মহাজাগতিক উৎস থেকে আগত রশ্মিগুলি এ্যাণ্টেনার প্রতিফলক দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ফোকাস বিন্দুতে মিলিত হয়। সেখানে অবস্থিত ছোট ধাতব দর্পণ এই রশ্মিপুঞ্জকে গ্রাহকযন্ত্রে প্রেরণ করে। নভবেতারদর্পণ প্রকল্পের প্রবক্তারাও এই নকশাটিই নির্বাচন করেন।

কিন্তু একটি সহায়ক দর্পণের পরিবর্তে এখানে তিনটি দর্পণ ব্যবহার সাব্যস্ত হয়েছে। এই দর্পণগুলি তিনটি স্বাধীনভাবে চালিত নভযানে স্থাপন করা হবে। বেতারদূরবীন যন্ত্রটি কাজ করার সময় এই নভযানগুলি প্রধান অক্ষ বরাবর অবস্থান না করে তার সাথে কোনাকুনিভাবে মূল এ্যাণ্টেনাটির প্রধান ফোকাসবিন্দুর কাছাকাছি অবস্থান করবে। ফলত মহাশূন্যে অবস্থিত কয়েকটি 'বেতার কেন্দ্র' একই সাথে পর্যবেক্ষণ কাজ চালাতে পারবে এবং অতিকায় প্রধান দর্পণের সঠিক ওরিয়েণ্টেশনের সমস্যাটি সহজতর হবে।

এই নভঃবেতারদূরবীন যন্ত্রের কাজ ও তার এ্যান্টেনার দর্পণের উপরিভাগের আকার নির্ধারণের কাজ মানুষচালিত নভস্টেশন পরিচালনা করবে।

প্রকল্পটির প্রণয়নকারীরা কিভাবে তা বাস্তবে রূপ দেয়ার কথা ভাবছেন? এলক্ষ্যে তাদের সুপারিশমালার একটি রকমফের হল এই রকম: প্রথমে দূরবীন যন্ত্রের অংশগুলি পৃথক পৃথকভাবে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে উৎক্ষেপণ বরা হবে। বিশেষ কক্ষপথ পরিবাহক যান উৎক্ষেপিত অংশগুলিকে প্রাথমিকভাবে মহাশূন্যে এসেম্বল করবে এবং অপর আন্তকক্ষপথ পরিবাহক যান আরো উঁচুতে অবস্থিত কার্যকরী কক্ষপথে তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে। এখানে তাদের এসেম্বলিং-এর কাজ সম্পূর্ণ হবে। স্বয়ংক্রিয় রোবট অথবা মহাশূন্যচারীরা কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী এক কিলোমিটার দীর্ঘ দূরবীনটি এক হাজার কিলোমিটার এবং দশ কিলোমিটার ব্যাসের এ্যান্টেনা 36 হাজার কিলোমিটার উচ্চতার নীচে এসেম্বল করা যাবে না। উপসংহারে প্রকল্প প্রণয়নকারীরা বলেন যে, নভবেতারদূরবীন নির্মাণের কারিগরি সমস্যাবলী বর্তমানযুগে নভকারিগরিবিদ্যার বিকাশের সাথে সংগতিপূর্ণ। মহাশূন্যে বড় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, গবেষণা স্টেশন ইত্যাদির প্রকল্প বিবেচনা কালে একই রকম সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। এই কথাগুলির শেষে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, নভচারী ও কৃৎকৌশলীদের স্বাক্ষর রয়েছে। মহাশূন্যে অতিকায় কাঠামোগুলি কাজ করতে পারবে — সে সময় আর বেশী দূরে নয় — একথার সাফল্যের গ্যারান্টি এখানেই।

এবারে সুদূরভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা যাক। ... শিক্ষার সময় খুব দ্রুত চলে গেল। কিছুদিন আগে উচ্চ মহাকাশ বিদ্যালয় পাশ করে যাওয়া ছেলেদের কাজ দেওয়ার কমিশন তোমাকে

পাঠিয়েছে আন্তর্গ্রহ যাতায়াতের কেন্দ্রে। সেখানে মহাকাশে জিনিস পাঠানো বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর পাইলটের একটি জায়গা খালি আছে। বিশ বৎসর চাঁদে যাতায়াত অথবা কয়েক বৎসর রবিমণ্ডলীতে বিভিন্ন লোকালয়ের মধ্যে উড়ে বেড়ানোর পর হয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু আপাততঃ কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীতেই যোগ দেওয়া যেতে পারে। ঐ বিভাগে অনেক অভিজ্ঞ পাইলট আছে এবং তাদেরই উপর বিশ্বাস করে আন্তর্গ্রহ জাহাজের ভার দেওয়া হয়। যেসব জাহাজ মঙ্গল এবং শনিগ্রহের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রগুলিকে পরিবেশন করে, তাদেরকেও প্রথমে চাঁদে অথবা বুধগ্রহে কয়েক শত যাত্রী নিয়ে যেতে হয়েছ। তারপর তাদেরকে সৌরমণ্ডলীর নানাদিগন্তে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দুঃখ করার কিছু নেই। তুমি এখনও যুবক এবং তোমার সবকিছু সামনে। তোমাকে হয়ত সেইসব স্টেশনের অনুসন্ধানে যেতে হবে, যেগুলি কিছুদিন আগে প্লুটোতে পেঁীছেছে, হয়ত পৃথিবীর খবর পেঁীছে দিতে হবে বহুদূরে — অজানা আন্তর্নক্ষত্রীয় মহাশূন্যে। এমনও হতে পারে যে, কয়েক বার বুধগ্রহে যাওয়ার পর তুমি সে-খানেই কোন বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে থেকে যেতে চাইবে। কিংবা হয়ত পৃথিবীর বাইরের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ সমস্যা তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে এবং তুমি এই মহাবিশ্বের অন্যপ্রান্তে, যেখান থেকে অজানা সভ্যতার ইঙ্গিত আসছে, প্রথম যাওয়ার জন্য তৈরী হবে।

যাক্‌গে, আগের কথায় ফিরে আসি। মনে রাখতে হবে যে, বাস্তব একাধিকবার বিজ্ঞানী এববং কাল্পনিকদের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণীকে ছাড়িয়ে গেছে। কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কঠোর পরিশ্রমের দরকার। পরিশ্রম সফল হওয়ার জন্য অনেক জানা দরকার। সেজন্য পড়তে হবে, ভবিষ্যতের জন্য পড়তে হবে।

মহাকাশবিজ্ঞানের আগামীদিন — পৃথিবীর সবার সাধারণ ভবিষ্যৎ। সেইদিকে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেক লোক, দল এবং সরকারের বিরাট সম্মান এবং দায়িত্ব।

আমাদের দেশে কেউ একথা ভোলে না। সেজন্য মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ কাজে লাগানোর ব্যাপারে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সবাই এখন বুঝেছে, ৎসিওলকভ্স্কি ঠিক বলেছিলেন যে, মহাকাশবিজ্ঞান আমাদের সমাজের কাছে এনে দেবে 'রুটির পাহাড় এবং ধনের অতল ভান্ডার'।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা :

USSR, 129820 Moscow, I-110 GSP,
Pervy Rizhsky Pereulok, 2,
Mir Publishers.

ইউরী কালেসনিকোভ — সাংবাদিক। তিনি ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৯ সালে মস্কো এনারজেটিক ইনস্টিটিউটের ইলেক্ট্র-মেকানিক্যাল ফ্যাকাল্টি শেষ করেন। মহাশূন্যবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপরে ইউ. ভ. কালেসনিকোভের প্রবন্ধ নিয়মিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইউরী গ্লাজকোভ — সোভিয়েত বৈমানিক-নভচারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, প্রযুক্তিবিদ্যার পি. এইচ. ডি.। তিনি ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৬২ সালে খারকোভ শহরের বিমান-ইঞ্জিনিয়ারিং উচ্চ শিক্ষালয় শেষ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি সোভিয়েত নভচারী দলে যোগ দেন ও পরবর্তীতে একাধিকবার নভযান ও কক্ষপথ-স্টেশনের নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে, ১৯৭৭ সালে 'সায়ুজ ২৪' নভযানে ও কক্ষপথ-স্টেশন 'সালুত-৫'-এর উড্ডয়নে অংশ নেন।